ভারতদর্শনসার

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য
শৈলেন প্রেস, ৪ সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা

বিষয়সূচী

৩॥ আস্তিক দর্শন—১ ১৩৮

৪॥ আস্তিক দর্শন—২ ২০৯

বিষয়সূচী

সূচনা

সংস্কৃতে একটা প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে—

> অনেক শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং, স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
> যৎ সারভূতং তৎ গ্রহীতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ॥

"শাস্ত্র অনেক এবং জানিবার বিষয়ও বহু; সময় কম অথচ বাধা অনেক; কাজেই, হাঁস যেমন জল হইতে দুধটুকু টানিয়া লয় তেমনই আমাদিগকেও সারটুকুই শুধু গ্রহণ করিতে হইবে।"

ভারতীয় দর্শনের বিপুল সাহিত্য, সারগ্রহণের বেশী আধুনিক যুগের মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। সার-সংকলনের চেষ্টাই এখানে করা হইয়াছে। জলের মধ্য হইতে দুধ টানিয়া তুলিতে মানসগামী হংসেরা পারে বলিয়া কবিপ্রসিদ্ধি আছে। এখানে দুধের বদলে জল উঠিয়াছে কি না, পাঠক বিচার করিবেন। লেখকের বক্তব্য এইমাত্র হইতে পারে—

> প্রমাণ সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধমত্র যৎ কিঞ্চিদুক্তং মতিমান্দ্যদোষাৎ
> মাৎসর্য্য-মুৎসার্য্য তদার্য্য-চিত্তাঃ প্রসাদমাধায় বিশোধয়ন্তু।

"প্রমাণ-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কথা বুদ্ধির দোষে এখানে যদি কিছু বলা হইয়া থাকে, তবে পণ্ডিতেরা দোষান্বেষণ না করিয়া দয়া করিয়া সেগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন।"

আর একটা কথাও এখানে বলা উচিত। এই বই সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত, বিশেষজ্ঞদের জন্য নয়। সেই কারণে ইহাতে

অনেক গুরুগম্ভীর আলোচনা, জটিল তর্ক এবং সমাসবহুল ভাষা বর্জিত হইয়াছে। গ্রন্থে প্রবেশ করিবার পূর্বে পাঠকের এই কথাটি মনে রাখা ভালো; না হইলে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আশায় নিরাশ হওয়া অসম্ভব নয়।

১

আলোচনার পটভূমি

দর্শনের উৎপত্তি ও তাহার প্রতিবেশ—জগতে

পৃথিবীতে এখনও অসভ্য মানুষ আছে, একথা স্বীকার করিতে নিশ্চয়ই কেহ আপত্তি করিবেন না; আর যাহারা সভ্য হইয়াছে তাহারাও সকলে সমান সভ্য নয়, ইহাও অস্বীকৃত নয়। যাহারা সভ্য হইযাছে তাহারা সকলেই একসঙ্গে যে সভ্য হইয়া উঠে নাই, ইহাতেও মতদ্বৈধ নাই; আর, যাহারা আগে সভ্য হইয়াছিল তাহারাই এখন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি নয়, ইহাও সকলেই জানেন। সুতরাং সভ্যতার যে একটা বিচিত্র ইতিহাস রহিয়াছে তাহা সন্দেহের অতীত। মিশর, গ্রীস, রোম, পারস্য, চীন ও ভারত অনেক আগে—পৃথিবীর বর্তমান প্রভুদের অনেকেরই আগে—সভ্যতার আলোক লাভ করিয়াছিল; এবং তখনকার অসভ্যদের উপর কম-বেশি আধিপত্যও তাহারা করিয়াছিল। কিন্তু চক্রের পরিবর্তন ঘটিয়াছে; সে সময় যাহারা অসভ্য ছিল, তাহারা আজ সভ্য হইয়াছে, প্রভু হইয়াছে, আর পূর্বেকার সভ্যরা আবর্তিত চক্রের নিচে পড়িয়া গিয়াছে।

সভ্যতার এই বিচিত্র ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহাদের মনে একটা প্রশ্ন এই উঠে যে, কি কারণে কোন্ জাতি আগে সভ্য হয়, আর কোন্ জাতি আদৌ সভ্য হয় না। আর, কেনই বা সকলে সভ্যতার সমান স্তরে আরোহণ করিতে পারে না। কার্য-কারণ সম্বন্ধ দ্বারা ইতিহাস এবং জগতের সমস্ত ব্যাপার ব্যাখ্যা করা বৈজ্ঞানিক রীতি। সুতরাং সভ্যতার ইতিহাসে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহারও কারণ খুঁজিতে হয়।

ব্যক্তি এবং জাতির জীবন পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর উপর অনেকখানি নির্ভর করে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা উহার প্রকৃতি ও গতি নিয়ন্ত্রিত হয়, এইটি গত শতাব্দীর চিন্তার একটি বড়ো আবিষ্কার। কোনো এক জাতীয় জীবকে এক দেশ হইতে আর-এক দেশে লইয়া গেলে কয়েক পুরুষ পরে উহার আকার প্রকার অনেক কিছুই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে, ইহা এখন স্বীকৃত। ক্রমবিকাশের নিয়ম হইতে এই সত্য আপনি আসে। বিলাতের ইঁদুরকে আমেরিকায় কিংবা ভারতে নির্বাসিত করিলে সে না-ও বাঁচিতে পারে; কিন্তু যদি বাঁচে তবে তাহার আকৃতি ও প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটিতে বাধ্য। ইহার অর্থ এই যে, জল, হাওয়া খাদ্য ইত্যাদি পরিবর্তনের সঙ্গে প্রাণীর দেহেরও পরিবর্তন হয়; এবং এই পরিবর্তন দশ পনেরো কিংবা পঞ্চাশ পুরুষ পরে এত বেশি হইতে পারে যে, একই বংশের দুই দেশবাসী দুই শাখাকে এক বংশের বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনেই হইবে না হয়তো। ককেশাস্ পর্বতবাসী সুশ্রী আর্যেরা বাংলাদেশে আসিয়া কতখানি আর্য-রক্ত দেহে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, বলা কঠিন; তবে, একেবারে অনার্য হইয়া যান নাই, ইহাও সত্য। কিন্তু ইহারই ভিতর তাঁহাদের অবয়বের, দেহের বর্ণের এবং অন্যান্য প্রকারের অনেকটা পরিবর্তন যে হইয়াছে, তাহার কি কোনো প্রমাণ দেওয়া দরকার।

মানুষের দেহ যেমন প্রাকৃতিক পরিস্থিতির উপর অনেকখানি নিভর করে, তেমনই তাহার সভ্যতাও ঐ একই কারণে নিয়ন্ত্রিত হয়। দেখা যায়, প্রকৃতি যেখানে উদার, অনন্ত উন্মুক্ত আকাশ যেখানে কখনও সূর্যের মৃদু আলো, কখনও চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণ কিংবা দূর নক্ষত্রের আহ্বান লইয়া দেখা দেয়, যেখানে সমুদ্রের বারিরাশি দেশের পাদ ধৌত করে, অথবা বিস্তৃত নদী দেশের বুকে রত্নহারের

মতো বিরাজ করে, যে দেশের প্রকৃতি সহজেই খাদ্য-সম্ভার উপঢৌকন দেয়—এক কথায় যেখানে প্রকৃতি একাধারে মহীয়সী ও সুন্দরী এবং স্তন্যদাত্রী জননীর মতো উদার মাতৃমূর্তিতে বিরাজমানা—যেমন প্রাচীন গ্রীসে, মিশরে, পারস্যে, ভারতে ছিল—সেইসব দেশই আগে সভ্যতা লাভ করিতে সমর্থ হয়।

সাধারণভাবে ইহা সত্য। কিন্তু নিয়মের প্রতিপ্রসব আছে। আর, উদার প্রকৃতিই যদি সভ্যতার একমাত্র কারণ হইত, তাহা হইলে যে দেশে প্রকৃতি অনুদার সে দেশ কখনোই সভ্য হইতে পারিত না। তবে, সাধারণভাবে ইহা সত্য যে, মেরুপ্রদেশ এখনও সভ্যতা হইতে দূরে। আর যাহারা পরে সভ্য হইয়াছে, যেমন ইংলণ্ড প্রভৃতি, তাহাদের প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনেরও কতকটা অনুকূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দেশে দেশে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে, ইহাও জানা কথা। এই বাংলাদেশেই যে সব জায়গায় এক সময় রাজাবাস ছিল, সে-সব জায়গা ম্যালেরিয়া ইত্যাদিতে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে ; আর গঙ্গার পলিমাটির উপর অসংখ্য সৌধশোভিত কলিকাতার উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং প্রতিপ্রসবের সম্ভাব্যতা স্বীকার করিয়াও সাধারণ-ভাবে ইহা বলা যায় যে, প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী সভ্যতার উৎপত্তি ও ধারা নিয়ন্ত্রিত করে।

প্রকৃতির সহায়তা না পাইলে সভ্যতার উদ্ভব হয় না। আর, প্রকৃতির প্রভাবের উপর সভ্যতার ধারাও নির্ভর করে। সকল সভ্যতার স্বরূপ এক নয়। গ্রীসের ও রোমের সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে ; ভারত ও চীনেও তাহাই। তাহার কারণ সকল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ্ এক রকম নয়। সভ্যতার রূপ প্রকৃতির রূপ ও তাহার দানের উপর নির্ভর করে।

সভ্যতার ভিতরে আমরা শিল্প ও সাহিত্যকে যেমন ধরি, ধর্ম ও নীতিকেও তেমনি ধরি। আর বিজ্ঞান ও দর্শনও সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত। সভ্যতার বহু অবয়ব, নানা ভাবে সে নিজেকে ব্যক্ত করে। সকল দেশের সভ্যতাতেই এই সমস্ত আবার সমান পূর্ণতা লাভ করে না। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা সাহিত্য ও দর্শন অপেক্ষা স্থাপত্যে উৎকর্ষ দেখাইয়াছে বেশি। গ্রীসে বিজ্ঞানে প্রখরতা হয় নাই। আধুনিক সভ্যতা প্রায় সকল দিকেই প্রাচীনের অপেক্ষা বেশি পুষ্ট। সভ্যতার অবয়ব হিসাবে দর্শনের আবির্ভাবও আমরা আশা করিতে পারি; কিন্তু পৃথিবীর সব দেশ এখনও দার্শনিক চিন্তায় সমান সাফল্য দেখাইতে পারে নাই। প্রাচীনকালে দার্শনিক চিন্তায় গ্রীস ও ভারত অতুলনীয়। অধুনা ইউরোপে ইটালী, ফ্রান্স, জার্মেনী ও ইংলণ্ড যতটা অগ্রসর হইয়াছে অন্য দেশ ততটা পারে নাই। আমেরিকা দ্রুত অগ্রসর হইতেছে কিন্তু ইংলণ্ডের অন্যান্য উপনিবেশগুলির স্থান অনেক নিম্নে। দক্ষিণ-আফ্রিকার রাষ্ট্রনায়ক স্মাট্‌স্ সেনাপতিত্বের এবং রাষ্ট্রপতিত্বের অবকাশে একটু একটু দার্শনিক হইবার চেষ্টা দেখাইলেও নিজের দেশে সে বৃক্ষের বীজ এখনও বপন করিতে পারেন নাই।

এই বিচিত্রতার কাহিনী হইতে একটা প্রশ্ন মনে উঠিবে; বাহ্য প্রকৃতির কিছুটা সহায়তা না হইলে যেমন সভ্যতার আবির্ভাব হয় না, দর্শনের বেলায়ও কি তেমনি বাহ্য প্রকৃতির সহায়তার প্রয়োজন হয়। সভ্যতার বেলায় যাহা কারণ ও সহায়ক, সভ্যতার অবয়ব হিসাবে দর্শনও সেই কারণ ও সহায়ের উপর নির্ভর করিবে, ইহা সহজেই অনুমেয়। যে কোনো দেশে যে দর্শনের আবির্ভাব হয় নাই, তাহার কারণ সেই দেশের বাহ্য প্রকৃতির শোভা, সম্পদ ও ঔদার্য; একথা

সাধারণভাবে স্বীকার করিতেই হইবে। অনুদার, নিষ্ঠুর প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করিয়া যাহাকে দিনের পর দিন বাঁচিতে হয়, তাহার দার্শনিক হওয়ার অবকাশ কোথায়। ঝড়, বন্যা, শীত, আতপ, খাদ্যের অভাব—এই সমস্তের সঙ্গে যে দেশের লোককে সারা বৎসর সংগ্রাম করিতে হয়, সে কবি বা দার্শনিক কখন হইবে? গঙ্গার উপত্যকায় স্নিগ্ধ শান্ত প্রকৃতির কোলে বসিয়া প্রকৃতির উদার উপঢৌকনে জীবন যাপন করিয়া ভারতের ঋষিরা যাহা করিতে পারিয়াছেন, সাহারার মরুভূমিতে থাকিয়া অথবা সাইবেরিয়ার জঙ্গলে বসিয়া তাহা তো নিশ্চয়ই পারিতেন না। গ্রীসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভিতর যাহা সম্ভব হইযাছে ল্যাপল্যাণ্ড কিংবা গ্রীণল্যাণ্ডে তাহা এখনো ঘটিযা উঠে নাই। কাজেই বাহ্য প্রকৃতির অনুগ্রহ যে দর্শনের আবির্ভাবের জন্য দরকার, তাহা বলা চলে। কিন্তু শুধু প্রকৃতির অনুগ্রহই যথেষ্ট নয়।

বাহ্য প্রকৃতি দ্বারা মানুষের সমগ্র জীবন নিযন্ত্রিত হয়, এরূপ বলা চলে না। কতকটা ক্রিয়া তাহার ভিতরের শক্তি ও সামর্থ্যও করিয়া থাকে। নিজের যোগ্যতা না থাকিলে শুধু বাহিরের সাহায্যেই মানুষের সব কিছু ঘটে না। চাঁদের কিরণে কিংবা কোকিলের গানে সকলেই তো কবি হয় না। সত্য এবং দার্শনিক হওয়ার বেলায়ও তেমনিই নিজস্ব যোগ্যতা থাকা দরকার। এই নিজস্ব যোগ্যতা সকল জাতির মানুষের কেন সমান হয না, একথার উত্তর দেওয়া কঠিন। একই পিতামাতার সব সন্তান তো সমান হয় না। সাধারণভাবে জগতের বৈচিত্র্যের যে কারণ, ইহারও তাহাই। যে ভাবেই আসুক, একটা যোগ্যতা না থাকিলে মানুষের কবি কিংবা দার্শনিক হওয়া ঘটে না। তবে, সাধারণভাবে একথা সত্য যে,

বাহিরের আবেষ্টনী প্রতিকূল হইলে মানুষের অনেক কিছুই করা কঠিন হইয়া পড়ে, আর সেটি অনুকূল হইলে তাহা সে করিতে পারে। আফ্রিকায় থাকিয়া যে নিগ্রোরা এখনও সভ্য হইতে পারে নাই, আমেরিকায় তো তাহারা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে এবং গত যুদ্ধে ভারতে আসিয়া তাহাদের সাহেবিয়ানাও অনেকটা দেখাইয়া গিয়াছে।

দর্শনের উৎপত্তি সম্বন্ধে অতঃপর আমরা এই সিদ্ধান্ত করিব যে, অনুকূল বাহ্য প্রকৃতি এবং আভ্যন্তরীণ নিজস্ব যোগ্যতা না থাকিলে উহা সম্ভব হয় না।

১. প্রথমত আভ্যন্তরীণ যোগ্যতার কথা। এই কথাটা আমরা সব সময় মনে রাখি কি না সন্দেহ যে, দর্শন আর্যসন্তান। জগতের অনার্য জাতিরা দর্শনে কোনো প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। পীত জাতিরা, চীন ও জাপান, অন্য অনেক বিষয়েই সভ্যতার আর-সকল দিকে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে; শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ইহাদের দান আজ পর্যন্ত কম নয়। প্রাচীন চীনে যথেষ্ট বিদ্যাচর্চাও ছিল। ভারতের ইতিহাসের সঙ্গেও প্রাচীন চীন নানাভাবে জড়িত। ফাহিয়ান, হিউয়েনসঙ, প্রভৃতির নাম তো ছোটোবেলা হইতেই আমরা শুনিয়া আসিতেছি। নালন্দায়, তক্ষশীলায় চীনা পণ্ডিতেরা আসিতেন, অধ্যয়ন করিতেন, এবং অধ্যাপনাও হয়তো করিতেন। ভারতের, বিশেষত বৌদ্ধ ভারতের, কত লুপ্ত বিদ্যা চীনের ভাণ্ডারে থাকিয়া ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু সত্যকার দর্শন চীন নিজে খুব বেশী উৎপাদন করিতে পারে নাই। কন্‌ফিউসিয়াসের শিক্ষার আর যাহা মূল্য থাকুক না কেন, তাঁহাকে ঠিক দার্শনিক বলা চলে না। মধ্যযুগে চীনের নামের সঙ্গে যুক্ত, মহাচীন, চীনাচার, ইত্যাদি নামে অভিহিত, যে সব তন্ত্রগ্রন্থ এদেশে আসিয়াছিল কিংবা

উৎপন্ন হইয়াছিল, সে সব যদি চীনেরই দান হয়, তবে সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইবার কোনো কারণ দেখি না।

জাপান আধুনিক জাতি, প্রতীচীর যোগ্য শিষ্য। অস্ত্রশস্ত্রে ব্যোমযানে ও বোমায়, প্রতীচীর সঙ্গে যুঝিয়াছে। একবার জিতিয়াছিল; এবার হারিয়াছে, আবার হয়তো লড়িবে। সাহিত্যে বিজ্ঞানেও সে অনগ্রসর নয়। কিন্তু কই, তাহার কোনো দার্শনিক চিন্তার তো পরিচয় পাই না।

আফ্রিকার নিগ্রোরা অসভ্য জাতি। আমেরিকায় যাদের প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহেরা ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রীত হইয়াছিল, তাহারা আমেরিকার সংস্পর্শে আসিয়া সভ্য হইয়াছে। সাহিত্যও রচনা করে-- নিজেদের আফ্রিকার ভাষায় নহে, আমেরিকার ইংরেজীতে। অতি করুণ সাহিত্য উহা।[১] কিন্তু দর্শন বলিতে যাহা বুঝি, সে জিনিস তো উহাদের মন হইতে আসে নাই।

পৃথিবীর আর একটা বড়ো জাতি সেমেটিক—আরবের বাসিন্দারা এবং ইহুদী প্রভৃতি। এই জাতির ধর্মপ্রাণতা প্রসিদ্ধ। তিনটি ধর্ম ইহারা জগৎকে দান করিয়াছে—ইহুদী, খ্রীস্টান এবং ইসলাম। সেই জন্যই হউক অথবা অন্য কারণে দর্শনে ইহারা প্রাচীন গ্রীস কিংবা ভারতের মতো প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। ইসলামে দার্শনিক চিন্তা দেখা দিয়াছিল। সুফিদের চিন্তার ভিতর ভারতের যোগদর্শন ও বেদান্তের অনেক কথা পাওয়া যায়। কে কাহার নিকট ধার লইয়াছে বলিতে না পারিলেও সাদৃশ্য যে রহিয়াছে তাহা বলা চলে। কিন্তু দর্শন শাসন মানিতে চায় না। বিশেষত ধর্মের শাসন যেখানে কঠোর,

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫১। দ্রষ্টব্য "আমেরিকান নিগ্রো কবিতা", শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

টবের গাছের মতো দর্শন সেখানে খুব বেশি উচ্চে মাথা তুলিতে পারে না।

চিরপ্রবাসী ইহুদীরা ইউরোপের সমাজের অনুকম্পায় দার্শনিক চিন্তায় অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। আধুনিক যুগের প্রথমদিক দিয়া স্পিনোজা, বর্তমানে বার্গস, আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি নাম-করা দার্শনিক অনেকেই জাতিতে ইহুদী। বড়ো বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনও তাই।

কিন্তু এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত বাদ দিলে দর্শন আর্যজাতির সন্তান। অর্থাৎ, যে জাতি মেরুপ্রদেশ হইতে অথবা[১] মধ্য-ইউরোপ কিংবা মধ্য-এশিয়ার কোথাও হইতে দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া ঋগ্বেদ রচনার সময়ে কিংবা তাহারও বহু পূর্বে একদিকে ইউরোপ ও অন্যদিকে পারস্য হইয়া হিন্দুকুশ পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, দর্শন তাহাদেরই সন্তান। প্রাচীন গ্রীস ও গ্রীসের উপনিবেশ, ভারত এবং আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকা সম্বন্ধে এই কথা সত্য।

ইহার অর্থ কি এই যে জগতের আর্যছাড়া জাতিরা কখনও দার্শনিক হইতে পারিবে না। এখনও পারে নাই, এই পর্যন্ত আমরা বলিতে পারি, ভবিষ্যতের কথা কে বলিবে।

২. তাহার পর; বাহ্য আনুকূল্যের কথা। বাহ্য আবেষ্টনীর অন্তর্গত মানুষের সমাজ ও বাহ্য জড়প্রকৃতি। জড়প্রকৃতির আনুকূল্যের কথা আমরা বলিয়াছি। যে দেশের আবহাওয়ায় দেহ রক্ষার জন্যই মানুষকে দিনরাত প্রচুর পরিশ্রম করিতে হয়—অনবরত প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করিয়া—বন্যা কিংবা বরফ, ঘূর্ণি কিংবা ভূমিকম্পের সঙ্গে

১ Cambridge History of India (Aryans)

যুদ্ধ করিয়া গৃহরক্ষা ও খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয়— সে দেশের লোকেরা নিষ্ঠুর প্রকৃতির সঙ্গে নিষ্ঠুর সংগ্রাম করিতে অভ্যস্ত হয়; কিন্তু কবি কিংবা দার্শনিক হওয়ার মতো প্রবৃত্তি তাহাদের মনে আসিবার অবকাশ পায় না। যেখানে সহজলভ্য খাদ্য, সহজ দৈহিক জীবনে সাহায্য করে, আর সুন্দর ও মহৎ একাধারে প্রকৃতিতে বিরাজ করে— যেমন নির্মল আকাশ, মলয় অনিল, সমুদ্রের লহরী ও উত্তুঙ্গ পর্বত— সে দেশে কাব্য ও দর্শন উভয়েরই আবির্ভাব সহজ।

কিন্তু এই জড় প্রকৃতি ছাড়া আরও একটা জিনিসের সহায়তা দর্শনের আবির্ভাবের পক্ষে প্রয়োজন হয়; সেটি মানুষের সমাজ। যে সমাজে সকলেই চাষী কিংবা যোদ্ধা কিংবা ব্যাধ, সে সমাজে দার্শনিক হইবে কে। দর্শন বিলাস ও ব্যসনের মধ্যেও জন্ম লোয় না; সুতরাং ধনীর সংখ্যা কোনো সমাজে প্রচুর হইলেই সেখানে দার্শনিক দেখা দেয় না। কিন্তু দর্শন অনলস মনের অবসরপুষ্ট অবদান। যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত এক শ্রেণীর লোকের ভাবিবার অবসর আছে এবং ভাবিবার শক্তি আছে, সে সমাজেই দর্শনের আবির্ভাব সম্ভব। যাহার জীবনের সমগ্র জাগ্রত সময়টুকু সংসারের চিন্তায়ই ব্যয়িত হয়, সে দর্শন ভাবিবে কখন? প্রাচীন গ্রীসের এবং ভারতের সমাজে এমন এক শ্রেণীর লোক ছিল, যাহারা বিলাস-ব্যসনে মগ্ন ছিল না অথচ অন্নচিন্তায় চব্বিশ ঘণ্টাই ব্যাকুলও থাকিত না— দেহের প্রয়োজন সংকুচিত করিয়াও যাহারা অন্নচিন্তার সময় কমাইয়া লইত অথচ যাহাদের অন্যচিন্তা করিবার শক্তি ছিল; এই শ্রেণীর ভিতরেই দার্শনিকদের জন্ম হইয়াছিল।

এখনও যাহারা রাষ্ট্রের ভাণ্ডার হইতে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে জীবনযাত্রার মতো পাথেয় পায় এবং বিলাসে মগ্ন না হইয়া চিন্তা

করিবার শক্তি রাখে, তাহারাই দর্শনের চর্চা করিয়া থাকে। সকালে বেশভূষা, দিনে রাজনীতি, অর্থনীতি ও কূটনীতি, সন্ধ্যায় সিনেমা এবং তারপর পান, আহার ইত্যাদি,—এই যাহাদের দিনের কর্মসূচী, প্রকৃত দর্শন তাহাদিগকে ভয় পায় ও বর্জন করে।

"বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম,
গোপায় মা শেবধিস্তেঽহমস্মি;
অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায়
ন মাং প্রদাঃ বীর্যবতী তথাস্যাম।"

"বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া কহিলেন, আমাকে রক্ষা করো, আমি তোমার অমূল্য নিধি; অসূয়ক, অসরল এবং অসংযত যাহারা তাহাদের নিকট আমাকে দিয়ো না; তাহা হইলেই আমি বাড়িয়া চলিব।"—এই বিদ্যার ক্রোড়ে দার্শনিক বিদ্যাও রহিয়াছে।

(খ) ভারতে

যে প্রতিবেশের মধ্যে দর্শনের আবির্ভাব হয় বলিয়া আমরা সাধারণভাবে সিদ্ধান্ত করিয়াছি, বিশেষভাবে ভারতে তাহার কোনো ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। ভারতের প্রকৃতির সৌন্দর্য ও ঔদার্য প্রসিদ্ধ। আর, ভারতের সমাজে অতি প্রাচীন কাল হইতেই এমন এক শ্রেণীর লোক ছিল যাহাদের দৈহিক প্রয়োজন খুব বেশি ছিল না। শান্ত, অনাড়ম্বর জীবনের ভিতর অব্যবহিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিষয়ও চিন্তা করিবার অবসর তাহাদের ছিল; এবং সে শক্তিও তাহাদিগকে ভগবান দিয়াছিলেন। সুতরাং দর্শনের উৎপত্তি এখানে সহজেই হইতে পারিয়াছিল।

এই বিশাল দেশের কোথায় আকাশ বেশি নির্মল, ইহা যেমন

চিরতরে নির্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না, তেমনই কোন্ কোন জায়গায় দর্শনের প্রথম অবির্ভাব এবং প্রবল বেগ দেখা গিয়াছিল তাহাও ভৌগোলিক হিসাবে সীমা-নির্দেশ করিয়া বলা কঠিন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর যে প্রদেশ, সেই কাশ্মীরে কাব্য, সাহিত্য এবং দর্শন, কোনোটিই খুব প্রচুর পরিমাণে দেখা দেয় নাই। ঋকবেদের কতক অংশ হয়তো পঞ্চনদে জন্মলাভ করিয়াছিল। কিন্তু তারপর আর্যকৃষ্টি ক্রমশ পূর্বে এবং তাহার পরে বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করিয়া দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। গঙ্গার তীর ধরিয়া পূর্বদিকে ইহার বিস্তৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। গঙ্গাকে যে এত পবিত্র মনে করা হয়, ইহাও বোধ হয় তাহার একটি কারণ।

তাহার পর উপনিষদের ভিতর কাশী, বিদেহ ও মগধের উল্লেখ পাই। সেই সব বর্ণনা ও উক্তি আলোচনা করিলে মনে হয় বিদেহ মগধ অর্থাৎ আধুনিক বিহার অনেক শাস্ত্র চর্চার এবং দার্শনিক চিন্তার ভূমি হইয়াছিল। জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর এবং বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা শাক্যমুনির জীবন ও প্রচার এই প্রদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংপৃক্ত; সুতরাং কোনো এক সময়ে এবং অন্তত কিছুকালের জন্য এই প্রদেশ যে দর্শনের জন্মভূমি না হইলেও জীবনভূমি হইয়াছিল, তাহা বলা চলে। তারপর কিছুকাল দাক্ষিণাত্য দর্শনের আলোচনার কেন্দ্র হয়। শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দার্শনিকদের অনেকেরই জন্মস্থান ঐ প্রদেশ। বাংলার নবদ্বীপ প্রভৃতির উল্লেখও ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে না করিলে চলে না। গ্রামে গ্রামে এবং গৃহে গৃহে দার্শনিকের আবির্ভাব সম্ভব হয় না। কিন্তু এই বিশাল দেশের কোনো ভূমিই একেবারে দর্শনের অস্পৃশ্য হইয়া থাকে নাই।

ভারতে দর্শনের আবির্ভাব কাল

জায়গার মাপ এবং কালের গণনায় যে একটা অসুবিধা থাকিতে পারে, এ কথাটা আমরা সব সময় মনে রাখি না। ভূমণ্ডলের মানচিত্রে কতকটা অভ্যস্ত বলিয়া দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশের সাহায্যে কোনো দেশের অবস্থান একরকম ভাবিতে পারি; আর, দেয়ালপঞ্জিকার দিকে তাকাইয়াই সন, তারিখ, বার সহজেই মনে করিতে পারি। এটি আধুনিক সভ্য সমাজের অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহার মধ্যে যে জটিল ও কঠিন কিছু থাকিতে পারে, সেটি স্মৃতিতে সব সময় আসে না। কিন্তু ব্যাপারটি অভ্যাসের দরুন কতকটা সহজ হইয়া গিয়া থাকিলেও তত সহজ নয়।

পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব বই পড়িয়া মুখস্থ করিয়া রাখিলেও কী করিয়া উহা মাপিতে হয়, সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা অনেকেরই নাই। আর, বৃহস্পতি হইতে ছায়াপথ কিংবা মৃগশিরা নক্ষত্র কত দূরে, সকলেই আমরা জানি কি।

কালের পরিমাণ নির্ণয়েও এইরূপ অসুবিধা তো আছেই। কলিকাতার সকাল ৮৷৷৹টা যে টোকিও কিংবা লণ্ডন কিংবা ওয়াশিংটনেরও ৮৷৷৹ টা নয়, সে কথা শিক্ষিত সকলেই জানে। কিন্তু দিনের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধির কথা সবসময় আমাদের মনে থাকে কি। আবার পঞ্জিকা খুলিলেই দেখা যাইবে মাসের পরিমাণ নির্দিষ্ট নাই। জ্যৈষ্ঠ মাস ৩১ দিনেও শেষ হয়; ৩২ দিনেও হইয়া থাকে। ইউরোপীয় গণনায় মাসগুলি এখন নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেখানেও চার বৎসর পর ফেব্রুআরির একদিন বাড়ে। তারপর,

আমাদের পঞ্জিকায় মাস দুই প্রকার—সৌর ও চান্দ্র ; উভয়ের পরিমাণ সমান নয়। চান্দ্র মাস আবার দুই রকমের— মুখ্য ও গৌণ।

এই সমস্ত গণনা এখন চলিতেছে। ইহাদের উল্লেখ করিতেছি শুধু জিনিসটার জটিলতা বুঝাইবার জন্য। কিন্তু জটিলতা এইখানেই শেষ হইল না। এর পর বৎসর আছে। চান্দ্র বৎসর ও সৌর বৎসর সমান নয়। ইহার উপর বৎসর আরম্ভের কথা। এখন আমাদের বাংলা বৎসর বৈশাখে আরম্ভ হয় আর পাশ্চাত্ত্য বৎসব জানুয়ারিতে। কিন্তু চিরকালই তো তাহা হয় নাই। কখনো শুনি প্রাচীন ভারতের বৎসর আরম্ভ হইত অগ্রহায়ণে আবার কখনো শুনি আষাঢ়ে। ইহার উপর অব্দের কথা। আমরা একাধিক অব্দের সঙ্গে এখন পরিচিত। খ্রীস্টান এবং অখ্রীস্টান পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এখন খ্রীষ্টীয় অব্দ গণনা স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং সেই অনুসারে ইতিহাসের কাল নির্ণয় হয়। আমরাও এখন তাহাই করি। কিন্তু আমরা একাধিক অব্দের সঙ্গে পরিচিত। বিক্রমাব্দ, শকাব্দ ও বঙ্গাব্দ তো আছেই। তার উপর মুসলমানদের হিজরা। ইহাব সঙ্গে খ্রীস্টাব্দ যোগ করিলে কয়টি অব্দ দাঁড়ায় ?

এখন একটা অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া ততটা কঠিন মনে না হইলেও একটা জটিলতা যে এই গণনায় রহিয়াছে তাহা তো অস্বীকার করার উপায় নাই। মনে রাখিতে হইবে, প্রাচীন কালে উহা আরো জটিল ছিল। প্রথমত তখন সর্বত্র গৃহীত কোনো একটা ‘অব্দ’ প্রচলিত ছিল না ; যে কোনো পরাক্রান্ত রাজা নিজের প্রভুত্বের আরম্ভের দিন হইতে একটা নূতন অব্দ চালাইতে পারিতেন। সুতরাং ভিন্ন দেশে ভিন্ন অব্দ তো ছিলই ; অধিকন্তু একই দেশেও রাজার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অব্দও পরিবর্তিত হইয়া যাইত। এ সব কারণে

কাল গণনা যে কঠিন ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শুধু ভারতে নয়, মিশরে গ্রীসে রোমেও সে অসুবিধা কম বেশি ছিল। কিন্তু সে সব দেশের ইতিহাস এখন খ্রীষ্টীয় অব্দের সঙ্গে মিলাইয়া পণ্ডিতেরা এক রকম নিশ্চিত করিয়া ফেলিয়াছেন। ভারতের বেলায় তাহা এখনও আলোছায়ায় মিশ্রিত রহিয়াছে। এই সব কারণে প্রাচীন ভারতের অনেক ঘটনার কাল নির্ণয় একটু দুরূহ। ভারতের বেলায় এই দেশ ও কাল নির্ণয় দুরূহ হওয়ার আরও একটি কারণ রহিয়াছে। এখানে দেশের চিন্তার ভাণ্ডারে যাঁহারা দান করিয়াছেন তাঁহারা চিন্তাটাকেই শুধু রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন, নিজেদের স্মৃতি-রক্ষার জন্য কোনো ব্যগ্রতা দেখান নাই; পরবর্তী অনুরক্ত ও অননুরক্ত সমালোচকদেরও সে ব্যগ্রতা ছিল না। একথা বাদরি বলিয়াছেন কিংবা ইহা জৈমিনির মত (ইতি বাদরিঃ, ইতি জৈমিনিঃ), এই পর্যন্ত বলিয়াই আলোচনা হইয়াছে। বাদরি ও জৈমিনির জীবন ও সংসার, তাঁহাদের স্ত্রীপুত্র ও বিত্তসম্পত্তি, এমনকি বাসস্থানের ও আবির্ভাব সময়ের কথাও কেহ মনে রাখিতে চেষ্টা করে নাই। অনেকের বেলায় পরে এমন একটা সময়ও আসিয়াছে যখন শুধু তাহাদের মননটাই লোকে মনে রাখিয়াছে। মননকারীর নামটিও ভুলিয়া গিয়াছে। তখন, শ্রুতিতে আছে অথবা 'এইরূপ শোনা যায়' কিংবা স্মৃতিতে আছে অথবা 'এইরূপ মনে হয়' (ইতি শ্রূয়তে, স্মর্যতে, ইত্যাদি বলিয়া মননকারীকে বাদ দিয়া তাহার সিদ্ধান্তের আলোচনা হইয়াছে।

তথাপি বড়ো বড়ো ঘটনার মোটামুটি কালনির্ণয় আধুনিক গবেষণার ফলে অনেকটা হইয়া গিয়াছে। অবশ্যই এইসব গণনায় দুই এক শত বৎসরের তারতম্য সব সময়ই মার্জনীয়; এমনকি হাজার বৎসরের

তারতম্যও অমার্জনীয় নয়। যথা, ঋগ্‌বেদের আবির্ভাব খ্রীস্টের আবির্ভাবের ১২০০ শত বৎসর হইতে ৫০০০ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো জায়গায় স্থাপন করা হইয়া থাকে। নিশ্চিত সাক্ষ্য ও প্রমাণ কাহারও পক্ষেই নাই; দুই একটি যুক্তি সকল মতের পক্ষেই আছে।

কাল-গণনায় এই কুহেলিকার ভিতর দর্শনের আবির্ভাব-কাল কোথায় ফেলিব? এই প্রশ্নের উত্তর খুব নৈরাশ্যজনক নয়। কেননা, সাধারণভাবে ভারত-ইতিহাসের বড়ো বড়ো কতকগুলি ঘটনার সময় ও ক্রম এক রকম নিশ্চিত হইয়াছে। সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত না হইলেও পার্থক্যের সম্ভাবনা ও পরিমাণ অন্তত সকলের মতেই সিদ্ধ। ঋগ্‌বেদ যে ভারতের আদিম গ্রন্থ তাহাতে আর দ্বিমত নাই। সাম, যজু ও অথর্ব যে পরে আসিয়াছে তাহাও আধুনিক পণ্ডিতদের মতে ঠিক। তারপর ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ এবং শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম এই তিন শ্রেণীর সূত্র সকল রচিত হইয়াছে, এ সম্বন্ধেও তর্ক নাই। বুদ্ধের আবির্ভাবের কালও একরূপ স্থির নিশ্চিত। উপনিষদের কতকগুলি যে বুদ্ধের আগে তাহাও স্বীকৃত আর সবগুলিই যে বুদ্ধের আগে নয় তাহাও স্বীকৃত। অনেক পরেও কোনো কোনো উপনিষদ রচিত হইয়াছে। 'আল্লোপনিষৎ' নামে একখানা পুঁথি বা জীর্ণ-পত্র মাদ্রাজে আদিয়ার (Adyer) লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে— যাহাতে 'আল্লার' গুণগান করা হইয়াছে এবং তাঁহার নামে মুক্তি হয় বলা হইয়াছে— তাহা যে বৈদিক যুগের রচনা নয়, ইহাও কি তর্কদ্বারা বুঝাইতে হইবে।

খ্রীস্টের আবির্ভাবটাকে একটা বিন্দু ধরিয়া সেখান হইতে পিছনে ও সম্মুখে রেখা টানিয়া আমাদের প্রয়োজনীয় ঘটনাগুলি সব বসানো যাইতে পারে। ঐ সময়ের পূর্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। আর ব্রাহ্মণ সাহিত্য ও প্রাচীনতম উপনিষদগুলি ঐ সময়েরও

৩০০।৪০০ বৎসর আগেকার রচনা, ইহাও সাধারণত স্বীকৃত। উপনিষদগুলির কোন্‌টি কবে রচিত হইয়াছে বলিতে না পারিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহার কতকগুলি প্রাচীন আর অনেকগুলি অর্বাচীন। প্রাচীনগুলির মধ্যে কতক বুদ্ধের আগে কতক সমসাময়িক এবং কতক পরবর্তী সাধারণ ভাবে ইহা বলা যাইতে পারে। উপনিষদ-গুলির মধ্যে প্রাচীন অর্বাচীন পৃথক করা মোটেই কঠিন নয়। যে সব উপনিষদ বেদান্তের ভাষ্য সমূহে উদ্ধৃত কিংবা উল্লিখিত হইয়াছে তাহারা সব প্রাচীন। যথা, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, শ্বেতাশ্বতর কৌষীতকী, জাবাল, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য। ইহা ছাড়া বাকিগুলি ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে পড়িবে। প্রাচীন উপনিষদগুলি ভারতের দার্শনিক সাহিত্যের প্রথম স্তর। সুতরাং খ্রীস্টের ৬০০।৭০০ বৎসর আগে ভারতে দর্শনের আবির্ভাব হয়, ইহা প্রতিবাদের ভয় না করিয়াই বলা চলে।

দার্শনিক কালে ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজ

দর্শনের আবির্ভাবের পক্ষে অনুকূল একটা প্রতিবেশ না থাকিলে দর্শনের জন্ম হয় না এ কথা আমরা বলিয়াছি। এই প্রতিবেশের মধ্যে রাষ্ট্র এবং সমাজও পরিগণিত হয়। খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে ভারতে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থা যাহা ছিল তাহাও দর্শনের অনুকূলই ছিল। দর্শনের অর্থ কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা। এই প্রশ্ন সকলের মনেই জাগে না এবং সব সময়ও ওঠে না। একটা সমাজ যদি গতানুগতিকভাবে জীবন যাপন করিয়া যাইতে থাকে তবে তাহার কোনো প্রশ্ন মীমাংসার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অন্যবিধ সমাজের সঙ্গে যদি তার সম্পর্ক ঘটিয়া যায় তবে সেই ঘাত প্রতিঘাতে

নানাবিধ প্রশ্ন উঠে। যাহারা চিরকাল আকাশের বিদ্যুৎ অথবা মৃত্তিকার মূর্তিকে প্রাণবান দেবতা মনে করিয়া পূজা করে, তাহাদিগকে যদি হঠাৎ কেহ আসিয়া বলে এবং প্রমাণ করিয়া দেওয়ার স্পর্ধা দেখায় যে, উহারা দেবতা নয়; তাহা হইলে পূজকের মনে একটা প্রশ্ন উঠিবে 'তবে, এতকাল কি ভুল করিলাম।' ঠিক এইভাবে প্রাচীন গ্রীসের ও রোমের পৌরাণিক দেবতাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছিল এবং উত্তরে তাহাদের পূজা লোপ পাইয়াছিল। এই প্রকারে ভিন্ন প্রকৃতির এবং ভিন্ন আকৃতির সমাজের সংস্পর্শে আসিলে যাহাদের চিন্তা করিবার শক্তি আছে তাহাদের মনে নানারূপ প্রশ্ন উঠিতে বাধ্য। যে সময়ের কথা আমরা ভাবিতেছি ভারতে সেই সময়ে এইরূপ ভিন্ন সমাজের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটিতেছিল। মিশর, গ্রীস, পারস্য প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ভারতের লোকের আনাগোনা অনেক প্রাচীন কাল হইতেই ঘটিতেছিল, এবং মধ্য এশিয়ার শক প্রভৃতি জাতিরও ভারতে আসা-যাওয়া চলিতেছিল। বাণিজ্য, আক্রমণ ও প্রতিরোধ, উপনিবেশ ও রাজ্য স্থাপন, ইত্যাদি দ্বারাও ভারত ও বহির্ভারতের সঙ্গে কমবেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক একটা ছিল। এই সময়ের কাছাকাছি পারস্য, উত্তর-ভারতে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং কিছুকাল পরে সেকেন্দরের ভারত আক্রমণের ফলে গ্রীকদেরও ন্যূনাধিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার ফলে চিন্তাশীলের মনে নানাপ্রকার প্রশ্ন উঠা অস্বাভাবিক নয়।

তারপর, কোনো সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও যদি এরূপ হয় যে, শ্রেণীবিশেষের অধিকার ও প্রভাব অন্যশ্রেণী সহ্য করিতে পারিতেছে না, তাহা হইলেও কতকগুলি জিজ্ঞাসার আবির্ভাব অনিবার্য। কেন

প্রচলিত প্রথাই বর্তমান থাকিবে, কেন অন্যরূপ হইবে না, তাহা জিজ্ঞাসু মন জানিতে চাহিবেই।

আবার, দেশের ধর্ম ও আচারও যদি এমন হয় যে, ভাবিলে তাহা সমর্থন করা যায় না, তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠিবে, কেন সেই আচার লোকে পরিত্যাগ করিবে না।

বুদ্ধের সমসাময়িক কালে ভারতের মনে এইসব কারণে এই রকমের জিজ্ঞাসা জাগিতেছিল। শক্তিমান আর্যদের ভিতর তখন বৈদিক ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত। বৈদিক ধর্মে পশুবধ বিহিত ছিল। যজ্ঞে অথবা অন্যভাবে নিহত এই সব পশুর মাংস আর্যেরা ভক্ষণ করিতেন। কিংবদন্তী আছে, দশপুরের রাজা রন্তিদেব যজ্ঞাদিতে এত গো প্রভৃতি ও পশু বধ করিতেন যে তাহাদের স্তূপীকৃত চামড়া হইতে যে রক্ত বাহিয়া পড়িত তাহাতে একটা নদী উৎপন্ন হইয়া গিয়াছিল। নদীর নাম হইয়াছিল চর্মন্বতী। কালিদাস (মেঘদূত—১।৪৭) উহাকে রন্তিদেবের কীর্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

"স্রোতোমূর্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্তিং।"

রাজা অশোক বৌদ্ধ হওয়ার আগে যথেষ্ট পশু বধ করিতেন— ইহাও ইতিহাসের কথা। কিন্তু এই যে পশুবধ সমন্বিত যজ্ঞময় ধর্ম তাহা কি দেশের সকলেরই মনঃপূত ছিল। আর্যেরা যাহাদিগকে রাক্ষস বলিয়া ঘৃণা করিতেন, সেইসব অনার্যেরা যে অনেক সময় এইসব যজ্ঞ ভাঙিয়া দিতে চেষ্টা করিত, তাহার কত বর্ণনা রামায়ণে মহাভারতে পাই। তাহা ছাড়া, যজ্ঞের এই 'পশুঘাত' যে বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে বুদ্ধের অভিযোগের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহাও তো স্বীকৃত। সুতরাং দেশের তদানীন্তন সমাজের বহু লোকের মনে যে গৃহীত আচার ও ধর্মের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ গুমরিয়া গুমরিয়া জ্বলিতেছিল তাহার

প্রমাণ আছে। মহাবীর এবং বুদ্ধ— জৈন ও বৌদ্ধধর্ম যে সেই যুগে আবির্ভূত হইয়াছিল, ইহাই তাহার একটা বড়ো প্রমাণ। দেশের কেহই যদি বেদের বিরুদ্ধ কথা শুনিতে না চাহিত, তাহা হইলে এইসব নূতন ধর্ম অথবা ধর্ম-সংস্কার সম্ভব হইত না।

সমাজে দার্শনিকের স্থান

জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু সাহিত্য এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকের প্রমাণের সাহায্যে খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীর ভারতের সামাজিক অবস্থান অনেকটা জানা যায়।[১] তখন রাজা ও প্রজা যেমন ছিল, তেমনই কোনো কোনো স্থানে সাধারণ গণতন্ত্রও ছিল। চন্দ্রগুপ্তের আগে কোনো স্থায়ী এবং বড়ো সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব জানা যায় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে ও গণতন্ত্রে দেশ বিভক্ত ছিল। তাহার মধ্যে কোশল (বর্তমান অযোধ্যা প্রদেশ), মগধ (পাটনা ও গয়া) বিদেহ (উত্তরবিহার, ছাপরা, মজঃফরপুর) ইত্যাদিই বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। উত্তর পশ্চিমে অর্থাৎ পঞ্চনদে কুরু ও পাঞ্চালদের দেশ অনেক আগে হইতেই প্রসিদ্ধ ছিল এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম সেখানেই অপেক্ষাকৃত বেশি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ই প্রধান ছিলেন। কিন্তু ধনী বৈশ্যদেব প্রতিষ্ঠাও কম ছিল না। নানাবিধ ব্যবসায় ও বাণিজ্য এই বৈশ্যদেরই হাতে ছিল। কৃষিও শাস্ত্রমত ইহাদেরই কাজ; কিন্তু মাঝে মাঝে ভাড়া করা মজুর দ্বারাও চাষ-আবাদ করানো হইত বলিয়া মনে হয়। বাজার, মেলা ইত্যাদির বর্ণনাও কমবেশি পাওয়া যায়। দেশে আর্থিক প্রাচুর্য ছিল বলিয়াই মনে হয়। চুরি ডাকাতি ইত্যাদি পাপকর্ম ঘটিত, তবে

১ Cambridge History of India.

কম। 'শ্রুতৌ তস্করতা স্থিতা'— চুরির কথা লোকে শুধু শুনিতই দেখিতে পাইত না— বলিয়া কবি যে রাজ্যবিশেষে চুরির একেবারে অভাব বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ষোল আনায় সত্য না হইলেও একেবারে অসত্য মনে করিবারও কোনো হেতু নাই।

রেল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও ইত্যাদি অবশ্যই ছিল না। কিন্তু রাস্তাঘাট ছিল, যানবাহন ছিল, নদী ও সমুদ্রে চলিবার মতো যান-বাহনও ছিল।

দেশ গ্রাম ও নগরে বিভক্ত ছিল। বাড়িগুলি একেবারে হাল ফ্যাশানের না হইলেও বাসের অযোগ্য ছিল না। মধ্যে মধ্যে কোনো নদীর তীরে কিংবা পর্বতের পাদমূলে তপস্বীদের তপোবনও ছিল। কুটীরে বসিয়া ঋষিরা অধ্যাপনা করিতেন এরূপ বৃত্তান্তও অনেক পাওয়া যায়। সমাজে গৃহী ও গৃহহীন সন্ন্যাসী উভয়বিধ লোকই ছিল। মহাবীর ও বুদ্ধের আগেও অনেক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের প্রমাণ আছে। তখনকার লোক-সংখ্যার কোনো স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর কথা শুনা যায়। তাহার ঐতিহাসিক মূল্য কত বলা কঠিন। আদমসুমারি প্রচলিতও ছিল না— সম্ভবও ছিল না। এখনকার সময় হইতে যে জনসংখ্যা কম ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নাই।

এই জনসংখ্যার মধ্যে আর্যেরা কত ছিলেন, তাহাও নিশ্চিত করা অসম্ভব। সংখ্যায় বেশি না হইলেও শক্তিতে তাহারা প্রবল ছিলেন। অনার্য আদিমবাসীরা কতক আর্যসমাজে শূদ্র হিসাবেই হউক, কিংবা অন্য প্রকারে হউক, স্থান পাইয়াছিল; কতক আর্যসমাজের বাহিরেও ছিল, এখনও আছে।

এই বিচিত্র সমাজের মধ্যে আর্যেরাই ছিলেন বেশি সভ্য, বুদ্ধিমান্

এবং শক্তিমান। দর্শন ইহাদেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। কিন্তু এই আর্যসমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। চারিবর্ণ তো ছিলই; তাছাড়া আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে মিশ্র-বর্ণ অর্থাৎ সংকরও অনেক ছিল; ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা ইত্যাদির নাম হইতে এবং অন্যান্য কারণে তাহা অনুমান করা যায়। শুদ্ধ চতুর্বর্ণযুক্ত সমাজ আদর্শ হইলেও বাস্তবে কখনও ছিল কিনা সন্দেহ।

এই সমাজের মধ্যে দার্শনিকের স্থান ছিল কোথায়। তিনি গৃহী না সন্ন্যাসী, ধনী না নিঃস্ব, ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয় ছিলেন, স্বভাবতই জানিতে ইচ্ছা হয়। একটা কথা প্রথমেই বলা ভালো। দর্শনের আলোচনা লাভজনক ব্যবসায় নয়। অতি আদিমকাল হইতে আজ পর্যন্ত ঠিক ইহা দ্বারাই বিত্তবান খুব বেশি লোক হইতে পারে নাই। গ্রীসে প্ল্যাটো ধনী ছিলেন, কিন্তু সোক্রেতিস্ ছিলেন দরিদ্র। আরিস্ততল রাজার শিক্ষক ছিলেন বলিয়া একেবারে নিঃস্ব নিশ্চয়ই ছিলেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মান দার্শনিক ইম্যানুয়েল কাণ্ট অকৃতদার ছিলেন। কিন্তু দারগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হইয়াছিল। তখন তিনি হিসাব করিতে লাগিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে তাঁহার যে আয় ছিল তাহা দ্বারা তিনি স্ত্রীর এবং দুই একটি ছেলেমেয়ে হইলে তাহাদের খরচ চালাইতে পারিবেন কিনা। হিসাবে এত সময় লাগিয়াছিল যে, যে সুন্দরীর পাণিগ্রহণের ইচ্ছা তাঁহার হইয়াছিল তিনি ধৈর্য হারাইয়া অন্যকে বরণ করিয়া ফেলেন। তাহার পর কাণ্টের আর বিবাহে মতি হয় নাই। এই কাহিনী হইতেই তাহার আর্থিক স্বচ্ছলতার কথা জানা যায়।

ভারতে ঔপনিষদিক দার্শনিক যাজ্ঞবল্ক্য বিত্তবান্ ছিলেন তাহার

প্রমাণ উপনিষদেই রহিয়াছে। কিন্তু সকল দার্শনিকই যে এরূপ বিত্তবান্ ছিলেন না, তাহারও প্রমাণ রহিয়াছে। কিংবদন্তী আছে, নবদ্বীপের পণ্ডিতদের হাঁড়িতে সব সময় চাল থাকিত না।

যাজ্ঞবল্ক্য হইতে আরম্ভ করিয়া চৈতন্যের যুগ পর্যন্ত অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৭০০ হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীঃ ১৮০০ পর্যন্ত এই আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে ভারতে গৃহী, অগৃহী দুই প্রকার দার্শনিকই দেখা যায়। যাজ্ঞবল্ক্যের পুত্র কন্যার কথা কিছু জানা যায় না; কিন্তু তাঁহার দুই স্ত্রী ছিলেন, সে কথা শ্রুতি বলিয়াছে। (বৃঃ উঃ) আর মিথিলার দার্শনিক গঙ্গেশের ছেলের কথাও জানা যায। নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা খাওয়া-পরায় কষ্ট করিলেও অকৃতদার ছিলেন বলিয়া জানি না। কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষত বৌদ্ধযুগের অবসানের পর অর্থাৎ খ্রীঃ ৮ম-৯ম শতাব্দীতে শঙ্কর প্রভৃতি বড়ো বড়ো অনেক দার্শনিকই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন।

সেকেন্দরের সমসাময়িক ও পরবর্তী গ্রীক ঐতিহাসিকেরা ভারতের পণ্ডিতদিগকে নগ্ন পণ্ডিত (gymno-sophist) আখ্যা দিয়াছেন। তাহার কারণ সেকেন্দর কয়েকজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন যাঁহারা বস্ত্রকে অনাবশ্যক মনে করিতেন। কিন্তু তাঁহারাই তখনকার ভারতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এরূপ মনে করার কোনো যুক্তি নাই। আর তাঁহারা হিন্দু না জৈন, তাহাও জানিবার উপায় নাই। জৈনদের মধ্যে দিগম্বর সন্ন্যাসী আছেন। তাঁদের মধ্যেও দর্শন রহিয়াছে। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে হিন্দু এবং অহিন্দু সন্ন্যাসীদের দান দর্শনে বিশেষত জৈন, বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনে প্রচুর।

ভারতের দর্শন ব্রাহ্মণ্য বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত না উহা বেদের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় বিদ্রোহের ফল, এই একটা প্রশ্নও কেহ কেহ তুলিয়াছেন। উপনিষদে একাধিক স্থানে ক্ষত্রিয়ের কাছে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবিদ্যার অর্থাৎ

দর্শনের উপদেশ লইতেছেন, এইরূপ আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। তাহার পর বেদবিরুদ্ধ দুইটি প্রবল ধর্ম জৈন ও বৌদ্ধ ক্ষত্রিয়ের দান। মহাবীর এবং বুদ্ধ উভয়েই ক্ষত্রিয়। ভাগবত ধর্মের প্রবর্তক না হইলেও পূজ্য, স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া গৃহীত, কৃষ্ণ ক্ষত্রকুলে জন্ম লইয়াছিলেন। সুতরাং দার্শনিক বিচার এবং ধর্মসংস্কার ক্ষত্রিয়ের দ্বারাই ঘটিয়াছিল, এইরূপ একটা মত সম্ভব। কথাটা প্রথম বোধ হয় তুলেন জর্মন পণ্ডিত ডয়সেন (Deussen) পরে এদেশে এবং অন্যত্র ও অনেকে এই অভিমত গ্রহণ করিযাছেন। ইহাদের মতে ব্রাহ্মণেরা বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন; স্বাধীন চিন্তার অবকাশ এবং শক্তি তাঁহাদের ছিল না; সুতরাং দর্শন তাঁহাদের সৃষ্টি নহে। যাঁহারা এরূপ মনে করিয়াছেন, তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও অবিশ্বাস সর্বদাই ছিল। উভয়েব মধ্যে কলহ যে না হইয়াছে তাহা নয, কিন্তু সর্বদাই হইত, এমনও নয়। একই সমাজের লোক; ধর্ম, ভাষা ও আচার এক। পরস্পরের ঝগড়া অপেক্ষা সহায়তাই বরং বেশি ছিল— ক্ষাত্রং দ্বিজত্বং চ পরস্পরার্থং— ক্ষত্রিয় ও দ্বিজেরা পরস্পরের সহায়ক এই ছিল গৃহীত নীতি। ক্ষত্রিয়েরা প্রায় সর্বদাই ব্রাহ্মণদের প্রতি— তাহাদের রক্ষিত ধর্ম ও শিক্ষার প্রতি— একটা বিদ্রোহীভাব পোষণ করিতেন, ইহা সত্য নহে।

ক্ষত্রিয়ের হাতে দেশের শাসনশক্তি ছিল। সুতরাং তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে তাঁহারা বাধা দিলে কোনো ধর্মসংস্কার কিংবা নূতন মত প্রচার সম্ভব হইত না, সাধারণভাবে ইহা স্বীকার করা চলে। বিদেহরাজ জনক, কাশীর রাজা অজাতশত্রু, সম্রাট অশোক প্রভৃতি অনেকেই তো দর্শনের এবং নূতন মত প্রচারের প্রচুর সাহায্য

করিয়াছেন। কিন্তু সমাজে ব্রাহ্মণদের কোনো প্রভাব ছিল না, এমনও তো নয়। তাহা ছাড়া, দেখা যায়, যাজ্ঞবল্ক্য হইতে আরম্ভ করিয়া শঙ্কর, রামানুজ, ভাস্কর, গঙ্গেশ, বাসুদেব সার্বভৌম প্রভৃতি সকলেই তো ব্রাহ্মণ। বিদ্যা ব্রাহ্মণের সম্পত্তি এবং বিদ্যাদান ব্রাহ্মণের বিশেষভাবে নিজস্ব কাজ ছিল। সুতরাং দর্শন ক্ষাত্র বীর্য সম্ভূত, ইহা বলা যায় না।

তাই বলিয়া সকল ব্রাহ্মণই দর্শনের চিন্তায় মশগুল হইয়া থাকিতেন এরূপ মনে করিলেও ভুল হইবে। বৈদিক যজ্ঞাদিতে ঋত্বিক, অধ্বর্যু প্রভৃতির কাজ ব্রাহ্মণেরাই করিতেন। তাহা ছাডা রাজাদের বয়স্য ও বিদূষকরূপেও অনেকক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণকেই দেখা যায়। রাজ-অন্তঃপুরের কঞ্চুকীর কাজও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা করিতেন। আর কোনো ছোটো কাজ তাহারা করিতেন না, এ কথাই কি বলা যায়। ভাত রাঁধার কাজ তো এখনও করেন। নীচ ও উচ্চ কাজ সব শ্রেণীর লোকেই করিত এবং এখনও করে। এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে এক শ্রেণীর কথা উপনিষদে পাই যাহাদিগকে ব্রহ্মবাদী বলা হইত। ভারতের দার্শনিকদের ইঁহারাই যে পূর্বপুরুষ, এই সিদ্ধান্তে আপত্তির কোনো কারণ নাই। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই আপ্রাণ চেষ্টায় বৈদিক ধর্ম রক্ষা করিতেছিলেন; আবার আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বিদ্যাকে কর্ম হইতে বড়ো মনে করিয়া দর্শনের বীজ বপন করিতেছিলেন।

এই দার্শনিক ব্রাহ্মণদের বৃত্তি আসিত কোথা হইতে? যাজ্ঞবল্ক্যের মতো ঋষিরা রাজাদের যজ্ঞাদিতে উপস্থিত হইয়া, বিচার করিয়া বিদ্যা দান করিয়া প্রচুর দক্ষিণা পাইতেন। যাজ্ঞবল্ক্য ইহাতে ধনী হইয়া গিয়াছিলেন মনে হয়; অন্যেরাও জীবনধারণ নিশ্চয়ই করিতে পারিতেন। সন্ন্যাসী দার্শনিকদের ভিক্ষা ছিল বৃত্তি, অন্যেরা দান পাইতেন। দেহের প্রয়োজনটা বড়ো করিয়া না ফেলিলে ভারতে

জীবনধারণ খুব কষ্টকর কখনই নয়। তারপর যে সময়ের কথা হইতেছে সে সময়ে দেশে প্রচুর বনও ছিল, বনজাত ফলও পাওয়া যাইত। নৈমিষারণ্যের আম্রফল এখনও দেখার যোগ্য।

এইসব দার্শনিকেরা কখনও শহরে থাকিতেন বলিয়া জানা যায় না। রাজদরবারে, রাজাদের আহ্বানে যজ্ঞাদিতে উপস্থিত হইতেন; কিন্তু বাস করিতেন সাধারণত গ্রামে ও তপোবনে, এবং আরও কঠোর জীবন ছিল যাহাদের তাহারা থাকিতেন মঠ ও আশ্রমে। এইসব আশ্রমাদির প্রচুর বর্ণনা সাহিত্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে।

এইসব স্থানে তাঁহারা জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করিতেন এবং বিদ্যার সঙ্গে অন্নবস্ত্রাদি দিয়া পোষণও করিতেন। যাঁহারা দশসহস্র ছাত্রকে এইরূপ অন্নদানাদি দ্বারা পোষণ করিতেন এবং পড়াইতেন, তাঁহাদিগকে 'কুলপতি' বলিত। কুলপতির এই বর্ণনা হয়তো একটু অতিরঞ্জিত। দশহাজার ছাত্রকে অন্নাদি দ্বারা পোষণ করা একজনের পক্ষে একেবারে অসম্ভব না হইলেও পড়ানো সম্ভব নয়। ইহার ভিতর হইতে অসম্ভবটুকু বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাতে এই মনে হয় যে, বড়ো বড়ো ছাত্রাবাসও দেশে মধ্যে মধ্যে থাকিত এবং আরও অধ্যাপকদের সহায়তায় একজন প্রধান অধ্যাপক ইহাদিগকে পড়াইতেন। পৃথিবীর কোনো জায়গায় কোনো দিনই দশহাজার ছেলে এক সঙ্গে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই, একথা বলা বাহুল্য। সুতরাং ইহাদের সকলেই দর্শন পড়িত না। যদি পড়িত তবে প্ল্যাটোর আশা পূর্ণ হইত, জগৎ হইতে যুদ্ধ বিদূরিত হইত এবং আণবিক বোমারও আর প্রয়োজন হইত না। এইসব অধ্যয়ন অধ্যাপনার ব্যাপারে গুরুদক্ষিণার প্রথা প্রচলিত থাকিলেও অধ্যাপনার কোনো আর্থিক বিনিময় কেহ গ্রহণ করিতেন না। বিনামূল্যে বিদ্যাদান প্রাচীন জগতে প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত ছিল।

গ্রীসেও এক সোফিস্টরা ছাড়া আর-সকলে বিনামূল্যে বিদ্যা দান করিতেন। মধ্যযুগের ইউরোপেও গীর্জার অন্তরালে যে বিদ্যাদান করা হইত, তাহার কোনো 'বাজার-দর' ছিল না'। ব্যগ্র জিজ্ঞাসু অনুসন্ধান করিয়া গুরু বাহির করিত; প্রথিতযশা অধ্যাপকের গৃহে ঠাঁই পাইলে কৃতার্থ হইত; যিনি আশ্রয় দিতেন বিদ্যাও তিনি এমনই বিতরণ করিতেন; অনুসন্ধিৎসুই উহা পাইত, ক্রয় করিয়া কেহ পাইত না। একটা কথা আছে— "গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যা, পুষ্কলেন ধনেন বা। অথবা বিদ্যয়া বিদ্যা, চতুর্থী নোপপদ্যতে"।— ইহাতে বিদ্যা উপার্জনের তিনটি পন্থার মধ্যে প্রচুর টাকারও উল্লেখ আছে। কিন্তু শ্লোকটি মনে হয় পরবর্তী কালের রচনা আর যে ধনের কথা আছে, তাহা ঠিক গুরুর বেতন নয়, দক্ষিণা।

জগৎ ও ভারত

যে সময়ে ভারতে দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া আমরা ধরিয়া লইয়াছি সেই সময়ে অর্থাৎ খ্রীস্টের ৬০০।৭০০ বৎসর পূর্বে তখনকার সমস্ত সভ্য জগতেই একটা প্রবল চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। প্রায় ঐ সময়েই গ্রীক কবি হোমারের আবির্ভাব হয়। হিসিয়ড (Hesiod) তাঁহার কিছু পরে। ভারতে আর্যদের নিকট বেদের যে সম্মান প্রাচীন গ্রীকদের নিকট হোমারেরও সেই সম্মান ছিল। হোমারের গ্রন্থ রামায়ণ মহাভারতের মতো মহাকাব্যের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের চিন্তায় উহার পবিত্রতা বেদের সমকক্ষ ছিল। পরে আস্তে আস্তে বেদের বিরুদ্ধ কথাও যেমন ভারতের লোকে কহিত ও শুনিত, তেমনই হোমারের বিরুদ্ধ সমালোচনাও গ্রীসে পরে

আসিয়াছিল। প্ল্যাটোর লেখায় কবিদের উপর যে বক্র কটাক্ষপাত করা হইয়াছে, হোমারও তাহা হইতে বাদ পড়েন নাই।

ভারতে যেমন বেদের পর বেদান্ত বা উপনিষদের আবির্ভাব হয়, গ্রীসেও তেমনই হোমার ও হিসিয়ডের পর দার্শনিকদের দেখা যায়। খ্রীঃ পূঃ ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও দর্শনের জন্মকাল। ভারতে যেমন, কপিল, কণাদ প্রভৃতি আবির্ভূত হইতে-ছিলেন গ্রীসেও তেমনই সক্রেটিস ও প্ল্যাটো প্রভৃতি আসিতেছিলেন। সুতরাং ঐ কয়েক শত বৎসরকে পৃথিবীর ইতিহাসে দর্শনের যুগ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

দর্শনের উদ্ভব ও আকার

উপনিষদগুলিই ভারতের দার্শনিক সাহিত্যের আদিমগ্রন্থ, ইহা স্বীকৃত। ইহাদের কতকগুলি বুদ্ধের পূর্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টের ন্যূনাধিক ৬০০ শত উৎসর পূর্বে রচিত, ইহাও স্বীকৃত। ভারতে লিপির প্রচার খ্রীষ্টের ৭০০।৮০০ বৎসর আগেও ছিল বলিয়া সাধারণত অনুমান করা হয়। এই লিখন-প্রণালী বাহির হইতে আসিয়াছে, না ভারতের জিনিস তাহা লইয়া যে তর্ক আছে, উহার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। উপনিষদের রচনাকালে লিখনপ্রণালী প্রচলিত ছিল, ইহা বোধ হয় বিতর্কের বাহিরে। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, রচিত গ্রন্থ সব তৎক্ষণাৎ লিখিত হইয়া যাইত এবং লিখিত গ্রন্থই লোকে পড়িত।

ঋগ্‌বেদ যখন রচিত হয় তখন লোকের লিখিত বর্ণের সহিত পরিচয় ছিল বলিয়া মনে হয় না। মনে মনেই এইসব ঋকমন্ত্র রচিত হইত, মুখে মুখে প্রচারিত হইত এবং স্মৃতিতে রক্ষিত হইত, ইহাই সাধারণত পণ্ডিতদের অনুমান। গুরুর নিকট মৌখিক উপদেশই ছাত্রেরা

পাইত ; মুখে মুখেই ছন্দের প্রভেদ ও স্বরের প্রভেদ— উদাত্ত, অনুদাত্ত ইত্যাদি আয়ত্ত করিত এবং আবৃত্তি করিয়া এইসব স্মরণ রাখিত। লিখন প্রচলনের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ বুদ্ধের আবির্ভাবের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত— এইভাবেই বেদ রক্ষিত হইয়াছে।

উপনিষদ্ যাঁহাদের মানস সৃষ্টি তাঁহারাও এইভাবেই এই গদ্য ও পদ্য গ্রন্থগুলি আবৃত্তি করাইয়া ছাত্রদের মনে অঙ্কিত করিয়া রাখিতেন। প্রথম অবস্থায় এইভাবেই এইসব গ্রন্থ উদ্ভূত ও রক্ষিত হইয়াছে, এরূপ মনে করা অসংগত নয়। তাহার পর কে কবে কোথায় এইসব গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল, তাহা জানিবার কোনো উপায় নাই। অনেক আরম্ভের কথাই তো আমরা জানি না। আগুন কে প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিল, জানি কি। উপনিষদগুলি এইরূপে এক সময় লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। জীর্ণ পুঁথির নকল করা হইত। এইভাবে হস্তলিখিত পুঁথি হইতে শেষ পর্যন্ত আধুনিক যুগ ইহাদিগকে উদ্ধার ও রক্ষা করিয়াছে। এখন অবশ্যই মুদ্রাযন্ত্রের অনুকম্পায় ইহাদের বিলোপের আশঙ্কা লোপ পাইয়াছে।

দার্শনিক গ্রন্থহিসাবে উপনিষদগুলি যে আদিম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু দার্শনিক চিন্তা উপনিষদেই প্রথম দেখা দিয়াছিল ইহাও সত্য নয়। লোকে বই রচনা করিবার আগে চিন্তা করে, অনেক সময় একটা কি দুইটা খসড়াও তৈয়ার করে, অনেক সময় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কিম্বা পণ্ডিতগোষ্ঠীতে বিষয়বস্তুটির আলোচনাও হয়, তাহার পর উহা হইতে গ্রন্থ উদ্ভূত হয়। উপনিষদগুলির বেলায়ও সেইরূপ ঘটিয়াছিল, মনে করা চলে। খসড়ার কোনো স্থান সেখানে নাই, কেননা লেখাটা তখন অত সহজ ছিল না। কিন্তু আলোচনা সম্ভব ছিল ; শ্রবণ ও মনন ঘটিতে পারিত ; এবং এ কথা প্রমাণ করা চলে যে, উহা ঘটিয়াছিল।

তাহার পর সেই চিন্তা যখন পূর্ণতা এবং পক্বতা লাভ করে তখনই উহা গ্রন্থে পরিণত হয়। তাহার পর সেই পূর্ণাবয়ব বস্তুটি মুখে মুখে প্রচারিত এবং স্মৃতিতে রক্ষিত হইয়া কোনো এক অজ্ঞাত শুভ মুহূর্তে লিপিবদ্ধ হইয়া স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়।

উপনিষদে যেসব প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছে; স্থায়ী আকার লাভ করার আগে সেগুলি যে কমবেশী আরও আলোচিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ উপনিষদের ভিতরই রহিয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের শেষে একটী দীর্ঘ 'বংশ'-তালিকা দেওয়া আছে। উহা ঐ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের গুরুপরম্পরা ছাড়া আর কী হইতে পারে। তালিকাটির ঐতিহাসিক মূল্য যাহাই হউক, উহা যে একটা পরম্পরা দ্যোতিত করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ করা চলে না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ আরম্ভ হইতেছে 'ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি'— 'ব্রহ্মবাদীবা বলেন' এই বলিয়া। সুতরাং রচয়িতার পূর্ববর্তী দার্শনিক আরও ছিলেন, ইহা স্পষ্ট। তাহা ছাডা যাজ্ঞবল্ক্য, শ্বেতকেতু, আরুণি প্রভৃতি যে সমস্ত পণ্ডিতের মত উপনিষদে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহারা নিজেরাই উহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, এরূপও তো মনে হয় না। লেখার ভঙ্গি হইতেই মনে হয়, তাঁহাদের আলোচনা ও উপদেশ পরম্পরায় প্রাপ্ত হইয়া উপনিষদের কর্তা উহা প্রচারিত করিতেছেন। কাজেই উপনিষদ্ যে সময় রচিত হয়, তাহার অনেক পূর্ব হইতেই একটা দার্শনিক চিন্তাধারা চলিয়া আসিতেছিল, এই সিদ্ধান্তই করিতে হয়।

উপনিষদেরও আগে ঋগ্‌বেদে পুরুষ-সূক্ত ইত্যাদিতে কমবেশী দার্শনিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সময় হইতে উপনিষদগুলির রচনাকাল পর্যন্ত দীর্ঘ শতাব্দীগুলিতে ভারতের জিজ্ঞাসু মন দার্শনিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হইতেছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যায় এবং ইহা সংগত অনুমান।

উপনিষদগুলি 'শ্রুতি'র অন্তর্গত—হিন্দুর পবিত্র গ্রন্থ। তাহাতে যে দর্শনের উদ্ভব হইয়াছে তাহা হিন্দুর দর্শন। সুতরাং দর্শন গোড়াতে হিন্দু-দর্শন। কিন্তু অ-হিন্দু দর্শনও ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিল।

বীজ ও অঙ্কুর

উপনিষদে দর্শনের যে অঙ্কুর দেখা যায় তাহার বীজ অনেক পূর্ব হইতে বপন করা হইতেছিল, এই অনুমান যুক্তিসংগত। কোনো বৃহৎ যজ্ঞ বা ধর্মানুষ্ঠানের পরে সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী একত্র বসিয়া নানাবিধ প্রশ্নের আলোচনা করিতেন তাহার বর্ণনা উপনিষদে এবং ব্রাহ্মণাদিতে অনেক পাওয়া যায়। বিদেহ-রাজ জনকের এক যজ্ঞের পর সমবেত বহু পণ্ডিতের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের যে বিচার হইয়াছিল তাহা প্রসিদ্ধ। সেই সমিতিতে গার্গীও উপস্থিত ছিলেন। শেষ দিক দিয়া শাকল্যের সঙ্গে যাহা হইয়াছিল তাহা খুনাখুনির কাছাকাছি। কেননা, শাকল্যের শিষ্যেরা গুরুর হাড় কয়খানা লইয়া দেশে ফিরিতেছিল একথা বলা আছে। অদৃষ্টের ফেরে পথে এই হাড় কয়খানাও চোরে লইয়া গিয়াছিল ইহাও উক্ত হইয়াছে। জীবন্তমানুষের তো হাড় কয়খানা পুঁটুলিতে ওঠে না। সুতরাং শাকল্য মরিয়া গিয়াছিলেন। উপনিষদ্ উঁহাকে যাজ্ঞবল্ক্যের অভিসম্পাতের ফলরূপে দেখাইয়াছেন, এই মাত্র। কিছুক্ষণ আগেও যে দার্শনিক তর্ক করিয়াছিল, তাহার হঠাৎ-মৃত্যু হয় অভিশাপ, নয় খুন, নয়তো আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুসারে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া লোপ। এই উপাখ্যানের গূঢ় অর্থ যাহাই হউক না কেন, স্পষ্ট অর্থ এই যে, এই রকম সব সভাসমিতিতে নানাবিধ কূট প্রশ্নের আলোচনা হইত—প্রবল বিচার হইত—অনেক সময় উত্তেজনারও সৃষ্টি হইত এবং তাহার ফলে কখনও কখনও যাহা হওয়া উচিত নয় এমন কিছুও ঘটিয়া যাইত।

আলোচনার পটভূমি

ছান্দোগ্য উপনিষদে আরুণি ও তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুর মধ্যে এক দীর্ঘ আলোচনার বর্ণনা পাই। আবার এই শ্বেতকেতুই পঞ্চালদের সমিতিতে উপস্থিত হইলে সেখানকার রাজা প্রবাহন জৈবনি তাঁহাকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন যাহার উত্তর শ্বেতকেতু দিতে পারেন নাই— এমন কি তাঁহার পিতাও উহা জানিতেন না। পরে পিতাপুত্র উভয়ে গিয়া জৈবনির নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-উপনিষদে পিপ্পলাদ ঋষির নিকট কয়েক জন পণ্ডিত গিয়া নানা প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছিলেন, এই বিবরণ পাওয়া যায়।

কঠ উপনিষদে যম ও নচিকেতার মধ্যে যে দীর্ঘ আলোচনার বিবরণ রহিয়াছে তাহার কাব্যাংশ বাদ দিলেও বাস্তবের যে পরিস্ফুট ছায়া দেখা যায়, তাহা হইতে ঐ প্রকার বিচার-বিতর্ক সমাজে যে বহু হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দৃষ্টান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ আলোচনার কাহিনী মহাভারতাদিতেও প্রচুর রহিয়াছে। এই সমস্ত হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়ায় যে দেশের বৃহৎ সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে শাস্ত্র-আলাপ, বিচার-বিতর্ক, প্রশ্ন-উত্তর ও উপদেশ নিয়মিতভাবেই চলিত। এই জিনিসটি এখনও হিন্দুসমাজ হইতে লোপ পায় নাই, তবে দ্রুত তিরোহিত হইতেছে। এইসব আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়াই দর্শনের বীজ উপ্ত হইতে থাকে; আর, সে সমস্ত অঙ্কুরিত হয় উপনিষদ-গুলিতে।

অঙ্কুর ও বৃক্ষ

যে মহাবৃক্ষের বীজ উপনিষদে অঙ্কুরিত হয়, তাহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে বেদান্তসূত্রে। 'বেদান্তসূত্র' নামক যে গ্রন্থ আমাদের হাতে

পৌঁছিয়াছে এবং যাহাকে কেন্দ্র ও ভিত্তি করিয়া এক বিশাল দার্শনিক সাহিত্য রচিত হইয়াছে, কিম্বদন্তী অনুসারে তাহার রচয়িতা বাদরায়ণ। এই কিম্বদন্তী একেবারে অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ নাই। কিন্তু তথাপি আধুনিক সমালোচনা অনুসারে এই সমস্ত সূত্রগুলিই এক হাতের রচনা এবং একই কালে ও একই দেশে রচিত, এরূপ হয়তো নয়। প্রথম যে সূত্র সমষ্টি রচিত হইয়াছিল এবং যাহা বাদরায়ণের কৃতি মনে করা যাইতে পারে, তাহাতে পরবর্তী সময়ে কিছু যোগ বিয়োগ হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিবার পক্ষে যুক্তি আছে।

যাহা হউক, যে সূত্রগুলি আমরা পাইয়াছি, তাহা এমনকি তাহার যোগ-বিয়োগ বাদ দিয়াও বাদরায়ণের রচিত কেন্দ্রস্থানীয় যে সূত্রগুলি থাকিবে, তাহাও উপনিষদ রচনায় অব্যবহিত পরেই ঘটে নাই। এমনকি, পরের শতাব্দীতেও ঘটে নাই। অর্থাৎ উপনিষদ রচনার পরে দীর্ঘকাল কমপক্ষে ৩০০।৪০০ বৎসর উহাদের পঠন-পাঠন, আলোচনা, ব্যাখ্যা ইত্যাদি হইয়া থাকিবে। তাহাতে মতভেদেরও উদ্ভব হইয়া থাকিবে। এই দীর্ঘ আলোচনায় ক্রমশ বেদান্তের মূল সূত্রগুলিতে সংগৃহীত ও সংনিবদ্ধ হয়। বেদান্তসূত্রের ভিতর কাশকৃৎস্ন ঔডুলোমি, আস্মরথ্য প্রভৃতি পূর্বাচার্যের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তাঁহাদের মত আলোচিত হইয়াছে। স্পষ্টই বুঝা যায়, তাঁহারা সূত্রকার বাদরায়ণের পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাতা। সুতরাং দেখা যাইতেছে দর্শনের যে বীজ উপনিষদের পূর্বে চারিদিকে ছড়াইতেছিল সেগুলি উপনিষদে অঙ্কুরিত হয়। তাহার পর দীর্ঘকাল সেই অঙ্কুরে বিচার-গবেষণা-আলোচনার জলসেক পড়িতে থাকে; এবং তাহার পর বেদান্তসূত্রে উহাকে মহীরুহরূপে দেখিতে পাই। ইহার পর এই মহীরুহের অনেক শাখাপ্রশাখা চারিদিকে বিস্তৃত হয়। শঙ্কর, রামানুজ

নিম্বার্ক প্রভৃতি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাতাগণ উপনিষদ্ এবং উপনিষদের অর্থজ্ঞাপক বেদান্তসূত্রকে কেন্দ্র করিয়াই নিজেদের দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উপনিষদ্ শ্রুতি, সুতরাং অবশ্য গ্রাহ্য; আর বেদান্তসূত্র যিনি রচনা করিয়াছিলেন সেই বেদব্যাস বা বাদরায়ণের মতের উপর কথা বলা চলে না। সুতরাং বেদান্তসূত্র উপনিষদের প্রকৃত এবং একমাত্র ব্যাখ্যা। কিন্তু বেদান্তসূত্রের কোন্ সূত্রের কী অর্থ তাহা বিচারসাপেক্ষ এবং তাহা হইতেই পরবর্তী ব্যাখ্যাতা শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতির মধ্যে প্রভেদ সৃষ্ট হইয়াছে।

হিন্দুদর্শনের ত্রিধারা

পাহাড় হইতে যে নদী নামিয়া আসে তাহা এক ধারায় কদাচিৎ আসে; অনেক সময়ই বিভক্ত হইয়া যায়। হরিদ্বারে গঙ্গার ত্রিধারা প্রসিদ্ধ। ভারতের দার্শনিক চিন্তাকে স্রোতের সঙ্গে তুলিত করিলে দেখা যাইবে উহাও মূল উৎস হইতে বহির্গত হইয়া একাধিক ধারায় বিভক্ত হইয়া দেশের মনোরাজ্য প্লাবিত করিয়া গিয়াছে। উপমার সাহায্য আমরা গ্রহণ করি বুঝিবার এবং বুঝাইবার সুবিধার জন্য। দর্শনকে এতক্ষণ বৃক্ষের সঙ্গে তুলিত করা হইয়াছিল অল্প হইতে বৃহতে ইহার বৃদ্ধি বুঝাইবার জন্য। কিন্তু বৃক্ষের বৃদ্ধি ও শাখাপ্রশাখা থাকিলেও তাহার গতি নাই। দর্শন বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু স্থাণু হইয়া থাকে নাই; দেশদেশান্তরে কালের স্রোতের সঙ্গে বহিয়া গিয়াছে। সুতরাং স্রোতের সঙ্গে তাহার উপমা অন্যায় নয়। নদী যেমন একাধিক ধারায় প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে যায়, দর্শনও তেমনি আরম্ভের পর নিজের গতিতে বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হইয়া থাকে। ভারতেও তাহাই হইয়াছিল।

উপনিষদ হইতে দার্শনিক চিন্তার আরম্ভ আমরা ধরিয়া লই; কিন্তু উপনিষদগুলি যে বৃহত্তর বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত সেই ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ইত্যাদিতেও বিচার্য বিষয় রহিয়াছে—কমবেশী বিতর্কের অবকাশ রহিয়াছে। সেখানে প্রধান আলোচ্য বিষয় বৈদিক ধর্মের অনুষ্ঠানের কথা, ক্রিয়াকাণ্ডের কথা। অগ্নিহোত্র হইতে আরম্ভ করিয়া রাজসূয়, বাজপেয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি ছোটো বড়ো যেসব অনুষ্ঠান বৈদিক ধর্মের অঙ্গীভূত ছিল, তাহাদের সম্বন্ধে অনেক বিধিনিষেধ রহিয়াছে। কোন্ মন্ত্রটি, কখন উচ্চারিত হইবে কে কোন্ কাজ করিবেন, কোন্ সময়ে কোন্ কাজ করা হইবে, ইত্যাদি অনেক ছোটো বড়ো বিচারের বিষয় রহিয়াছে। কোথাও হয়তো শাস্ত্র বলিতেছেন, 'মা হিংস্যাৎ' হিংসা করিবে না,—জীববধ ইহাতে নিষিদ্ধ হইল। আবার স্থানান্তরে বলা হইয়াছে—'গাং আলভেত' গরু মারিবে। কোথাও বলা হইতেছে 'উদিতে জুহুয়াৎ' সূর্য উঠিলে হোম করিবে। আবার পরক্ষণেই বলা হইতেছে, 'অনুদিতে জুহুয়াৎ' সূর্য উঠিবার আগে হোম করিবে। দু'টি পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি। একসঙ্গে প্রতিপালন করা চলে না। সুতরাং মীমাংসা প্রয়োজন। কোথাও হয়তো বলা আছে, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া অমুক এই প্রকার পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। ইহা কি পুত্রেষ্টি করার বিধি—না, শুধু উহার প্রশংসা—অর্থাৎ অর্থবাদ? এই প্রকার ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক প্রশ্নই উঠিতে পারে, উঠিয়াছিল, এবং তাহাদের আলোচনা—সেই সকলের বিধি, নিষেধ ইত্যাদির বিচার—বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত সমস্ত হিন্দুধর্মে ছড়াইয়া রহিয়াছে। ইহাও দর্শনের অন্তর্গত। এটি দর্শনের একটি ধারা। ব্রাহ্মণগুলিকে ভিত্তি করিয়া কতকগুলি সূত্রগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্মসূত্র। সেগুলি দার্শনিক বিচার নয়—ব্রাহ্মণগুলির বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত সার

সূত্রাকারে গ্রথিত মাত্র। কিন্তু এই সূত্র ও ব্রাহ্মণগুলিকে ভিত্তি করিয়া দার্শনিক বিচারও হইয়াছে। সেই দার্শনিক সূত্রগ্রন্থকে মীমাংসাসূত্র অথবা পূর্বমীমাংসা বলা হয়; এই চিন্তাধারা বিস্তৃতি লাভ করে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতির স্মৃতিগ্রন্থে এবং আরও পরবর্তী যুগের রঘুনন্দন ইত্যাদির নিবন্ধ গ্রন্থে। এই সমস্তের ভিতর ধর্মের অনুষ্ঠান, দায়ভাগ, অশৌচ বিচার, ইত্যাদি বহু বিষয়েরই আলোচনা—বিধি ও নিষেধ—বিবেচিত হইয়াছে। বৈদিক ব্রাহ্মণগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া স্মার্ত রঘুনন্দন পর্যন্ত যে বিরাট সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহা সবটাই দার্শনিক সাহিত্য এরূপ মনে করা চলে না। ইহার ভিতর দর্শন-বাহ্য বহু বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহারই ভিতরে মীমাংসাদর্শন মরুতে লতাবিতানের মতো আবির্ভূত হইয়াছে। মীমাংসাতেও দর্শনবাহ্য বহু বিষয় রহিয়াছে— কিন্তু উহাতে কিছু দর্শনও রহিয়াছে। ইহাকে ঘিরিয়া যে স্রোত রহিয়াছে, সেটি ভারতীয় দর্শনের একটি ধারা।

কিন্তু দর্শনের মূল ধারা উপনিষদ ও উপনিষদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বেদান্তসূত্র। দর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহের আলোচনা এইখানেই পরিণতি লাভ করিয়াছে। উপনিষদ হইতে সূত্রে পৌঁছিবার পর আর নূতন মৌলিক গ্রন্থ রচনা বিশেষ কিছু হয় নাই। কিন্তু বেদান্ত-সূত্রের বহু ভাষ্য রচিত হইয়া এই দার্শনিক চিন্তাধারাকে নানাদিকে প্রধাবিত করিয়া বিস্তৃতি দান করিয়াছে। শঙ্কর, ভাস্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, বল্লভ, শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি ভাষ্যকার এই বেদান্তসূত্রকে আশ্রয় করিয়াই নিজেদের দার্শনিক চিন্তার আকার দিয়াছেন। ইহা দর্শনের আর-এক ধারা।

এই দ্বিতীয় ধারাই ভারতীয় দর্শনের প্রধান ধারা। বেদ ও উপনিষদের মধ্য কালে ইহার বীজ উপ্ত হয়, উপনিষদে ইহার অঙ্কুর

এবং বেদান্তসূত্র ইহার কাণ্ড। তারপর চারিদিকে ইহার শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছে। বেদমূলক দর্শন বলিয়া ইহার সম্মান ও প্রভাব বরাবরই বেশী।

এই প্রথম ও দ্বিতীয় ধারা প্রথম হইতেই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছে বলিয়া ইহারাই খাঁটি হিন্দুদর্শন। আরম্ভে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট নৈকট্যও ছিল। এমন কি, উভয় দর্শনই এক শাস্ত্র বলিয়াও পরিগণিত হইত। উভয়েরই নাম 'মীমাংসা', এবং 'পূর্ব' ও 'উত্তর' এই বিশেষণ দ্বারা উভয়ের পার্থক্য দ্যোতিত হয়। উপবর্ষ প্রভৃতি অনেক ভাষ্যকার উভয়কে একই শাস্ত্রের পূর্ব ও উত্তর— প্রথম ও দ্বিতীয় -অংশ হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছেন।

উভয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিক এক নয়। কিন্তু বেদের প্রতি শ্রদ্ধা উভয়ের সমান বলিয়া আরম্ভে উভয়ের মধ্যে এক মাতার সন্তানের মতো একটা সাদৃশ্যও ছিল। কিন্তু এই নৈকট্য চিরকাল রক্ষিত হয় নাই; এবং আসলেও উভয়ের মনের মিল খুব বেশী নয়। সেইজন্য দুইটিকে পৃথক্ ধারা মনে করিতে হয়।

এই দুইটি ধারা ছাড়া আর-একটা ধারা আমরা দেখিতে পাই— কপিল ও পতঞ্জলি এবং কণাদ ও গৌতম প্রবর্তিত চিন্তাধারায়। সাংখ্য ও যোগ এবং বৈশেষিক ও ন্যায় এই চারিটি দার্শনিক সম্প্রদায় এই চারিজনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ অনেক। সে সব আমরা পরে আলোচনা করিব। এক জায়গায় ইহারা চারিটিই এক— ইহারা মীমাংসার মতো বেদবাক্যের অর্থ নির্গলিত করাটাকেই দর্শনের প্রধান কাজ মনে করে নাই। বেদের প্রামাণ্য ইহারা অস্বীকার করে নাই। বেদের ঋষিরা সত্য দ্রষ্টা; অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব—অনেক অতীন্দ্রিয় বস্তু, তাঁহারা জানিয়াছেন।

শ্রদ্ধার সহিত সে সমস্ত আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু দর্শনের প্রধান আলোচ্য মানুষের অভিজ্ঞতা— তাহার সুখদুঃখ— বিশেষত তাহার দুঃখ, এবং প্রমাণ প্রমেয় ইত্যাদি পদার্থ। বেদের বিরুদ্ধে না হইলেও এই দর্শন কয়টি বেদের অধীন নয়—ইহারা বেদ হইতে স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী।

বেদের ঋষির উক্তি ব্যাখ্যা করাই ইহাদের প্রধান কাজ নয়। সেই হিসাবে ইহাদের ভিতর এক স্বাধীন চিন্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই স্বাধীনতার ফল ও প্রভাব কী দাঁড়াইয়াছিল, সে বিচার আমরা পরে করিব। কিন্তু যেহেতু ইহারা বেদকে অমান্য না করিয়াও একটা স্বাধীন চিন্তার দাবি করিয়াছে, সেইজন্য ইহাদের ভিতর একটা নূতন ধারা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই ভারতীয় দর্শনের তৃতীয় ধারা।

হিন্দুদর্শনের এই যে ত্রিধারা আমরা কল্পনা করিলাম, ইহা ছাড়া অন্যরূপেও এই ত্রিধারা কল্পিত হইয়াছে। জৈমিনির 'মীমাংসা' (পূর্ব মীমাংসা) ও বাদরায়ণের বেদান্ত (উত্তর মীমাংসা), উভয়ই বেদের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত—উভয়ই দীর্ঘকাল এক শাস্ত্র হিসাবে গৃহীত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সাদৃশ্যকে প্রধান করিয়া দেখিয়া অন্য বৈসাদৃশ্য উপেক্ষা করিলে এই দুইটিকে একটি ধারা—বৈদিক ধারা মনে করা যাইতে পারে। অনেকে তাহাই করেন। আর, কপিলের সাংখ্য ও পতঞ্জলির যোগদর্শনের মধ্যে সাম্য এত বেশী এবং কণাদ ও গৌতমের বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শন হইতে ইহাদের পার্থক্য এত স্পষ্ট যে, এই উভয়টি মিলিয়া আর-একটি ধারা সৃষ্টি করিয়াছে, এরূপ অভিমতও অনেকে পোষণ করেন। তাহার পর, ন্যায় বৈশেষিকের ভিতর পার্থক্য অপেক্ষা সাদৃশ্যই বেশী; সুতরাং এই দুইটির ধারা তৃতীয় ধারা।

বেদের সঙ্গে এই শেষোক্ত চারিটি দর্শনের সম্বন্ধ একই ধরনের তথাপি ইহারা দুইটি প্রভিন্ন যুগ্ম সৃষ্টি করিয়াছে।

আমরা পূর্ব ও উত্তর মীমাংসার প্রভেদের কথা স্মরণ করিয়া ইহাদিগকে দুইটি পৃথক ধারা মনে করিয়াছি। আর, অপর চারিটি দর্শনের ভিতর বেদের সঙ্গে সম্পর্কের কথাটা বড়ো করিয়া দেখিয়া তাহাদিগকে একই ধারার অন্তর্গত করিয়া ভাবিয়াছি। পরে বিস্তৃত আলোচনার সময় আমাদের মতের পক্ষের যুক্তি স্পষ্ট হইবে, আশা করি।

যে ভাবেই দেখি না কেন, হিন্দুর দর্শনের ভিতর তিনটি ধারা সহজেই উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই ত্রিধারা আবার বিভক্ত হইয়া ক্রমে ছয়টি দর্শনে পরিণত হইয়াছে। ইহারাই অধুনা প্রসিদ্ধ ষড়-দর্শন— মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক; এবং ইহাদের প্রতিষ্ঠাতা যথাক্রমে জৈমিনি, বাদরায়ণ (ব্যাস), কপিল, পতঞ্জলি, গোতম ও কণাদ। এইখানেই ভারতীয় দর্শনের রেখাচিত্র শেষ হইল না। এই ত্রিধারার মধ্যে একটা জিনিস সমান—ইহারা সকলেই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছে। বেদে বা শ্রুতিতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্য; উহা অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। এই তিন শ্রেণীর সকল দার্শনিকই এইখানে একমত। সকলে বেদের সত্য সমান ব্যবহার করেন নাই— কেহ কেহ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেও সাহসী হইয়াছেন। কিন্তু প্রকাশ্যে বেদকে অস্বীকার ইহারা কেহই করেন নাই। অপর দিকে, বেদ অমান্য করিয়াছিল, এমন দর্শনও ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিল।

আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন

বেদের কর্মবহুল, বলি-বহুল ও জটিল ধর্মের প্রতি একটা অসন্তোষ ভারতের জিজ্ঞাসু চিন্তাশীল আত্মায় ক্রমশ স্ফুরিত হইতেছিল। ইহার প্রমাণ বেদে বা শ্রুতিসাহিত্যে বিশেষত উপনিষদে প্রচুর পাওয়া যায়। উপনিষদ তত্ত্বজ্ঞানের কথা—ব্রহ্মবিদ্যার কথা বলিয়াছে—ক্রিয়াকলাপের কথা নয়। সেইজন্যে পরবর্তী সমালোচনা আসল বেদকে কর্মকাণ্ড ও উপনিষদকে জ্ঞানকাণ্ড আখ্যা দিয়াছে। উভয়ের ভিতর বিচ্ছেদ বা বিভেদ কোথাও কল্পিত হয় নাই। উভয়ই শ্রুতি, উভয়ই অপৌরুষেয় এবং উভযেরই প্রামাণ্য সমান। উভয়কে সামঞ্জস্য করিয়া অনুসরণ করিতে হইবে, ইহাই ছিল প্রাচীন আদর্শ। মীমাংসাসূত্র এবং বেদান্তসূত্র পর্যন্ত এই আদর্শের স্পষ্ট মূর্তি দেখা যায়। কিন্তু তথাপি ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, উপনিষদের ভিতরই কর্মের নিন্দা রহিয়াছে। তাহা হইতে দেখা যায় বেদ বা শ্রুতি যখন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছিল তখন সঙ্গে সঙ্গে কর্মের প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাসও কোনো কোনো চিত্তে দেখা দিতেছিল। বেদই যাহাদের ধর্মের সম্বল ছিল, তাহাদের মধ্যে ক্রিয়ার প্রচলন লোপ না পাইলেও স্বাধীন চিন্তাও ক্রমশ অগ্রসর হইতেছিল। উভয়ের বিচ্ছেদ তখনও ঘটে নাই; কেহই তাহা তখনও চাহে নাই। কিন্তু পাশা-পাশি বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেও ইহারা ভিন্ন চিন্তাধারা ছিল এবং ভবিষ্যৎ প্রভেদের বীজ গর্ভে ধারণ করিয়াছিল। যেমন করিয়াই হউক, একই প্রকার শ্রদ্ধেয়, একই প্রকার প্রামাণ্য, একই প্রকার অপৌরুষেয়, একই শ্রুতির অন্তর্গত উপনিষদ্ পুরোগামী বেদের কর্মের প্রতি উপেক্ষা,অবজ্ঞা, নিন্দা ক্রমশ প্রচার করিতেছিল।

মুণ্ডক-উপনিষৎ দুই প্রকার বিদ্যার কথা বলিয়াছে 'দ্বে বিদ্যে

বেদিতব্যে'। একটি অপরা—নিকৃষ্ট, আর-একটি পরা বা শ্রেষ্ঠ। অপরা বিদ্যার নামান্তর 'অবিদ্যা'; আর পরা বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা। চারি বেদ ও ছয় বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ) অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। আর পরা বিদ্যা? 'যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে'-যাহা দ্বারা সেই অক্ষরকে জানা যায়—যাহা দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় অর্থাৎ উপনিষৎ। যজ্ঞরূপ যে ভেলা (প্লব) তাহা অদৃঢ়—ভর সয় না; একথাও মুণ্ডক বলিয়াছে। বৈদিক যজ্ঞের বিরুদ্ধ কথা ইহা হইতে স্পষ্ট আর কী হইবে। সাধারণভাবে বেদকে যাহারা মান্য করিয়া চলিতে-ছিল তাহাদের মধ্যেই পশুবধ সম্বলিত বৈদিক যজ্ঞাদির প্রতি একটা শ্রদ্ধাহীনতা ক্রমশ পুষ্টি লাভ করিতেছিল। কিন্তু ইহা প্রবল এবং আরও পুষ্ট আকার ধারণ করে পূর্বভারতে মহাবীর ও বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্মে। মহাবীরের প্রবর্তিত ধর্মের নাম জৈন ধর্ম; আর, বুদ্ধের নামানুসারে তাঁহার ধর্মকে বৌদ্ধধর্ম বলে। ধর্ম দুইটি যথাক্রমে আর্হত ও সৌগত নামেও পরিচিত। আর, সংস্কৃত ভাষায় বিশেষণের কখনই অভাব হয় না। সুতরাং ইহাদের অন্য নামও আছে।

ধর্ম হিসাবে ইহাদের গতি ও বিকাশ এখানে আমাদের আলোচ্য নহে। এই দুই ধর্ম প্রথমত ধর্ম হিসাবেই লোকে প্রচারিত হইতে থাকে। ত্যাগ, তিতিক্ষা, অহিংসা প্রভৃতি উচ্চ নৈতিক আদর্শ লইয়া ইহারা আবির্ভূত হয় এবং সহজেই অনেকের—আর্য ও অনার্য, সমাজভুক্ত ও সমাজবহির্ভূত বহুলোকের চিত্ত আকর্ষণ করে। ইহার প্রায় ৬০০ শত বৎসর পরে পশ্চিম এশিয়ার রোমক সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টের ধর্মও এই একই ভাবে প্রচারিত হইতে থাকে। কিন্তু ক্রমশ এই ধর্মের ঢেউ সমাজের শিক্ষিত উচ্চস্তরে যখন পৌঁছিতে লাগিল তখন তাহার একটা দার্শনিক আশ্রয়—বিচার-তর্কের কর্মও প্রয়োজন হইল। খ্রীষ্টান ধর্মের ইতিহাসেও

ঠিক ইহাই ঘটিয়াছিল। খ্রীস্টান ধর্ম যখন গ্রীসে পৌঁছিল তখন সেখানকার যাহারা প্ল্যাটো, আরিস্টটলের দার্শনিক শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত ছিল তাহারা শুধু স্বর্গের লোভে কিংবা শান্তির আকাঙ্ক্ষায় নির্বিচারে উহা গ্রহণ করিতে চাহিল না। বিচারের প্রয়োজন হইল এবং ক্রমশ খ্রীষ্টীয় দর্শনের সূত্রপাত হইল। প্ল্যাটো, আরিস্টটলের চিন্তা হইতেও উহা প্রচুর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতেও তেমনই শিক্ষিত, বিচারে অভ্যস্ত, তর্কে পটু চিন্তাশীল লোকদের কাছে যখন সরল ও সহজ অহিংসার ধম পৌঁছিল তখন তাহারও বিচাব এবং তর্কদ্বারা পরিপুষ্টি প্রয়োজন হইয়া পড়িল। ফলে জৈন ও বৌদ্ধদের মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম অথচ সবল দার্শনিক চিন্তাধারা আভিভূ ত হইল। ইহা নগণ্য কিংবা উপক্ষণীয় ছিল না। ইহার বিরাট সৌধের বর্ণনা আমরা পরে দিব। কিন্তু এই দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে ইহা বেদকে অগ্রাহ্য করিল—উহার প্রামাণ্য স্বীকার করিল না।

বেদ যাহারা মানে না তাহাদিগকে প্রচলিত পরিভাষা অনুসারে 'নাস্তিক' বলা হয়। ইহার বিপরীত শব্দ 'আস্তিক'। কিন্তু শব্দ দুইটির একাধিক অর্থ আছে। ঈশ্বর যে মানে না সেও নাস্তিক; পরলোক না মানিলেও নাস্তিক আখ্যা দেওয়া হয়। ঈশ্বর, পরলোক, এবং বেদ ইহাদের একটিকে মানিলেই আর-কয়টিকেও মানা হয়, এমন নয়। কিন্তু ভারতের দার্শনিক পরিভাষায় সাধারণত 'নাস্তিক' বেদে অবিশ্বাসীকেই বুঝায়। বেদে বিশ্বাসী সেই অনুসারে 'আস্তিক'।

জৈন বৌদ্ধদের সমস্ত দার্শনিক প্রচেষ্টা বেদ অস্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং উহা নাস্তিক। আর পূর্বে যে ছয় দর্শনের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা বেদ মানে, সুতরাং আস্তিক। আস্তিক দর্শনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে নাস্তিক দর্শন দীর্ঘকাল প্রবাহিত হইয়াছে। তাহার পর

আস্তে আস্তে নিস্তেজ হইয়া ইহারা কালের বালুকার ভিতর গতি হারাইয়াছে।

ভারতে যাহারা নাস্তিক আখ্যা লাভ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধই প্রধান; এবং প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক দর্শন বলিলে ইহাদের দর্শনই বুঝা উচিত। কিন্তু আরও অন্তত একটি চিন্তাধারার কথা আমরা শুনি যাহা নাস্তিক তো বটেই পরন্তু দর্শন নামেও তাহাকে অভিহিত করা হয়। সেটি চার্বাকের দর্শন। দর্শন হিসাবে উহার মূল্য খুব বেশী নয়। কিন্তু বেদের উপর আক্রমণ ইহার সর্বাপেক্ষা কঠোর, তীব্র, এমন কি বর্বর।

চার্বাক কোনো ব্যক্তির নাম না বিশেষণ তাহা জোর করিয়া বলা কঠিন। তাঁহার রচিত কোনো গ্রন্থ আমরা পাই না। তাঁহার উক্তি বলিয়া উদ্ধৃত কিছু কিছু অন্যান্য দর্শনের সাহিত্যে পাওয়া যায়। তাঁহার মতের সাধারণ আলোচনাও আছে। মত ও নামটি মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থেও পাওয়া যায়। সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত সার-সংগ্রহ পাই ১৬শ শতাব্দীর মাধবাচার্য নামক বৈদান্তিকের "সর্বদর্শন সংগ্রহ" নামক গ্রন্থে।

চার্বাকের যাহা মত তাহা ধর্ম ও নীতির শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ভোগেচ্ছার সনাতন বিদ্রোহেরই রূপান্তর মাত্র। বেদের উপর তীব্র আক্রমণ হিসাবেই উহার প্রসিদ্ধি বেশী। তাঁহারই বলিয়া গৃহীত দুই একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিলেই চিন্তার ধারাটা কতক বুঝা যাইবে।

'অগ্নিহোত্রাদি কর্ম, সন্ন্যাস ইত্যাদি বুদ্ধি ও পৌরুষ যাহাদের নাই তাহাদের জীবিকা।' 'ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর—এই তিন শ্রেণীর লোকে মিলিয়া বেদ সৃষ্টি করিয়াছে।' 'দেহ ভস্ম হইয়া গেলে আর পুনরাগমন নাই; সুতরাং যতদিন বাঁচিবে, সুখে থাকিতে চেষ্টা করিবে।' ইত্যাদি। এ সকলের পশ্চাতে যে দার্শনিক বুনিয়াদ গড়িবার চেষ্টা আছে, তাহার

আলোচনা আমরা পরে করিব। এই চিন্তাধারা চার্বাকেই প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে, এমন নয়। চার্বাক বৃহস্পতির মত অনুসরণ করিয়াছিলেন, এরূপ বলা হইয়াছে। এই বৃহস্পতি কে ছিলেন,—দেবগুরু না আর কেহ, বলিবার উপায় নাই। মনে হয়, কাল্পনিক নাম, দেবগুরু বৃহস্পতির কথা মনে করিয়াই হয়তো কল্পনা করা হইয়াছে।

ধর্ম ও নীতির শাসন যখন বেশী কঠোর হয়, তখন মানুষের দুদম স্বেচ্ছা বিদ্রোহী হইয়া সে শাসন অগ্রাহ্য করিতে চায়, এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বত্রই দেখা যায়। সুতরাং ভারতেও এই বেদ বিদ্রোহের আবির্ভাব অস্বাভাবিক কিংবা আকস্মিক কিছু নয়।

এখন পর্যন্ত আমাদের এই বিবরণে আমরা যতদূর অগ্রসর হইয়াছি, তাহাতে আস্তিক দর্শন ছয়টি ও নাস্তিক দর্শন তিনটির সাক্ষাৎ পাইলাম। সংক্ষেপে ইহাই ভারতীয় দর্শন। ইহাদেব প্রত্যেকটির আবার বেশ বিস্তৃতি ও পরিসর আছে। অনেকের শাখা প্রশাখাও যথেষ্ট। এক চার্বাক-দর্শনের বিশেষ বিস্তৃতি নাই; কেননা, ইহাতে বিস্তৃতির অবকাশ কম। ইহার স্বরূপ আলোচনার সময় সে কথা স্পষ্ট হইবে। তাহা ছাড়া অন্য দর্শনগুলিব ইতিহাস দীর্ঘ এবং আয়তন বিস্তীর্ণ। জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনকে সাধারণত আমরা ঐ ঐ নামে অভিহিত করি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ঐ দুইটি ধর্মের প্রবর্তকেরা দার্শনিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন নাই। উঁহাদের ধর্মের ভিতর দর্শনের আবির্ভাব পরে হইয়াছে এবং অন্যে উহা করিয়াছে। কিন্তু আস্তিক দর্শনগুলি যেমন প্রকাশ্যে বেদের উক্তি অতিক্রম করিতে সাহস পায় নাই, এই দুই শ্রেণীর দর্শনও তেমনই ধর্ম-প্রতিষ্ঠাতাদেব উক্তি বলিয়া যাহা গৃহীত হইয়াছিল তাঁহার বিরুদ্ধ কথা বলিতে সাহস পায় নাই। সেইজন্য এই দুই দর্শনের চিন্তাধারার ভিতর

একটা সাধারণ ঐক্য সর্বদা রক্ষিত হইয়াছে। জৈন ও বৌদ্ধ দার্শনিকের সংখ্যা মোটেই কম নয়, কিন্তু তাহাদের চিন্তায় সম্প্রদায়-ভেদ কম।

ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গি

এই দর্শনগুলি কিভাবে প্রকাশ পাইয়াছে এবং কোন্ ভাষায়, তাহার কতক আভাস আমরা পাইয়াছি। আস্তিক দর্শনগুলির আরম্ভ সংস্কৃত ভাষায়—বেদে-উপনিষদে; ইহাদের বিস্তৃতি ও পরিণতিও সংস্কৃতে এবং যদি পরিসমাপ্তি ঘটিয়া থাকে তবে তাহাও সংস্কৃতেই ঘটিয়াছে। ইহাদের দীর্ঘ এবং বহুল পরিসর ইতিহাসে অন্যভাষার স্পর্শ কোথাও নাই।

নাস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে চার্বাকের বিবরণ আমরা যাহা পাই, তাহাও প্রধানত সংস্কৃতে। তাঁহার দর্শনের নামান্তর 'লোকায়ত'। ইহার অর্থ 'লোকপ্রিয়'ও হইতে পারে। লোকে বিস্তৃত কিংবা লোকের প্রিয় হইতে হইলে তখনকার কথিত ভাষায় তাহার প্রকাশ হওয়া অসম্ভব নয়। কোন্ প্রদেশে কোন্ সময়ে এই মত প্রথম প্রচারিত হয়, জানিবার কোনো উপায় নাই। তখন সেখানে কথিত ভাষা কী ছিল—সংস্কৃত না কোনো অপভ্রংশ—বলার উপায় নাই। তবে, এই দর্শনের যে বিবরণ রক্ষিত হইয়াছে তাহা সংস্কৃতে।

জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর প্রাকৃতে প্রচার করিতেন। তাঁহার উক্তি ও উপদেশ যাহা পাওয়া যায় তাহা প্রাকৃত ভাষায়। প্রথম যে দার্শনিক চিন্তা এইসব আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহারও প্রকাশ প্রাকৃতে। কিন্তু পরে ক্রমশ সংস্কৃতের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধ নিজে পণ্ডিত লোক ছিলেন—সংস্কৃত ভালো জানিতেন। কিন্তু তিনিও প্রচার করিয়াছিলেন 'পালি' নামক ভাষায়। সেইজন্য তাঁহার

প্রবর্তিত ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ সবই পালিতে রচিত। প্রথম অবস্থায় দর্শনও তাহাই ছিল। কিন্তু পরে জৈনদের মতো বৌদ্ধ দার্শনিকদেরও সংস্কৃতের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

ইহার কারণ বুঝিতে হইলে ইতিহাস হইতে একটি সদৃশ উদাহরণ লইতে হয়। যীশু ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন হিব্রুভাষার একটা অপভ্রংশে কিন্তু তাঁহার জীবনী ও এই প্রচার-কাহিনী লিখিত হয় গ্রীক ভাষায়। তাঁহার পর তাঁহার প্রিয় শিষ্য পল্ ও পীটর গ্রীকেই প্রচার করেন। প্রাথমিক দার্শনিক গবেষণা যাহা হইয়াছিল—ধর্মবৃদ্ধেরা (Church father) যে সব আলোচনা করিয়াছিলেন তাহাও হয় গ্রীকে। কিন্তু পরে রোমক সাম্রাজ্যের কেন্দ্র রোমে যখন এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে সাম্রাজ্যের সাধারণ ভাষা ল্যাটিনে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। গ্রীক বাইবেল ল্যাটিনে অনূদিত হয় এবং উহাই গীর্জাদিতে পঠিত হইতে থাকে। তাহার পর ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ল্যাটিন ছিল পণ্ডিতদের ভাষা। বেকন দর্শনের বই লেখেন ল্যাটিনে, যদিও ইংরেজী সাহিত্যেও তাঁহার দান কম নয়। তারপর সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে দার্শনিকেরা যে যাহার দেশের ভাষা ব্যবহার করিতে সাহস পান। এখন দর্শন ফরাসী, জার্মান, ইংরেজী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ভাষায়ই প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু ভারতে সংস্কৃত প্রথম হইতেই পণ্ডিতের ভাষা ও জ্ঞান প্রকাশের উপায় ছিল। জৈন ও বৌদ্ধদের মধ্যে যখন ধার্মিকের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতেরও আবির্ভাব ঘটিতে লাগিল এবং যখন ঐ সব পণ্ডিতেরা হিন্দু পণ্ডিতদিগের সঙ্গে বিচারের স্পর্ধা করিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে স্বমতে আনিতে চাহিতে লাগিলেন, তখন সংস্কৃতের ব্যবহার তাঁহাদের পক্ষে অনিবার্য হইয়া গেল।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মমতের সঙ্গে হিন্দুদের যে একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আজ বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে বহিষ্কৃত; জৈনধর্মও বহিষ্কৃত না হইলেও নিষ্প্রভ। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে জৈনদের না হইলেও বৌদ্ধদের অনেক গ্রন্থ ভারতে লোপ পাইয়াছে;— দার্শনিক গ্রন্থও তাহার মধ্যে ছিল। ইহাদের অনেকগুলির অনুবাদ তিব্বতে ও চীনে পাওয়া যায়— অবশ্যই সেই সেই দেশের ভাষায়। যাহা এইভাবে বহিষ্কৃত হয় নাই, তাহা এদেশে সংস্কৃতে আছে।

সুতরাং এক সংস্কৃত ভাষা ভালো রকম জানিলে কোনো একজনের পক্ষে সমগ্র ভারতীয় দর্শনের পরিচয় লাভ করা অসম্ভব নয়। অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে পালি, প্রাকৃত, তিব্বতীয় ও চীনীয় ভাষা এবং তাহার উপর আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতদের গবেষণার সহিত পরিচয় থাকিলে তো সোনায় সোহাগা। কিন্তু শুধু সংস্কৃত ভাষায় আলোচনা ও বিবরণের উপর নির্ভর করার একটু অসুবিধা আছে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রুতি-স্মৃতির চর্চা করিয়াছেন এবং এখনও করেন, তাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত সে কাজ করেন হয়তো, কিন্তু সমালোচনার – অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক নিক্তিতে মূল্য-বিচারের সহিত তাহা করিতে চান না। মূর্তিকে যে ভক্তিগদ্‌গদ্‌-ভাবে দেবতা রূপে দেখে, সে উহার ভাস্কর্য বুঝিতে পারে না। শুধু শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে কাব্য কিংবা দর্শনের আলোচনায় তাহার সৌন্দর্য কিংবা মূল্য কোনোটিই পরিপূর্ণরূপে দেখা যায় না। শ্রদ্ধার সঙ্গে সমালোচকের দৃষ্টির সমন্বয় অসম্ভব নয়। সেই সমন্বিত দৃষ্টিতে দেখাই প্রকৃত দেখা এবং আধুনিক কালে উহাই যোগ্যতম পন্থা। সেইজন্য ভারতীয় দর্শনের আধুনিক পাঠকের পক্ষে এক সংস্কৃতের উপর নির্ভর না করিয়া কতকটা আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকদেরও সাহায্য নেওয়া ভালো।

ভারতের দর্শনের— বিশেষত আস্তিক দর্শনের— প্রকাশভঙ্গির

মধ্যেও একটা বৈশিষ্ট্য আছে যাহা অন্যদেশের দর্শনে পাওয়া যায় না। 'সূত্র' দ্বারা ভাব প্রকাশ, প্রশ্ন-উত্তর নিরূপণ করা, ও শাস্ত্রের তত্ত্ব গ্রথিত করিয়া রাখা, ভারতীয় সাহিত্যের একটা বৈশিষ্ট্য। প্রশ্ন উত্তর বা কথোপকথনচ্ছলে কোনো বিষয়ের বিচার পৃথিবীর সব ভাষায়ই কম বেশী আছে। ভারতের ভাষায়ও তাহা আছে। কিন্তু 'সূত্র' একটি পৃথক্ জিনিস। ঠিক এই জিনিস অন্য দেশের দর্শনে বা সাহিত্যে মিলে না। সূত্র যথাসম্ভব অল্পকথায় বিষয়ের অবতারণা করে ; যেমন 'অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ' —ধর্ম ব্যাখ্যা করিব, অথবা 'তত্তু সমন্বয়াৎ' আগে যাহা বলা হইয়াছে তাহা 'সমন্বয়' হইতে আসে। সব সময় সূত্র সম্পূর্ণ বাক্য হয় না ; এবং পূর্বের ও পরের সঙ্গে পরিচয় না থাকিলে ইহার অর্থ করা যায় না। যাঁহারা 'সূত্র' রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে একটা মন্তব্য আছে যে, কোথাও একটি অক্ষর কমাইতে পারিলে তাঁহারা সেটাকে পুত্রোৎ-সবের মতো পরম আনন্দের বিষয় মনে করেন। এইরূপ সংক্ষেপের ফল এই যে, যে কোনো শাস্ত্রের যে কোনো একটি সূত্র ধরিয়া উহার কথায় কথায় অর্থ যদি বা করা যায়, আসল অর্থ পূর্বাপরের সহিত সমঞ্জস না করিয়া বাহির করিবার উপায় নাই ; অনেক সময় অন্যে না বলিয়া দিলে ধরা যায় না। উপরে যে দ্বিতীয় সূত্রটি তুলিয়াছি, তাহার কথায় কথায় মানে হয়— 'তাহা কিন্তু সমন্বয় হইতে', 'তাহা' কী ? কিসের 'সমন্বয়' ? ইত্যাদি অনেক কথাই খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। অথচ এইটিই কিন্তু কঠিনতম সূত্রের দৃষ্টান্ত নয়।

সূত্রগুলি কঠিন ও গূঢ়ার্থ বলিয়াই তাহাদের ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয়। সেই সব ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য, ভঙ্গি, ভাষা ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়। সাধারণত সূত্রের যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা হয় তাহাকে 'ভাষ্য' বলা হয়। ভাষ্যের ব্যাখ্যাকে

টীকা, টিপ্পনী ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়। 'সূত্র' ছাড়া অন্য কঠিন গ্রন্থের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তাহাকে সাধারণত 'টীকা' বলা হয়; যেমন কালিদাসের মল্লিনাথকৃত ব্যাখ্যা 'টীকা' বলিয়াই পরিচিত। এই সব টীকা-ভাষ্যের আবার নামকরণও হইয়া থাকে। কালিদাসের মল্লিনাথকৃত টীকার নাম 'সঞ্জীবনী'। কোথাও বা 'তত্ত্ববোধিনী', 'মনোরমা' ইত্যাদি নামও দেওয়া হইয়াছে। বেদান্তসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্যের বিভিন্ন নাম রহিয়াছে; যথা, শারীরক-ভাষ্য, শ্রীভাষ্য, অণুভাষ্য ইত্যাদি। অনেক সময় রচয়িতার নাম হইতে তদ্ধিতের সাহায্যে বিশেষণ সৃষ্টি হইয়াছে— যেমন, শঙ্করের ভাষ্য, শাঙ্কর ভাষ্য, জাগদীশী টীকা, ইত্যাদি।

'সূত্র' যে শুধু দর্শনে রচিত হইয়াছে, এমন নয়। সংস্কৃতের সব কয়টি ব্যাকরণ সূত্রে রচিত। ভক্তি শাস্ত্রেরও সূত্র আছে। শ্রৌত ধর্ম গৃহ্যকর্ম ইত্যাদির জন্যও সূত্র রচিত হইয়াছে। কঠিন বিদ্যা যখন মুখে মুখে বিতরিত হয় এবং স্মৃতিতে রক্ষিত হয়, তখন স্মরণ রাখার সুবিধার জন্য সূত্র আকারে মূল বক্তব্য প্রকাশ করা সুবিধাজনক। হয়তো এই কারণেই সূত্র-আকার গৃহীত হইয়া থাকিবে।

আস্তিক দর্শন ছয়টিরই সূত্রগ্রন্থ রহিয়াছে। সকলের আকার সমান নহে। পতঞ্জলির যোগসূত্র সকলের ছোটো। আর সকলেরই সূত্র সংখ্যা তিনশতের উপর।

এই সকল সূত্র কবে এবং কোথায় রচিত হইয়াছে, শপথ করিয়া বলা কঠিন। রচয়িতার নাম সম্বন্ধে কিম্বদন্তী স্পষ্ট; কিন্তু রচনাকাল লইয়া মতভেদ আছে অনেক। রচয়িতাদের দেশ সম্বন্ধেও নিশ্চিত হওয়া কঠিন; সুতরাং রচনাস্থানও সন্দেহের অতীত নয়। আরও একটা কথা; কোনো দর্শনের সবগুলি সূত্র একই সঙ্গে রচিত হইয়াছিল বলিয়া

মনে হয় না, ক্রমশ কেন্দ্রস্থানীয় সূত্রগুলির সঙ্গে নূতন সূত্র যোগ করা হইয়াছে, ইহা মনে করিবার পক্ষে যুক্তি আছে।

নাস্তিক দর্শনগুলির ঠিক এই ধরনের সূত্র নাই। তাহারা উপনিষদকে আশ্রয় করিয়া জন্মে নাই এবং তাহাদের বৃদ্ধির প্রণালীও ঠিক এক ধরনের নয়। তাহাদে‍ ল উৎস অ-সংস্কৃত ভাষা পালি ও প্রাকৃতে। কিন্তু পরে যখন তাহারা আস্তিক দর্শনের মতো সংস্কৃত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের মধ্যেও সূত্রজাতীয় রচনা আবির্ভূত হয় এবং ভাষ্য, টীকা ইত্যাদিও দেখা দিতে থাকে। যথা, জৈনদের মধ্যে উমাস্বাতি (অথবা, কাহারও মতে উমাস্বামি) 'তত্ত্বার্থসূত্র' নামক এই প্রকার সূত্র রচনা করিয়াছেন। বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মকীর্তির 'ন্যায়বিন্দু' এই প্রকার সূত্রগ্রন্থের দৃষ্টান্ত। আস্তিকদের সূত্রগ্রন্থের মতো ইহাদেরও ভাষ্য টীকা ইত্যাদি হইয়াছে এবং এইভাবে দার্শনিক সাহিত্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এইসব সূত্র-ভাষ্য-টীকায় প্রপঞ্চিত দর্শনের আবার সংক্ষিপ্ত সারও অনেক সময় গদ্যে পদ্যে সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাদেরও কারিকা ইত্যাদি বিভিন্ন নাম আছে।

এইভাবে ভারতে আস্তিক ও নাস্তিক মতের একটা বিপুল দার্শনিক সাহিত্য রচিত হইয়াছে। ইহার পরিসর এত বড়ো যে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সমগ্র দার্শনিক সাহিত্য একত্র করিলেও ইহার সমান হইবে না। আর, ইহাতে দর্শনের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে এত রকম মতবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর দর্শনে যে সব মত প্রচারিত হইয়াছে তাহার অনেকগুলিরই স্পষ্ট পূর্বাভাস এবং অস্পষ্ট ছায়া এবং অনেকক্ষেত্রে পরিণত রূপ ইহাতে পাওয়া যায়।

দর্শনের রূপ—সাধারণ ও ভারতীয়

যে দর্শনের ইতিহাস আড়াই হাজার বৎসরেরও বেশীকাল জুড়িয়া রহিয়াছে, তাহার কোনো বৈচিত্র্য নাই, কোনো পরিবর্তন নাই, এরূপ হইতে পারে না; তাহা হইলে উহার ইতিহাস থাকিত না। যুগে যুগে এবং দেশে দেশে ইহার রূপের অদল বদল হইয়াছে। একই প্রশ্নের একই উত্তরই যদি থাকিত তবে জ্যামিতির সত্যের মতো ইহার পঠন-পাঠন হয়তো হইত, কিন্তু ইতিহাস হইত না। আর, আজ জ্যামিতির অদৃষ্টেও ইতিহাস জুটিয়াছে; কেননা, ইউক্লিডের সমানভাবে বিস্তৃত দেশ বা ভূমির কল্পনা পরিত্যক্ত হইয়াছে; এখন আকাশ 'গোল'; সুতরাং কোনো দেশ মরার মতো চিৎ হইয়া পড়িয়া নাই, ইহার আপেক্ষিকতা আছে—হ্রাসবৃদ্ধি আছে—কালের সহযোগে পরিবর্তনও ঘটে।

দর্শন গতিশীল শাস্ত্র। সুতরাং ইহার চিরস্থায়ী রূপ তো নাই-ই, দীর্ঘকাল স্থায়ী রূপও নাই। ইহার পরিবর্তন ঘটে—আলোচ্য প্রশ্নের ও উত্তরের পরিবর্তনে। অনেক সময় পুরাতন প্রশ্ন পরিত্যক্ত হইয়া নূতন প্রশ্ন গৃহীত হয়—যেমন ব্যক্তির মোক্ষের কথার বদলে রাষ্ট্রের সৌন্দর্যের কথা হয়তো আলোচ্য হইয়া পড়ে। আবার উত্তরও এক-একজন দার্শনিক এক-এক রকম দিয়া থাকেন। কেহ হয়তো সংসার ত্যাগ করিয়া তত্ত্বচিন্তাদ্বারাই 'মুক্তি' লাভ হয়, এরূপ উপদেশ দিয়াছেন; আবার কেহ হয়তো শাস্ত্রবিহিত ধর্মকর্ম, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির উপর জোর দিয়াছেন। এইসব কারণে দর্শনের রূপ একই থাকিয়া যায় নাই এবং ইহার একটা বিচিত্র ইতিহাস আছে।

কিন্তু তথাপি দর্শনের এই গতিবৃদ্ধি অনেকটা দেহের গতি ও বৃদ্ধির মতো। হামা দেয় যে শিশু, সেই যৌবনে ঘোড়ায় চড়ে আবার বার্ধক্যে লাঠিতে ভর দিয়া হাঁটে। কিন্তু তাহার দেহের কাঠামোটা ঠিকই

থাকে। তেমনই দর্শনের ইতিহাসেও পরিবর্তন আছে, অনেক বিচিত্র, মনোহারী পরিবর্তন আছে; কিন্তু মূল কাঠামোটা আমূল পরিবর্তিত হইয়া যায় না। প্রশ্নে ও উত্তরে নানাত্ব আছে, কিন্তু জিজ্ঞাস্য বিষয় নিত্যনূতন নহে। দর্শনের মূল জিজ্ঞাসা—জগৎ ও আত্মা এবং এই উভয়ের অতিরিক্ত একটি পরমতত্ত্ব—যাহাকে নানাজনে নানাভাবে বর্ণিত করিয়াছেন এবং যাহাকে সাধারণভাবে 'পরমাত্মা' বলিলে দোষ হইবে না। 'পরমাত্মা' বা ঈশ্বর অস্বীকার করিলেও সাধারণভাবে জীব ও জগতের মূল এবং আদি হিসাবে একটা সত্য স্বীকার করিতেই হয়; সাধারণ একটা নাম দিতে গেলে উহাকে 'পরমার্থ' বা 'পরতত্ত্ব' বা 'পরম-পদার্থ' বলা চলে।

সাধারণভাবে জীব, জগৎ ও 'পরার্থ' এই তিনটিই দর্শনের আলোচ্য। ইহাদের আলোচনায় প্রমাণ প্রয়োগ করিতে হয়; সুতরাং ইহাদিগকে 'প্রমেয়' বলা চলে। আর, যে বিচারের সাহায্যে—জ্ঞানপ্রাপ্তির যে উপায়ে উহাদিগকে জানা যায়, তাহাকে 'প্রমাণ' বলা হয়। খুব সংক্ষেপে বলিলে, 'প্রমাণ' ও 'প্রমেয়' দর্শনের বিচার্য বিষয়। ইহাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে—বিশেষত প্রমেয়ের অন্তর্ভুক্ত জীব ও জগৎ ও পরার্থ সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন উঠে। জীবের দৃষ্টান্ত যদি লই, তবে তাহারও উৎপত্তি, প্রকৃতি, পরিণতি ও ভবিষ্যৎ, তাহার পরিবেষ্টনী হিসাবে সমাজ ও রাষ্ট্র, তাহার ধর্ম-অধর্ম, উর্ধ্ব ও অধঃগতি—ইত্যাদি কত প্রশ্ন না উঠিতে পারে। জগৎ ও পরমাত্মা সম্বন্ধেও তাহাই। আর প্রমেয় ছাড়া 'প্রমাণ' সম্বন্ধেও নানা প্রশ্ন উঠিতে পারে। এইভাবেই দর্শনের গতি ও পুষ্টি হইয়া থাকে। গতি পুষ্টির কথা বাদে সাধারণভাবে দর্শনের কেন্দ্রস্থ প্রশ্ন ঐ কয়টি। ইহাই তাহার সাধারণ এবং কমবেশী সনাতন রূপ।

এই কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। তাহা না হইলে দর্শনের ইতিহাস আলোচনা অত্যন্ত ঘোরালো হইয়া যায়। দর্শনানুধ্যায়ী ব্যক্তিবিশেষের মনে নানা প্রশ্নই উঠিতে পারে। তাহার আলোচনাও তিনি তাঁহার গ্রন্থে করিতে পারেন। কিন্তু কবির সব কথাই যেমন কাব্য নয়— রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও সাহিত্য-সমালোচনা যেমন তাঁহার কাব্য হইতে পৃথক্ জিনিস— তেমনিই দার্শনিকের মুখ হইতে যাহা নিঃসৃত হয় কিংবা তাঁহার কলমে যাহা উঠে তাহাই দর্শন নয়। একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। বৃহদারণ্যক উপনিষদ দার্শনিক গ্রন্থ এবিষয়ে মতভেদ নাই। কিন্তু উহা শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। ইহার ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে যেসব কথা বলা হইয়াছে তাহা ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের অনুরূপ, দার্শনিক তত্ত্ব তাহাতে কিছু নাই। "যে ইচ্ছা করিবে 'আমার পুত্র পণ্ডিত হউক, সভাসমিতিতে সম্মানিত হউক' ইত্যাদি, সে মাংসৌদন (পোলাও?) পাক করিয়া ঘি মিশাইয়া স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া খাইবে"; এইরূপ কেহ যদি ফরসা ছেলে চায় কিংবা বিদুষী মেয়ে চায়, তাহা হইলে কী খাইতে হইবে তাহাও বলা হইয়াছে— কোথাও বা ক্ষীর-ভাত, কোথাও বা তিল-ভাত, কোথাও দই-ভাত, অথবা ফেন-ভাত ইত্যাদি। এইসব উপদেশের অন্য মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু উহারা দর্শন নয়। ইহাকে দার্শনিক বিচারের অন্তর্গত মনে করিলে 'জন্মনিয়ন্ত্রণে'র আলোচনাও দর্শন হইবে। আশ্চর্যের বিষয়, বৃহদারণ্যকের এই ব্রাহ্মণে 'জন্মনিয়ন্ত্রণে'র কথাও যে না আছে, এমন নয়। কেহ যদি সন্তান না চায়, তাহা হইলে কী করিতে হইবে তাহাও বলা হইয়াছে (৬।৪।১০)। এই সমস্ত দার্শনিক বিদ্যার অন্তর্গত নয়। তাবিজ-কবচ যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র নয়, ইন্দ্রজাল যেমন বিজ্ঞান নয়, তেমনই এই সমস্তই এবং আরও বৈজ্ঞানিক বিদ্যা, এমনকি আণবিক বোমানির্মাণ কিংবা

যোগবলে আকাশে বিচরণও দর্শন নয়। যাহা দর্শন নয়, তাহা দর্শন নয়, আমরা এইমাত্র বলিতেছি। যাহা দর্শন নয়, তাহার কোনো মূল্য নাই, একথা বলিতেছি না।

দর্শনের সাধারণ রূপ মনে না রাখিলে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা আলোচনায় ঢুকিয়া পড়িতে পারে, এইজন্য কথাটা এখানে তুলিতে হইল। বিচার করিয়া অবান্তর বিষয় পরিত্যাগ করিয়া দেখিলে ভারতের দর্শনেরও ঐ একইরূপ দেখা যাইবে। এখানেও আলোচ্য বিষয় প্রমাণ ও প্রমেয়—জ্ঞান ও জ্ঞেয় এবং এখানেও জ্ঞেয় বস্তুর অন্তর্গত জীব, জগৎ ও পরমপদার্থ। সুতরাং উভয়ত্র দর্শনের রূপে বিশেষ কোনো প্রভেদ নাই। তবে. ইউরোপীয় দর্শনে প্রমাণ বা জ্ঞানের উৎপত্তির কথাটা বড়ো হইয়া দেখা দেয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে— বিশেষভাবে জার্মান দার্শনিক কান্টের চিন্তায়। কিন্তু ভারতে উহা প্রথম হইতে আলোচ্য হইয়া পড়ে। বুদ্ধের আবির্ভাবের কাছাকাছি সময়ে— অর্থাৎ খ্রীস্টের ৬০০।৭০০ বৎসর পূর্বে যখন ভারতে দার্শনিক চিন্তা পরিস্ফুট আকার ধারণ করিতে থাকে প্রায় তখন হইতেই আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনের প্রভেদও স্পষ্ট হইতে থাকে। বেদের গ্রহণ ও বর্জন লইয়াই উভয়ের মধ্যে পার্থক্যটা সৃষ্ট হয়। বেদ একপ্রকার জ্ঞানের উৎস। বেদে বিশ্বাসীরা মনে করিতেন সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়, অতিপ্রাকৃত বিষয়ের জ্ঞান— পরলোক ও পরমাত্মার জ্ঞান—এক বেদই দিতে পারে; এই জ্ঞানলাভের আর কোনো উপায় নাই। বেদে অবিশ্বাসীরা এই কথা স্বীকার করিতেন না। বেদকে বাদ দিলেও কোনো জ্ঞান মানুষের দুর্লভ কিংবা অলভ্য হইবে, একথা তাঁহারা মানিতেন না। বিশ্বাসীদের মতে বেদ একটা 'প্রমাণ', অবিশ্বাসীদের মতে তাহা নয়। এইখানেই উভয়ের মধ্যে প্রভেদের সৃষ্টি এবং সেইজন্যই প্রমাণের কথাটা প্রথম হইতেই ভারতীয়

দর্শনে বড়ো হইয়া পড়ে। এই প্রমাণের কথাটা এতবড়ো হইয়া পড়ে যে শেষের দিক দিয়া অর্থাৎ খ্রীস্টীয় ১৩শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া চৈতন্যের সময় পর্যন্ত অর্থাৎ ১৬শ-১৭শ এমনকি ১৮শ ১৯শ পর্যন্ত মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের আমল হইতে বাংলার রঘুনাথ রামনাথ প্রভৃতির আমল পর্যন্ত এই প্রমাণের বিচারই একমাত্র বিচার হইয়া দাঁড়ায়। 'নব্যন্যায়' বলিয়া দর্শনের যে একটা শাখা বাংলায় পুষ্টি লাভ করিয়াছে তাহার প্রধান এবং কার্যত একমাত্র বিচার্য—প্রমাণের সংখ্যা ও প্রকৃতি।

প্রমাণ

সাধারণভাবে আমাদের জ্ঞান লাভের উপায় দুইটি— প্রত্যক্ষ ও অনুমান। বাহ্য বস্তুর জ্ঞান, আকাশের সূর্য, বাতাসের স্পর্শ, মেঘের ডাক, লবণের স্বাদ, ফুলের গন্ধ ইত্যাদি আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহা জানি, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান। আমার মন বিষণ্ণ, আমি ক্ষুধিত ইত্যাদি জ্ঞানও প্রত্যক্ষেরই অন্তর্গত। এই প্রত্যক্ষের সাহায্যে আমাদের একটা 'ব্যাপ্তি জ্ঞান' হয় ; এ যাবৎ যেখানে যেখানে ধুঁয়া দেখিয়াছি, সেইখানেই আগুন দেখিয়াছি। তাহা হইতে একটা বিশ্বাস এই হইয়াছে যে, ধূম ও অগ্নির মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে— যাহাতে আগুন ব্যাতিরেকে ধুঁয়া হয় না। ইহার পর কোথাও ধুঁয়া দেখিলেই আমরা জানিব, সেখানে আগুন আছে। এইরূপে আগুনের জ্ঞান 'অনুমান'।

ভারতে প্রথম হইতেই তর্ক উঠে, এই দুইটি প্রমাণই কি গ্রহীতব্য। চার্বাক প্রমুখ এক শ্রেণীর লোক বলিতে আরম্ভ করেন, যাহা দেখি না, তাহা নাই। অপ্রত্যক্ষ যাহা তাহা নাই। ঈশ্বর ও পরলোক ইত্যাদি অস্বীকার করার পক্ষে ইহা একটা বড়ো যুক্তি। কিন্তু একটু মুশকিল এই

যে, বাড়ি হইতে বাহির হইলে আমি যখন অপ্রত্যক্ষ হইব, তখন কি আমার স্ত্রী-পুত্রেরা আমি নাই, এই ধরিয়া লইবে? চার্বাক গৃহিণী যখন-তখন বিধবা হইয়া যাইতে পারেন, এই ভয় দেখাইয়া সমালোচকেরা প্রত্যক্ষই একমাত্র জ্ঞানের উপায়—একমাত্র প্রমাণ— এইমত চার্বাককে পরিত্যাগ করিতে বলেন।

অন্য নাস্তিক দার্শনিকেরা— জৈন ও বৌদ্ধেরা— অনুমান ও প্রমাণ স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু ইহাই কি যথেষ্ট। প্রত্যক্ষ ও অনুমান ছাড়া আর কি জ্ঞান লাভের উপায় নাই। বুদ্ধের যিনি পিতা বলিয়া খ্যাত তিনি যে বুদ্ধের পিতা তাহা তো প্রত্যক্ষেও পড়ে না, অনুমানেও নয়। কী করিয়া লোকে উহা জানিবে? পুত্র নিজেই ইহা কী করিয়া জানিবে? অন্যের মুখে শুনিয়া ত? অতীত ও অনাগত অনেক বিষয়ের জ্ঞানই তো আমরা এইভাবে লাভ করি। তাহা হইলে লোকের কথারও প্রামাণ্য আছে— উহাও একটা প্রমাণ। উহাকে 'শব্দ' প্রমাণ বলা হয়। বৈদিক ঋষিদের বুদ্ধি অসাধারণ, আধ্যাত্মিক শক্তি অনন্যসাধারণ, অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্মদৃষ্টির তুলনা নাই। সুতরাং তাঁহাদের মুখ দিয়া যে 'শব্দ' নির্গত হইয়াছে, তাহার প্রামাণ্যও রাম-শ্যাম-যদুর মুখের কথার চেয়ে সহস্রগুণ বেশী। কাজেই ঋষি-মনে আবির্ভূত, ঋষিমুখ-বিনিঃসৃত বেদ একটি মস্ত প্রমাণ। ভারতে যাহারা ইহা মানে নাই তাহারা নাস্তিক। আস্তিকেরা সকলেই বেদ প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। যে-কোনো ব্যক্তির মুখের কথা সাক্ষ্য-প্রামাণ্য কি না, তাই নিয়া মতভেদ আছে। সাধারণভাবে এবং আদালতেও যাহাকে বিশ্বাস্য মনে করা যায়, তাহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য, যাহাকে অবিশ্বাস্য মনে করার কারণ আছে, তাহার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য। দর্শনেও কেহ কেহ এই

মত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আস্তিকমহলে বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে আর দ্বিমত নাই।

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ সকল আস্তিকেরাই মানিয়াছেন। ইহার অধিকও অনেকে মানিয়াছেন। যদি শুনি, গোরুর মতো একটা বন্য জন্তু আছে, যাহার নাম 'গবয়', আর কখনও যদি একটা জন্তু দেখি যাহা দেখিতে গোরুর মতো অথচ গোরু নয়, তাহা হইলে উহাকে 'গবয়' মনে করিতে আমরা সহজেই পারিব। উহাও একটা জ্ঞানোপায়—নাম দেওয়া হইয়াছে 'উপমান'। যাঁহারা উহাকে পৃথক প্রমাণ বলিয়া মানেন না তাঁহারা উহাকে শব্দ ও অনুমানের মিশ্রণ মনে করেন। যাঁহারা মানেন তাঁহাদের মতে প্রমাণ-চারিটি— প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ।

ইহা ছাড়া আরও প্রমাণ অনেকে স্বীকার করিয়াছেন। দেবদত্তকে যদি বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখায় অথচ তাহাকে যদি আহার করিতে কেহ না দেখে, তবে সে লুকাইয়া— রাত্রে কিংবা অন্য সময় খায়; এই জ্ঞান অনিবার্য। ইহাকেও একটা পৃথক জ্ঞানোপায় অনেকে মনে করিয়াছেন, এবং ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'অর্থাপত্তি'। ইহাকেও অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করা যায়— দেহের পুষ্টি ও আহারের মধ্যে অব্যতিরেকী সম্বন্ধ হইতে একটি হইতে আর-একটি অনুমান করা যায়— এইজন্য ইহাকে পৃথক 'প্রমাণ' বলিয়া সকলে স্বীকার করেন নাই।

ঘরে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছি; এখানে কোনো হাতি নাই; দেখিতেছি না বলিয়াই নাই। এই যে না-দেখা হইতে না-থাকার জ্ঞান ইহাকেও কেহ কেহ একটা পৃথক-বিধক জ্ঞান মনে করিয়াছেন। ইহার নাম 'অনুপলব্ধি' বা 'না-দেখা'। ইহাকেও অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করা যায় বলিয়া অনেকে পৃথক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু

যাঁহারা এই দুইটি স্বীকার করেন তাহাদের মতে প্রমাণ ছয় প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি।

কেহ কেহ এই তালিকা আরও দীর্ঘ করিতে চাহিয়াছেন। ঐতিহ্য বা কিম্বদন্তী সহজেই শব্দপ্রমাণে পড়ে। অবশ্যই ইহা বেদের অন্তর্ভুক্ত নয়; অথচ, কিছু জ্ঞান ইহাতেও হয়। সেইজন্য ইহাকে কেহ কেহ পৃথক্ প্রমাণ মনে করিয়াছেন। কিন্তু ইহার প্রামাণ্যও বেশী নয়। কেহ কেহ 'সম্ভব' বলিয়া আরও একটা 'প্রমাণ' স্বীকার করিয়াছেন। একশত যে জানে, 'দশ'ও সে জানে; কেননা 'দশ' শতের অন্তর্ভুক্ত। ইহা 'সম্ভব' হইতে লব্ধ জ্ঞান। এইভাবে প্রমাণের সংখ্যা দাঁড়ায় আট। কেহ কেহ আরও দুইটি যোগ করিয়া উহাকে 'দশ'-এ তুলিয়াছেন। কিন্তু সামান্য বিচারেই দেখা যাইবে যে এই সংখ্যা-বৃদ্ধিতে কোনো বাহাদুরি নাই। প্রকৃত পক্ষে, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই প্রথম তিনটিই পৃথক প্রমাণ। বাকি সব ইহাদেরই রূপান্তর এবং অন্তর্ভুক্ত। আরও বিচার করিলে শব্দকেও পৃথক প্রমাণ না মানা চলে। তাহা হইলে প্রমাণ দাঁড়ায় প্রত্যক্ষ ও অনুমান—এই দুইটি।

এইসব প্রমাণ লইয়া ভারতের দর্শনে যে দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম বিচার হইয়াছে, দর্শনামোদীদের কাছে তাহা সরস এবং হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু আমাদের পক্ষে এখানে ইহার বেশী দূরে এবং আরও গভীরভাবে প্রবেশ করিবার অবকাশ নাই। দর্শনগুলির পৃথক আলোচনার সময় কথাটা আর-একবার উঠিবে।

প্রমাণ সম্বন্ধে যেমন মতভেদ রহিয়াছে, প্রমেয় সম্বন্ধেও সেইরূপ বিবিধ মত রহিয়াছে। তবে, প্রমেয়ের অন্তর্গত জীব, জগৎ ও পরমাত্মা বা ঈশ্বর এ সম্বন্ধে কোনো মতভেদ নাই। জীব সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন আছে; জগৎ বলিতে দিক্, কাল, আকাশ ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অণু,

পরমাণু, কার্যকারণ সম্বন্ধ ইত্যাদি অনেক কিছু বুঝায়। ঈশ্বরের বেলায়ও অস্তিত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া স্বরূপ, জীব ও জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি অনেক কথাই উঠে। এ সকল বিভিন্ন প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এইখানেই দর্শনের বিচিত্রতার উৎপত্তি।

পৌর্বাপর্য ও জয়-পরাজয়

কালিক সমস্যা

এ পর্যন্ত আলোচনায় ভারতের দর্শনের মূলধারা কয়টির পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি। 'আস্তিক' শ্রেণীর অন্তর্গত দর্শন ছয়টি—সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা এবং বেদান্ত। ইহারাই 'ষড়দর্শন' নামে প্রসিদ্ধ। 'নাস্তিক' শ্রেণীর অন্তর্গত দর্শন মূলত তিনটি—লোকায়ত বা চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ। এই নয়টি দর্শনের কথা যিনি ন্যূনাধিক জানেন, তিনি নিজেকে ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে পরিচিত মনে করিতে পারেন। কিন্তু বড়ো নদীর বা বৃক্ষের যেমন শাখাপ্রশাখা থাকে তেমনই দর্শনেরও বিপুল চিন্তাস্রোতের শাখাপ্রশাখা উৎপন্ন হয়। উপরি-উক্ত নয়দর্শনের মধ্যে বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনের একাধিক শাখা রহিয়াছে; অল্পবিস্তর পরিচয় প্রয়োজন।

এই নয়টিই ভারতের প্রধান দর্শন। কিন্তু ইহাদের মধ্যেই সমগ্র দার্শনিক চিন্তা— ২৫০০ বৎসরের বিচার-গবেষণা, বিবাদ-বিতর্ক ও তত্ত্বান্বেষণ—সীমাবদ্ধ রহিয়াছে—স্রোত কখনও কূল অতিক্রম করে নাই, এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। ইহারা প্রধান সন্দেহ নাই; কিন্তু অপ্রধান ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও একাধিক দর্শনের কথা আমরা জানি। তাহাদের প্রভাব-প্রতিষ্ঠা তেমন হয় নাই; সেজন্যই তাহারা অপ্রধান;

আর, এখনকার মূল্যের মাপে দেখিলে ইহাদের মূল্যও তত নয়। কিন্তু ইহারা আবির্ভূত হইয়াছিল এবং একেবারে লুপ্ত সকলেই এখনও হয়তো হয় নাই। সুতরাং তাহাদের নামোল্লেখ অন্তত আমাদিগকে একবার করিতে হইবে। আপাতত প্রধানদের কথাই ভাবিব।

ঐতিহাসিক আলোচনায় কালক্রম একটি প্রধান বক্তব্য বিষয়। কোন্ ঘটনার পর কোন্ ঘটনা ঘটিয়াছে, ইতিহাসের সেটিই প্রধান বিচার। কেন ঘটিল, তাহার ফল কী হইল, ইত্যাদি বিচারও ইতিহাস করে বটে; কিন্তু সে সকলের আগে জানিতে চায়, কিসের পর কী ঘটিয়াছে। প্রাচীন ইতিহাসের বেলায় নানা উপায়ে এই পৌর্বাপর্য নির্ধারণ করা হইয়া থাকে।

আমরা যে কয়টি প্রধান দর্শনের আলোচনা করিব ঠিক করিয়াছি তাহাদের মধ্যে কে আগে কে পরে? নিশ্চিতভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। প্রথমত, এই সকল দর্শনের কোনোটিই একজনের সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি নয়; অনেকের হাতে আস্তে আস্তে উহা গড়িয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য কোনো এককালে ইহার আরম্ভ দেখানো সম্ভব নয়, দ্বিতীয়ত, যাহারা ইহাদের প্রবর্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাদের কালনির্ণয়ও সহজ নয়। মিল্, স্পেন্সারের দর্শনের আরম্ভ জানা কঠিন নয়; যে বৎসর এঁদের বই ছাপা হইয়া বাহির হইল, সেই সময় হইতে ইহার প্রচার শুরু হইল। ঠিক এইভাবে ছাপার গ্রন্থের সাহায্যে কোনো নির্দিষ্ট সালে তো প্রাচীনদের দর্শনের প্রচার হয় নাই; সুতরাং উঁহাদের কে আগে, কে পরে এবং কে কার পরে বলা শক্ত।

কালিক গণনা ছাড়া আরও এক উপায়ে পৌর্বাপর্য নির্ণয় করা যায়। কাহাকেও যদি বলিতে শুনি 'যাই', তবে তাহাকে পূর্বে কেহ আহ্বান করিয়াছে এইটুকু সেই আহ্বান না শুনিয়াও আমরা জানিতে পারি।

আমরা যে মিল স্পেন্সারের নাম করিতেছি ইহা হইতেই—আর কোনো প্রমাণ না থাকিলেও—আমরা যে তাহাদের পরবর্তী, ইহা সকলে বুঝিবে। তেমনই কেহ যদি শব্দপ্রমাণের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে শব্দপ্রমাণ বলিয়া গৃহীত হওয়ার পর তিনি আসিয়াছেন। বুদ্ধকে 'পাষণ্ড' বলিয়া যদি কেহ গাল দেয়, বুঝিতে হইবে, সে বুদ্ধের পরে, এবং বুদ্ধের প্রভাব ম্লান হওয়ার সময়ের লোক। মদ্য খাইবে না, যদি শাস্ত্র বলে তবে সহজেই বুঝা যায় এই বিধি প্রণীত হওয়ার সময় কেহ না কেহ—তাহাদের সংখ্যা কম না হইয়া বেশী হওয়াই বরং সম্ভব—মদ খাইত। এইভাবে যৌক্তিকতার দিক দিয়া—পরস্পরের আশ্রয় আশ্রয়ী সম্বন্ধ দিয়াও পৌর্বাপর্য নির্ণয় করা যায়।

আমাদের আলোচ্য দর্শনগুলির পৌর্বাপর্য নির্ণয় কালিক বিচার দ্বারা যখন করা কঠিন, তখন এই পরস্পরের আশ্রয়াশ্রয়ী সম্বন্ধ দ্বারা উহা হয়তো করা যাইতে পারে। কিন্তু উহা একেবারে নির্ভুল না-ও হইতে পারে; আর ইহা আংশিক মীমাংসা মাত্র। এই চেষ্টার ফল কী দাঁড়ায়?

উপনিসদে এবং উপনিষদেরও আকর গ্রন্থ ব্রাহ্মণগুলিতে আমরা দার্শনিক আলোচনার বীজ পাই। সেই হিসাবে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদকে আশ্রয় করিয়া, উহাদের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যে দর্শন ক্রমশ পুষ্টি লাভ করিয়াছে—সেই পূর্ব ও উত্তর মীমাংসাকেই আদিম দর্শন বলিতে হয়। সাধারণ কালিক গণনায়ও উহাই সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু উপনিষদে ন্যায় বৈশেষিকের না হউক, সাংখ্যযোগের পরিভাষা ও ভাব পাওয়া যায়। তাহা হইলে ইহাদেরও তো বংশ প্রাচীন হইয়া দাঁড়ায়। অধিকন্তু সাংখ্যের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ

'কপিল' অতি প্রাচীন ও সম্মানিত ঋষি। গীতায় (১০।২৬) 'সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ' বলিয়া কপিলকে সিদ্ধশ্রেষ্ঠ ঘোষণা করা হইয়াছে। কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ প্রভৃতি মহাভারতাদিতে সাংখ্য শাস্ত্রের প্রবর্তক বলিয়া প্রখ্যাত। তর্পণবিধিতে ইঁহাদের পৃথক তর্পণের ব্যবস্থাও রহিয়াছে। এইসব বিবেচনা করিলে সাংখ্যকে অর্বাচীন মনে করা কঠিন।

উপনিষদের প্রতিপাদ্য 'ব্রহ্ম'; বেদান্ত দর্শনেরও তাহাই। সুতরাং উপনিষদ্ আর বেদান্ত সমবয়সী, এই সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়ায়। কপিলও অতি প্রাচীন, সম্মানিত ঋষি; উপনিষদেও তাঁর মতের আভাস আছে; সুতরাং তাঁহার প্রবর্তিত সাংখ্যকেও প্রাচীন মনে করিতে হয়। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে কে বেশী প্রাচীন, এই প্রশ্ন অমীমাংসিতই থাকিয়া যাইবে।

ন্যায়-বৈশেষিকও অর্বাচীন দর্শন নয়, বিশেষত বৈশেষিককে অনেকে ন্যায়ের অপেক্ষাও প্রাচীন মনে করিয়াছেন। উপনিষদে স্পষ্টত ইহাদের মতের কথাই বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, উপনিষদ্ বৈদিক মণ্ডলীর শাস্ত্র। এই মণ্ডলী সমস্ত সমাজ ব্যাপিয়া ছিল্ না। ইহার বাহিরেও স্বাধীন চিন্তার প্রয়াসী দার্শনিকের থাকা অসম্ভব ছিল না। মহাবীর ও বুদ্ধের আবির্ভাব একটা আকস্মিক ঘটনা ছিল না। ইহার জন্য ভূমি প্রস্তুত হইতেছিল; ক্ষত্রিয় হউক, ব্রাহ্মণ হউক, এমন অনেকে ছিল—যাহারা বেদবাহ্য বিচারও করিতে সাহস পাইত। ন্যায়-বৈশেষিকের বীজ সে ক্ষেত্রে উপ্ত হয় নাই, ইহা কি খুব জোর করিয়া বলা চলে।

এইভাবে বিচার করিলে এই ছয়টি দর্শনের মধ্যে 'কে কাহার পর' এই প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা হতাশ হইয়া পরিত্যাগ করিতে হয়। শুধু সাধারণভাবে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, বুদ্ধের আবির্ভাবের সময়ে

এই ছয়টি বৃক্ষই রোপিত হইয়াছিল, তবে সকলের বৃদ্ধি সমান হইয়াছিল এরূপ নয়।

আরও একটা কথা। এই ছয়টি দর্শনে আমরা অল্পবিস্তর বিভিন্ন ছয়টি চিন্তাধারার সাক্ষাৎ পাই। ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়া কতক কতক সাহিত্যও রচিত হইতেছিল। কিন্তু ইহাদের পরিপূর্ণ আকার বুদ্ধের সময়ে হয় নাই। এই ছয়টি দর্শনেরই পৃথক পৃথক সূত্রগ্রন্থ আছে। সেইসব সূত্র বুদ্ধের সময়ে রচিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার পক্ষে কোনো যুক্তি নাই। দর্শনগুলির আবির্ভাব হইয়াছিল— সেই সব ধারায় লোকে ভাবিতে আরম্ভ কবিয়াছিল— কিন্তু সেইসব চিন্তার পূর্ণ পরিণতি তখনও হয় নাই— পূর্ণ আকারও দেওয়া হয় নাই— অর্থাৎ সূত্রগুলি রচিত হয় নাই।

এই সূত্র-গ্রন্থগুলির কোনটি কবে রচিত হইয়াছে তাহাই কি আমরা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি। অনেক মতভেদ রহিয়াছে। সূত্রগুলি সব একহাতের রচনা নয়, একথা আমরা বলিয়াছি। কেন্দ্রস্থানীয় সূত্রগুলি কোন্ দর্শনের কবে রচিত হইয়াছে, তাহাই কি আমরা জানি। সাংখ্য দর্শন হিসাবে প্রাচীন হইলেও তাহার সূত্রগুলিকে অনেকেই অত্যন্ত অর্বাচীন মনে করিয়াছেন— খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দী ইহাদের রচনা কাল, ইহাও কেহ কেহ ভাবিয়াছেন। তাহা হইলে সূত্রের মধ্যে সাংখ্যসূত্রই বয়সে সকলের ছোটো, এই সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়ায়। সূত্রের পূর্বে সাংখ্যদর্শনের দুইখানা প্রামাণ্য গ্রন্থ ছিল— তত্ত্ব-সমাস ও ঈশ্বর কৃষ্ণের রচিত সাংখ্যকারিকা। ষষ্টিতন্ত্র বলিয়া আর-একখানা প্রাচীনতর বইয়ের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। অন্যান্য দর্শনের সূত্রগুলির রচনাকাল খ্রীষ্টের ৫০০ বৎসর পূর্ব হইতে ৫০০ বৎসর পর এই হাজার বৎসরের মধ্যে নানাজনে নানা জায়গায়

ফেলিয়াছেন। মতভেদ এত প্রচুর যে, এ সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু না বলাই ভালো। ইহাদের মধ্যেও আবার পৌর্বাপর্যের প্রশ্ন আছে; তাহাকেও অমীমাংসিত মনে করাই ভালো। সুতরাং আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত এই দাঁড়াইল যে, দর্শনগুলির জন্মকাল অতি প্রাচীন— বুদ্ধেরও আগে; কিন্তু সূত্রগুলি ক্রমশ রচিত— কোনটি কোন্ সময়ে ঠিক করিয়া বলা কঠিন; তবে সাংখ্যসূত্রই ইহাদের মধ্যে অর্বাচীন; যোগও অর্বাচীন; মীমাংসা (পূর্ব ও উত্তর) এবং বৈশেষিক প্রাচীন। কাল নির্ণয়ের ইহার অধিক চেষ্টা না করিলেও আমাদের আসল আলোচনার কোনো অসুবিধা হইবে না।

এই তো গেল আস্তিক দর্শনের কথা। নাস্তিকদের সম্বন্ধে কী মীমাংসা? সৌভাগ্যক্রমে সেখানে প্রশ্ন এত জটিল নয়। মহাবীর ও বুদ্ধের আবির্ভাব-কাল দুই এক বছরের হিসাব গরমিল বাদ দিলে একরকম ঠিক। তাঁহাদের শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত দর্শন তাঁহাদের পরে— হয়তো, ১৫০।২০০ বৎসর পরে— একথা সহজবোধ্য। মহাবীর বুদ্ধের কিছু আগে, সেই যুক্তিতে জৈন দর্শনকে প্রাচীনতর কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু সামান্য কিছু পরে হইলেও বৌদ্ধদের দর্শনের স্রোত বেশী বিস্তৃত, বেশী গভীর এবং বেশী প্রখর। তাহার পর ঐ ঐ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট দার্শনিকদের কে কবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা লইয়া মতভেদ সম্ভব হইলেও চীন-তিব্বতের পণ্ডিতদের অনুগ্রহে শিলালিপি, তাম্রলিপি ইত্যাদির সাহায্যে ইহাদের কালনির্ণয় অনেকটা সহজসাধ্য।

নাস্তিকদের অন্যতম চার্বাকের কাল অনির্দিষ্ট, তাঁহার প্রকৃতপক্ষে সুনির্দিষ্ট কোনো চিন্তাধারাও নাই। শাস্ত্রশাসনের— নীতি ও ধর্মের শাসনের— বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ যে কোনো সময়ে যে কোনো দেশে

দেখা দিতে পারে। ভোগেচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক। উহা যখন প্রবল হয় তখন চার্বাক-জাতীয় নাস্তিক দর্শন দেখা দেয়। ইহার বেশী উহার কালনির্ণয় সম্ভবও নয়, প্রয়োজনীয়ও নয়। উহার প্রকৃতিটি জানাই দার্শনিকের পক্ষে যথেষ্ট।

সংগ্রাম ও জয়-পরাজয়

ভারতের প্রসিদ্ধ নয়টি দর্শনের মধ্যে কালনির্ণয় অপেক্ষা বিশেষভাবে আলোচ্য বিষয় উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ। এইসব দর্শনদের মধ্যে বিশেষত আস্তিক ও নাস্তিকদের মধ্যে একটা উগ্র সংগ্রাম ও জিগীষার ইতিহাস রহিয়াছে; এবং অস্ত্রের যুদ্ধের মতো কোনো একটির জয়ে ইহার সমাপ্তি ঘটিয়াছে। কালনির্ণয় ততটা সফল না হইলেও এই সংগ্রাম ও জয়-পরাজয়ের ইতিহাস আমরা সহজেই জানিতে পারি।

ধর্মের সংগ্রামে পরাজিত ধর্মের লোপ হয়; অস্ত্রের সংগ্রামে পরাজিত একেবারে লুপ্ত না হইলেও অন্তত জেতার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। আরব ও পারস্য মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া পূর্বের ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে; আগের ধর্ম আর সে-সব দেশে নাই। খ্রীষ্টান ও অখ্রীষ্টান ধর্মের সংগ্রামে জয়ী খ্রীষ্টান ধর্ম অখ্রীষ্টান ধর্মকে ইউরোপ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে। অস্ত্রের সংগ্রামে পরাজিত আমেরিকার ও অস্ট্রেলিয়ার আদিমবাসীরা বিলুপ্ত হইতেছে; জার্মানী নেতার অধীনতা মানিয়া লইতেছে। কিন্তু চিন্তার যুদ্ধে পরাজিতের বা বর্জিতের এরূপ বিলোপ ঠিক ঘটে না। মানুষ চিন্তা করিয়া একবার যে আবিষ্কার করে কিংবা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহা পরিত্যাগ বা পরিবর্তন করিতে পারে, কিন্তু একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায় না। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান হইতে একটা দৃষ্টান্ত লওয়া

যাইতে পারে। আলোর স্বরূপ কী, ইহা পদার্থ-বিজ্ঞানের একটা প্রশ্ন। প্রথমটাতে অনেকে মনে করিতেন, আলো অতি সূক্ষ্ম কণার অতি দ্রুত বিচ্ছুরণ। পর-পর কণাগুলি এত দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে যে আমাদের চোখে সেগুলিই রশ্মি বা রেখার মতো দেখায়। কিন্তু পরে দেখা গেল, আলোককে কণাসমষ্টি মনে করিলে কতকগুলি ঘটনার ব্যাখ্যা হয় না। তখন ধরিয়া লওয়া হইল, উহা অতি সূক্ষ্ম একটা বাষ্পীয় পদার্থের ঢেউ। ইদানীং আবার কতকগুলি ক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাতে আলো-কে কণাবিচ্ছুরণ এবং ঢেউ উভয়ের মিশ্রণ বা মাঝামাঝি মনে করা প্রয়োজন হইয়াছে। এইভাবে বিজ্ঞানের ইতিহাসে মানুষের ধারণা বদলাইয়া গিয়াছে। পূর্বের মত বর্জিত হয় কিন্তু একেবারে বিস্মৃত হয় না। বরং পর পর সেইগুলি মনে রাখাই বিজ্ঞানের ইতিহাস।

দর্শনের বেলায়ও অনুরূপ দৃষ্টান্ত মিলে। সেখানেও মতে-মতে সংঘর্ষ হয়, বিবাদে পরাজিত মত বর্জিত হয়, জয়ী মতই সাধারণে গ্রহণ করে; কিন্তু পরাজিত মত বর্জিত হইলেও বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যায় না, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রক্ষিত হইয়া থাকে। দর্শনের ইতিহাসও বিজ্ঞানের ন্যায় মতের রদবদলের কাহিনীতে ভরতি। ভারতের দর্শনের ইতিহাসেও ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়।

দর্শনের কোনো মত যখন কেহ প্রচার করে, তখন উহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর সত্য বলিয়া প্রচার করে না; উহাকে একমাত্র সত্য বলিয়াই প্রচার করা হয়। যাহা চরম সত্য, পরমতত্ত্ব, যেখানে চিন্তার পরিসমাপ্তি, যাহার উপর আর-কিছু বলিবার নাই, এইভাবে দার্শনিক তাঁহার চিন্তার সমষ্টি লোকে বিতরণ করেন। কেহ যদি বলেন, জগতের উৎপত্তি পরমাণু হইতে, তবে তাঁহার মতে ইহাই শেষ কথা।

আর কেহ যদি বলেন পরমাণু মিথ্যা, জগতের উৎপত্তি 'প্রকৃতি' হইতে অথবা 'ব্রহ্ম' হইতে, তবে তাঁহার সে-মত আংশিক সত্য, অন্যের মতও সত্য এইভাবে প্রচার করেন না। হয় পরমাণু, নয় প্রকৃতি, নয়তো ব্রহ্ম— ইহার একটিকে মানিতে হইবে, অন্য নয়। রামও ভদ্রলোক, রহিমও ভদ্রলোক হইতে পারে; জগতে আমও সত্য, কাঁটালও সত্য; কিন্তু চূড়ান্ত সত্য একটি—ইহাই সাধারণত দর্শনের দাবি।

আমার কথাও সত্য আমার প্রতিবাদীর কথাও সত্য; এরূপ উক্তি দার্শনিক করিতে পারেন না। তৃতীয় ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে একটা মধ্য পন্থা হয়তো আবিষ্কার করিবে, কিন্তু মতপ্রবর্তক দার্শনিক একনিষ্ঠভাবে নিজের মতই একমাত্র সত্য মনে করিয়া থাকেন। ইহার ফলে দর্শনে মতে মতে সংগ্রাম হয়— একাধিক মত যখন সমানভাবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে, তখন তর্কযুদ্ধে ইহার মীমাংসা করিতে হয়। বিচারে একজন জিতিবে; অথবা তৃতীয়মত আবির্ভূত হইবে। যদি তৃতীয়মত আসে, তাহা হইলে বিবদমান উভয়েই পরাজিতের পর্যায়ে যাইবে। তাহা না হইলে একটি আর-একটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া লোকে গৃহীত হইবে। এই তো দর্শনের ইতিহাসের ধারা।

ভারতের নয়টি দর্শনের মধ্যেও এই প্রকার জয়-পরাজয়ের দীর্ঘ কাহিনী রহিয়াছে। নাস্তিক ও আস্তিকের বিরোধ বিপুল সংগ্রামে পরিণত হইয়াছিল। তাহার পর, নাস্তিক দর্শনগুলির পরস্পর এবং আস্তিক দর্শনগুলির পরস্পর সংগ্রাম যথেষ্ট হইয়াছে। যুদ্ধ অমীমাংসিত থাকে নাই। নাস্তিকের বিরুদ্ধে আস্তিক জয়ী হইয়াছে এবং আস্তিকদের মধ্যেও বিশিষ্ট আস্তিক, বেদমূলক দর্শন মীমাংসা এবং মীমাংসাদ্বয়ের মধ্যে বেদান্ত সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছে। এই

জয়-পরাজয় অর্থ ইহা নয় যে পরাজিত দর্শনগুলি সব একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। এখনও তাহাদের অধ্যয়ন অধ্যাপন হয়, এখনও অনেকে তাহাদের কোনো না কোনোটির অনুসরণ করেন, একমাত্র সত্য বলিয়া হয়তো বিশ্বাসও করেন; কিন্তু তথাপি তাহারা নিষ্প্রভ। যেমন ইউরোপে মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় দর্শন এখনও প্রত্নতাত্ত্বিকের অনুসন্ধিৎসা উদ্রিক্ত করে অথচ গৃহীত মত হিসাবে কদাচিৎ প্রচারিত হয়— এমনকি, প্রাচীন গ্রীসের দর্শন শ্রদ্ধার সহিত আলোচিত হইলেও ঠিক বর্তমানের গৃহীত দর্শন নয়— সেইরূপ ভারতেরও পরাজিত দর্শনসমূহ এখনও অনুশীলিত হয়— কোথাও বা গৃহীতও হয়, তথাপি শেষের দিক দিয়া অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে ইহাদের প্রভাব অত্যন্ত কমিয়া যায়।

কালের রেখায় কে পূর্বে কে পরে নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা কঠিন হইলেও এই জয়-পরাজয়ের ইতিহাসে দর্শনসকলের পরস্পরের স্থান নির্দেশ মোটেই কঠিন নয়। এই দীর্ঘ কলহের ইতিহাসে সকলের বড়ো কলহ হইয়াছিল, আস্তিক ও নাস্তিকদের মধ্যে। সেখানে বিবাদের প্রধান বিষয় ছিল বেদের প্রামাণ্য। আস্তিক দর্শন সকলে পরোক্ষভাবে অথবা প্রত্যক্ষভাবে—জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে মিলিত হইয়া বেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এই চেষ্টা সফল হয়—বেদ প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়।

তাহার পর নাস্তিক দর্শনগুলির পরস্পরের ভিতর এবং আস্তিক দর্শনগুলিরও পরস্পরের মধ্যে যে ভেদ ছিল, তাহাও বিবাদে পরিণত হয় এবং সেখানেও বুদ্ধি ও বিতর্কের সংগ্রামে জয়-পরাজয় হয়। নাস্তিকদের মধ্যেও পরস্পরের মত খণ্ডনের চেষ্টা হইয়াছে। জৈনরা আস্তিক দর্শন-গুলির সঙ্গে চার্বাক ও বৌদ্ধমতেরও খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছে; বৌদ্ধরাও

ঠিক তাহাই করিয়াছে। কেবল, চার্বাকের পক্ষে সকল মত খণ্ডন করিয়া নিজমত প্রতিষ্ঠার কোনো সুসম্বদ্ধ চেষ্টার ইতিহাস পাওয়া যায় না। নাস্তিকদের মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈনমতের কলহই উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধদর্শন একদিকে জৈনদর্শনের আক্রমণ ও অন্যদিকে সমস্ত আস্তিক দর্শন বিশেষ ভাবে বেদান্তের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া নির্বাসন বরণ করিয়া লইয়াছে। জৈন ধর্ম ও জৈন দর্শন ভারতে এখনও বর্তমান রহিয়াছে।

আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে পরস্পরের মতবিরোধের ফলে বিবাদ সমুদ্র উচ্ছলিত হইয়া উঠে, তাহা হ'তে শেষ পর্যন্ত বেদাশ্রিত দর্শন বেদান্তই সর্বজয়ী হইয়া বাহির হয়।

কালের ক্রম উপেক্ষা করিয়া এই জয়-পরাজয়ের ক্রম-অনুসারেও দর্শনগুলির আলোচনা অসমীচীন নয়।

দেবগণের ভাগ্যবিপর্যয়

আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনের মধ্যে কলহের সূত্রপাত কিভাবে হইয়াছিল, সেকথা আমরা বলিয়াছি; তাহার পরিণতির ইঙ্গিতও করিয়াছি। বেদ প্রমাণ কিনা, এই ছিল উভয়ের প্রধান বিচার্য। নাস্তিকরা বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করেন। কিন্তু এইখানেই সব শেষ হয় নাই। বেদ যদি অপ্রমাণ হয়, তবে বৈদিক দেবতাদের কী হইবে? ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশেই বেদের সকল প্রার্থনা প্রযুক্ত হইয়াছে; তাঁহাদিগকেই যজ্ঞে আহ্বান করা হয়; তাঁহাদের তৃপ্তির জন্যই যজ্ঞাদি সমস্ত ধর্মপ্রচেষ্টা। বেদকে অস্বীকার করিলে দেবতাদের সম্মানও থাকে না।

বেদের ভিতরই উপনিষদের একাধিক স্থলে দেবতাদের সম্বন্ধে একটা

জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিতেছিল। তাঁহাদের সংখ্যা কত (বৃ. আ. ৩।৯।), তাঁহাদের শক্তির উৎস কোথায় (কেন ৩) ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন উঠিতেছিল। তাহারা সৃষ্ট, প্রজাপতির সন্তান, অসুরদের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইয়াছেন, ইত্যাদি অনেক কথা বেদেও রহিয়াছে। অসুরদের জেতা বলিয়াই তাহারা পূজ্য হইয়া বেদে সম্মান পাইয়াছেন, কিন্তু যতটা সম্মান তাঁহারা পাইতেছিলেন ততটার যোগ্য কিনা, এই প্রশ্নও আস্তে আস্তে উঠিতেছিল। অনেকবার অনেকরকম অসুবিধায় তাঁহারা পড়িয়াছেন। অসুর তারক বরলাভে বলীয়ান হইয়া দেবতাদিগকে চাকরের মতো নিজের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিল, একথা কার্তিকেয়ের জন্মবিবরণে পুরাণে এবং কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যেও পাওয়া যায়। রামায়ণের রাবণও তো দেবতাদের উপর কম দৌরাত্ম্য করে নাই। একশত আটটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে ইন্দ্রত্ব লাভ হয়, এরূপ একটা কিম্বদন্তী ছিল। সেইজন্য ইন্দ্র সর্বদা খবর রাখিতেন, কে কোথায় বেশী অশ্বমেধ করিয়া ফেলিল। এই সব বৃত্তান্ত দেবতারা পূজ্য হইলেও একেবারে স্বয়ংসিদ্ধ নহেন, এই কথাটা প্রমাণ করিয়া দেয়।

উপনিষদের ব্রহ্মবাদেও দেবতারা ব্রহ্মের তুলনায় অনেক ছোটো। তাঁহারা জীব এবং মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়ন তাঁহাদেরও প্রয়োজন— ইত্যাদি কথা উঠে। বেদান্ত-সূত্রেও তাঁহাদের সম্বন্ধে এই মীমাংসাই হয় (১।৩।২৬)। জৈমিনির পূর্ব-মীমাংসায় অবশ্য তাঁহারা একটু উচ্চতর আসন লাভ করিয়াছেন; তাঁহাদের যজ্ঞাদি কর্মের প্রয়োজন নাই, কেননা কর্মলভ্য ফল স্বর্গ তাঁহারা পাইয়া বসিয়া আছেন; পূর্ব-মীমাংসার এই সিদ্ধান্ত তাঁহাদিগকে অনেক উঁচুতে রাখিয়াছে। কিন্তু বেদান্ত যখন ঘোষণা করিল স্বর্গ অপেক্ষাও বড়ো মুক্তি, তখন সিদ্ধান্ত হইয়া গেল

দেবতারাও অমুক্ত জীব, সুতরাং মোক্ষশাস্ত্রের প্রয়োজন তাঁহাদেরও মানুষের মতো রহিয়াছে।

নাস্তিকদের মধ্যে দেবতাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ নাস্তিক্যের উপযুক্তই হইয়াছিল। মহাবীর দেবতাদের চেয়েও বড়ো ছিলেন—দেবতারা তাঁহার পরিচর্যা করিতেন, ইত্যাদি কথা জৈনশাস্ত্রে আছে। বৌদ্ধরাও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। চার্বাক তো সমূল বেদই তুচ্ছ করিয়াছেন—দেবতাদের সম্বন্ধে তাঁহার মত অনুকূল হওয়ার কথা নয়। এইভাবে দর্শনের যুগে বুদ্ধের আবির্ভাব সময়ের পূর্বে ও পরে দেবগণের প্রতিপত্তি অনেক কমিয়া যায়। দর্শনে সে প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোনো চিহ্ন নাই। জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর সম্বন্ধেও সকল দর্শনের— এমনকি আস্তিকদের সকলের মতও অনুকূল নয়। কিন্তু দর্শনে যাহা হউক না কেন, ধর্মে দেবতাগণ এখনও রহিয়াছেন। বরং আক্রমণের পর কোনো কোনো দিক্ দিয়া তাঁহাদের অবস্থার একটু উন্নতিও হয়।

জৈনরা বেদ না মানিলেও মহাবীরকে মানিত— তাঁহার মূর্তি পূজা করিত; হিন্দুর ছোটখাটো দেবতাদিগকে মানিতেও আপত্তি করিত না। বৌদ্ধরাও বুদ্ধের বিভিন্ন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজাঅর্চনা করিত।

বুদ্ধের পরে বৈদিক দেবতারা অবৈদিক আরও অনেক দেবতার সাহচর্য লাভ করেন। প্রাচীন দেবতা যম, বরুণ ইত্যাদি কেহ কেহ বিস্মৃত হইয়া গেলেও অন্য অনেকে বাঁচিয়া যান। এবং অবৈদিক দেবগণের সহিত একযোগে দল-পুষ্টি করিয়া হিন্দুর ধর্মে পুনঃপ্রবেশ করেন। অস্পষ্টদেহ বৈদিক দেবতাদের স্পষ্ট মূর্তি কল্পনা করা হয়। প্রস্তর, ধাতু, মৃত্তিকার সাহায্যে তাহাদের বহু মূর্তি নির্মিত হইয়া পূজিত হয়—এখনও হয়। তাঁহাদের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশাল মন্দির

নির্মিত হইতে থাকে—তাঁহাদের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজা পাইতে থাকে। বুদ্ধের ধর্ম নির্বাসিত হওয়ার পর এইভাবে দেবতাদের বরং ভাগ্যোন্নতি হইয়া যায়। পরবর্তী জৈন ধর্ম ইহাতে বাধা না দিয়া পরোক্ষে অপরোক্ষে সাহায্যই করিয়াছে।

সাধারণ গৃহীত ধর্মে যাহা হউক, উপনিষদের বিচারের পর দর্শনে আর তাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ছাড়া ক্ষুদ্র দেববাহুল্য দর্শন হইতে তিরোহিত হয়। ইউরোপেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। খ্রীষ্টান ধর্মের প্রবেশের পূর্বে গ্রীক্‌দেশে বহু দেবতা পূজা হইত। সেখানকার খ্রীষ্টপূর্ব দর্শনেও তাহাদের শক্তিসামর্থ্য সংখ্যা ইত্যাদির প্রশ্ন উঠে। কিন্তু দর্শন একটা শেষ মীমাংসা করিবার পূর্বেই খ্রীষ্টান ধর্ম সেখানে প্রবেশ করে। আস্তে আস্তে চিরতরে গ্রীস ও রোমের দেবগণ তিরোহিত হন। লৌকিক ধর্মেও আর পুনর্গৃহীত হন নাই। ভারতে মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া লৌকিক ধর্মে পুনর্গৃহীত হন—একেবারে লুপ্ত হয়তো কখনই হন নাই; কিন্তু দর্শনে তাঁহাদের স্থান হয় নাই।

আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনের সংগ্রামের সঙ্গে দেবগণের এই ভাগ্য বিপর্যয়ের কতকটা সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া কথাটা এখানে তুলিতে হইল। নাস্তিক দর্শনের পরাজয়ে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইল, কিন্তু দার্শনিকের কাছে দেবতাগণের কোনো পদোন্নতি হইল না। আর, আস্তিক দর্শন-গুলির মধ্যে বেদান্ত যখন সর্বজয়ী হইল, তখন উপনিষদের ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা হইল—এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম গৃহীত হইলেন; বহুবচনবাচ্য দেবতারা আর সে চিন্তায় উচ্চস্থান পাইলেন না। ব্রহ্মের স্বরূপ লইয়া বিতর্ক হইয়াছে— তিনি বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ—এইসব পদবাচ্য কিনা সে তর্কও

হইয়াছে; কিন্তু ক্ষুদ্র বৃহৎ অন্য দেবতাদের কোনো বিশিষ্ট স্থান দর্শন দিতে পারে নাই। কিভাবে ইহা ঘটিল তাহা বুঝিতে হইলে জয়-পরাজয়ের ক্রমঅনুসারে দর্শনগুলির কথা অতঃপর আমাদিগকে ভাবিতে হয়।

২

নাস্তিক দর্শন

১. চার্বাক

চার্বাক দর্শনের ইতিহাস দীর্ঘ নয়— শাখা-প্রশাখায় ইহার কোনো বিস্তৃতিও দেখা যায় না, সম্ভবত ছিল না। কিন্তু ইহার প্রসিদ্ধি ছিল। আস্তিক দর্শন ইহার মত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছে; অন্য নাস্তিকেরাও করিয়াছেন, যথা জৈন দর্শনের বই স্যাদ্‌বাদমঞ্জরী। ইহাকে একেবারে উপেক্ষা করা বালকের উক্তি বা উন্মত্তের প্রলাপ মনে করিয়া অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয় নাই। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, সমাজে ইহার কিছু প্রতিপত্তি ছিল। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ভোগের দিকে। দর্শনের সিদ্ধান্ত—গভীর চিন্তার পর জ্ঞাত সত্য হিসাবে যদি এই সব প্রবৃত্তির সাফাই গাওয়া সম্ভব হয়, তবে সেই সিদ্ধান্ত বহু নরনারীর চিত্ত আকর্ষণ করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কী। চার্বাকের অদৃষ্টে সেই বাহবা জুটিয়াছিল।

চার্বাকের নামের ব্যুৎপত্তি অনেকে করিয়াছেন—চারু বাক্ যাহার এই অর্থে। প্রবৃত্তির উপাসনার সহায়ক তাহার উক্তি মধুর—শ্রুতি-সুখকর—সেই জন্য চারু। এই দর্শনের নামান্তর লোকায়ত—লোকে অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে সহজেই বিস্তৃত (আয়ত) হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া এই নাম হইয়া থাকিবে। মাধবাচার্যও সেইজন্য 'লোকায়ত' নামটি 'অন্বর্থ' বলিয়াছেন।

চার্বাকের উল্লেখ—তাহার মতের বিচার ও খণ্ডন—দর্শনে এবং দর্শনের বাহিরে—মহাভারতাদি গ্রন্থে অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু

তাঁহার নিজস্ব গ্রন্থ আমরা কিছু পাই না। তাঁহার গুরু-পরম্পরা বা সম্প্রদায়েরও বিশেষ কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রাচীনদের মধ্যে সকলের বেশী বিস্তৃত বিবরণ বোধ হয় দিয়াছেন মাধবাচার্য তাঁহার 'সর্ব-দর্শনসংগ্রহ'-নামক গ্রন্থে। এই বিবরণে মাধবাচার্য কতকগুলি লৌকিক গাথা উদ্ধৃত করিয়াছেন, আবার বৃহস্পতির উক্তি বলিয়া কতকগুলি শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বৃহস্পতি কে ছিলেন, বলা কঠিন। পুরাণ-মতে দেবতাদের গুরুরও ঐ নাম। বিষ্ণুপুরাণে (৩।১৭) একটা উপাখ্যান আছে যে, দেবতারা দৈত্যদের কাহারও কাহারও তপশ্চর্যায় ভীত হইয়া বিষ্ণুর সাহায্য প্রার্থনা করেন। তপস্যায় কৃতকার্য হইলে দৈত্যেরা তাঁহাদের সমান কিংবা তাঁহাদের অপেক্ষা বড়ো হইয়া যাইবে, এই ছিল তাঁহাদের ভয়। বিষ্ণু দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া নিজের মায়া দ্বারা দৈত্যদিগকে মোহিত করিবার জন্য 'মায়া-মোহ'-নামক একটি উপদেষ্টা সৃষ্টি করেন; এবং এই ব্যক্তি নানাভাবে দৈত্যদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া তপস্যা হইতে বিচ্যুত করে। তাহার পর সেই সব উপদেশই নিজের শিষ্য দেবগণের উপকারের জন্য এবং দৈত্যদের সর্বনাশের জন্য বৃহস্পতি সূত্রাকারে পরিণত করেন। চার্বাক উহা আরও প্রচার করেন। 'মায়ামোহে'র চেষ্টায়ই বৌদ্ধ ও আর্হত মতেরও উদ্ভব হয়। এইসব কথা কতক বিষ্ণুপুরাণে কতক অন্যত্র নানা-ভাবে বিবৃত দেখা যায়। এই সমস্তই পৌরাণিক কাহিনী, ইতিহাসের মর্যাদা ইহারা পাইতে পারে না। সুতরাং চার্বাক-দর্শনের এবং চার্বাকের ইতিহাস আমরা বিশেষ কিছু জানি না, স্বীকার করাই ভালো।

নাস্তিক দর্শন

চার্বাকের মত

চার্বাকের মত কী। দর্শনের যে সাধারণ কাঠামো আমরা ঠিক করিয়াছি, সেই অনুসারে প্রথমে প্রমাণের কথা ভাবিতে হয়। চার্বাকের মতে একটি মাত্র প্রমাণ—প্রত্যক্ষ। যাহা দেখি না, শুনি না, স্পর্শ করিতে পারি না, যাহার স্বাদ কিংবা গন্ধ পাই না,—অর্থাৎ ইন্দ্রিয় যাহার কোনো জ্ঞান দেয় না, সে জিনিস নাই। সত্য জানিবার ইন্দ্রিয় ছাড়া আর কোনো উপায় আমাদের নাই।

কেহ কেহ অনুমানাদি প্রমাণের কথা বলেন। পাহাড়ে ধূম দেখিয়া আমরা জানি সেখানে আগুন আছে; ইহা অনুমান। এই অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। যেখানে যেখানে ধূম আছে, সেখানেই আগুন আছে—ধূম ও অগ্নির মধ্যে এই যে 'অবিনাভাব' অর্থাৎ একটি (অগ্নি) ছাড়া আর একটি (ধূম) থাকিতে পারে না, এই যে সম্বন্ধ, ইহারই নাম 'ব্যাপ্তি'। যদি জানি যে যেখানেই ধূম সেখানেই আগুন, তাহা হইলে পাহাড়ে ধূম দেখিয়া আগুনের অস্তিত্ব জানা যায়। কিন্তু যেখানে ধূম সেখানেই আগুন আছে, এই ব্যাপ্তি আমাদের জানিবার তো কোনো উপায় নাই। ইহা বাহ্য কিংবা আন্তর কোনো প্রকার প্রত্যক্ষেরই অন্তর্গত নয়; সুতরাং 'ব্যাপ্তি' আমরা জানিতে পারি না; মনে করি বটে যে, জানি, কিন্তু তাহা ভুল। ব্যাপ্তি যদি জানা না যায়, তবে অনুমান আর কী করিয়া সম্ভব হয়। কখনো কখনো অনুমান সত্য হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেটি তাবিজ-কবচ কিংবা মন্ত্রৌষধির মতো; কখনো ফলে, কখনো নয়। সুতরাং অনুমান নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নয়।

অনুমানই যদি না টিকিল তবে শব্দাদি আর প্রমাণ হয় কিরূপে। প্রথমত, শব্দ, উপমান, ইত্যাদি সকলে স্বীকার করেন না; দ্বিতীয়ত,

ইহাদিগকে সহজেই অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সেই অনুমানই যদি না টিকিল, তবে শব্দাদিকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করার পক্ষে আর কী যুক্তি আছে। সুতরাং প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ; সত্য জানিবার আর কোনো উপায় নাই। আর, প্রত্যক্ষে যাহা আসে না, তাহা সত্য নয়। ধূমাদি হইতে অগ্নির জ্ঞান যে মধ্যে মধ্যে হয়, তাহা হয় ভুল, নয় তো প্রত্যক্ষ জাত।

প্রমাণ সম্বন্ধে যাঁহার এই মত, প্রমেয় সম্বন্ধে তাঁহার মত কী। জগৎ একটা অবশ্যই আছে। কিন্তু তাহাতে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ আবিষ্কারের চেষ্টা বৃথা; কোনো নির্দিষ্ট নিয়মের কথাও উঠিতে পারে না। অগ্নি উষ্ণ, জল শীতল, বায়ু সুখস্পর্শ—এইসব বিচিত্রতার কারণ অন্বেষণ বৃথা; 'স্বভাব' হইতেই, আপনা হইতেই এইসব হয়। পৃথিবী, জল, তেজ ও মরুৎ— এই চারিটি ভূত; ইহারাই তত্ত্ব। ইহাদের সংমিশ্রণে দেহ উৎপন্ন হয়; আর, সেই সঙ্গে, মদ্যের উপাদান হইতে যেমন মাদক শক্তি উপজাত হয়, তেমনই দেহে চৈতন্যেরও সঞ্চার হয়।

চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। দেহাতিরিক্ত আত্মার কোনো প্রমাণ নাই। লোকে অনেক সময় 'আমার দেহ' এরূপ কথা বলে বটে, কিন্তু তাহাতে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বুঝায় না। 'রাহুর মাথা' এরূপ কথাও তো লোকে বলে; অথচ, 'রাহু' তো একটি মাথা ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্য দিকে, আমি কালো, আমি কৃশ, এই সব কথাও তো লোকে বলে এবং ভাবে; তাহা হইতেই প্রমাণ হয় দেহ আর আত্মা এক।

পরমেশ্বর? লোকসিদ্ধ রাজাই পরমেশ্বর। তিনি তুষ্ট থাকিলেই যথেষ্ট।

এই ঈশ্বর-শাসিত জগতে মানুষের সুখ ছাড়া আর কিছু ভাবিবার

নাই। ইহাই পুরুষার্থ। যতদিন বাঁচিবে সুখে থাকিতে চেষ্টা করিবে; প্রয়োজন হইলে ঋণ করিয়াও ঘি খাইবে। ভোগের উপাদান ও উপায় যত আছে, ব্যবহার' করিবে। হইতে পারে, কোনো স্থানে সুখের সঙ্গে দুঃখের সম্ভাবনা মিশ্রিত আছে; কিন্তু মাছে কাঁটা আছে বলিয়া কি মাছ খাইবে না। কাঁটা বাদ দিয়া খাইবে, এই মাত্র। চোরে লইয়া যাইতে পারে, এই ভয়ে কি বিত্ত সঞ্চয় করিবে না। বাড়িতে অতিথি আসিতে পারে, এই ভয়ে কি ভালো খাইবে না।

অপবর্গ, পরলোক, ইত্যাদি বড়ো বড়ো কথা ছাড়িয়া দেওয়াই ভালো। এই সকলের প্রত্যক্ষ জ্ঞান কাহারও নাই। বেদ বলে? বেদে ধূর্তত্বের অন্ত নাই। কর্মকাণ্ড জ্ঞান-কাণ্ডের নিন্দা আর জ্ঞান-কাণ্ড কর্মের নিন্দা করে; কাহাকে বিশ্বাস করিবে। ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর এই তিন শ্রেণীর লোক মিলিয়া বেদ সৃষ্টি করিয়াছে; ইহাতে প্রতারণা আর পশুবলিই প্রধান। যজ্ঞে নিহত পশু স্বর্গে যায়, এই একটা ভান আছে। যদি সত্যই লোকে ইহা বিশ্বাস করিত, তবে যজমান নিজের পিতাকে সেখানে হত্যা করে না কেন। কত সহজে বাপকে স্বর্গে পাঠানো হইত। মৃতের শ্রাদ্ধে যদি তৃপ্তি হয়, তবে নির্বাণ দীপে তৈল দিলে উহা জ্বলে না কেন। বিদেশে যে যায়, বাড়িতে তাহার পিণ্ড দিলে তাহার তৃপ্তি হইবে না কেন। ওপারের লোক যদি এপারের দেওয়া খাবার খাইতে পারে, তবে দোতালার লোককে একতালায় ভাত বাড়িয়া দিলে চলিবে না কেন। বেদের এই সব ধর্মব্যবস্থা বুদ্ধি-পৌরুষ-হীন ব্রাহ্মণেরা লোক ঠকাইয়া নিজেদের জীবিকা উপার্জনের জন্য করিয়াছে। দেহের সঙ্গেই সব শেষ; মৃত্যুর পর আর কিছু নাই। সুতরাং মানুষের একমাত্র কর্তব্য জীবনটা সুখে কাটাইয়া দেওয়া।

এই হইল চার্বাকের সাধারণ মত। কিন্তু বেদের উপর আক্রমণই তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই আক্রমণ দার্শনিকের গুরু-গম্ভীর ভাষা এবং বিচারকের নিরপেক্ষ ভাব কখনও রক্ষা করে নাই। বেদের ভাষা দুর্বোধ—জর্ভরী তুর্ফারী ইত্যাদি অর্থহীন প্রলাপ। বেদের কর্তারা সব ভণ্ড এবং মাংসলোলুপ নিশাচর। বেদের সাহায্যে পৌরুষহীন কপট লোকেরা কোনোরকমে নিজেদের জীবিকা উপার্জন করে। অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্লীল আচার আছে ও অশ্লীল ভাষা ব্যবহৃত হয়; এবং ইহাই বৈদিক ক্রিয়ার একটা বড়ো নমুনা। এই রকম নানা কটূক্তি বেদের সম্বন্ধে চার্বাক করিয়াছেন।

অশ্বমেধের যে আচারের বিরুদ্ধে চার্বাক বক্রোক্তি করিয়াছেন তাহার বর্ণনা আছে শুক্ল-যজুর্বেদের ২৩ শ অধ্যায়ে। আর সেখানে রাজার মহিষী, অধ্বর্যু, উদ্‌গাতা, ব্রহ্মা, হোতা প্রভৃতি কথোপকথনচ্ছলে যেসব মন্ত্র বিচারণ করিবেন, তাহাও দেওয়া আছে। ইহাকে ভদ্র সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করাই কঠিন, ধর্মসাহিত্যের কথা তো পরে। কাজেই চার্বাকের এই আক্রমণের বিশেষ কোনো জবাবের চেষ্টা হয় নাই। পরবর্তী কেহ কেহ যেমন যজুর্বেদের ভাষ্যকার মহীধর, বলিয়াছেন যে এই সব 'অশ্লীল-ভাষণ' অশ্বের সংস্কারের জন্য করা হইত।

ব্যাপারটা যে একটু অশ্লীল তাহা গোপন করার চেষ্টা হয় নাই। তবে, আচার তো আচারই। এইটি ছাড়া, চার্বাকের বাকি সমস্ত আক্রমণের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। অবশ্যই, ভণ্ড ধূর্ত ইত্যাদি যেসব গালিগালাজ চার্বাক করিয়াছেন সে সবের উত্তর দিতে গেলে গালিমন্দই বলিতে হয়; উহা দর্শন নয়। আর পশুবধ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ধর্মেরে অঙ্গ, দর্শনের নয়, ইহাদের পক্ষে যাহা বলিবার আছে তাহা মীমাংসা, স্মৃতি ইত্যাদিতে পাওয়া যাইবে। বেদের ভাষার দুর্বোধ্যতা

মন্ত্রের নিকট তো থাকিবেই। জর্ভরী, তুর্ফারী ইত্যাদি শব্দ বেদমন্ত্রে আছে ঠিক কিন্তু ইহাদের অর্থও আছে। যে যে-ভাষা জানে না, তাহার সেই ভাষাকে অর্থহীন বলিবার কী অধিকার আছে। বেদের ভাষার উপর আক্রমণ করিয়া চার্বাক তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানের অভাবই প্রকাশ করিতেছেন। আর-একটা কথা বলা দরকার যে, বেদ অপৌরুষেয় —উহার কোনো স্রষ্টা নাই; শ্রদ্ধার সহিত কষ্ট স্বীকার করিয়া ইহার অর্থ আবিষ্কার করা উচিত। বিশ্বাসীরা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নানাভাবে প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বেদকে আক্রমণ করিলেই দার্শনিক হওয়া যায় না। প্রমাণ ও প্রমেয়ের কথা যাহা বলিয়াছেন তাহাতে চার্বাকের কৃতিত্ব কী। অপ্রত্যক্ষ জিনিস নাই এই কথা সত্য হইলে চার্বাক চোখের আড়াল হইলেই তো তাঁহার স্ত্রীর বিধবা হওয়া উচিত। আর দীর্ঘকাল বিদেশে বাস করিয়া গৃহে ফিরিয়া চার্বাক যদি দেখেন যে, তাঁহার স্ত্রী গর্ভিণী তাহা হইলেও স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করিবার কোনো অধিকার তাঁহার থাকিবে না; কেননা, প্রত্যক্ষত তেমন কিছু পাইবেন না, আর অনুমান তো তাঁহার প্রমাণ নয়। দার্শনিকরাও উপহাস করিতে জানেন। এই সব উপহাস করিয়া সমালোচকেরা চার্বাকের প্রত্যক্ষবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

প্রমেয় সম্বন্ধেও তাঁহার উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। জগতের উপাদান পঞ্চভূতের মধ্যে তিনি একটি অর্থাৎ ব্যোম বাদ দিয়াছেন। ব্যোম কি নাই। তাহা ছাড়া দেহই আত্মা আর রাজাই পরমেশ্বর, এই সব উক্তি এত বালকসুলভ যে, ইহাদের উত্তরের চেষ্টা করিলেও ইহাদিগকে সম্মান করা হয়। চার্বাকের প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে আর-একবার ভারত শুনিয়াছিল—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"। কিন্তু সেখানে

'জগদীশ্বর' শব্দের দুইটি অর্থ সম্ভব; জগৎস্রষ্টা আর জগতের সম্রাট; যাঁহারা উক্তিটি প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহারা বাদশাহকে খুশী করিতে চাহিয়াছিলেন ঠিকই, তবে, হয়তো দ্বিতীয় অর্থ মনে রাখিয়া।

দর্শন হিসাবে—মানুষের জিজ্ঞাসার উত্তর হিসাবে চার্বাকের দর্শনের খুব দাম নাই। কিন্তু ভোগাসক্ত মন ইহার ভিতর লালসা চরিতার্থ করিবার পক্ষে একটা যুক্তি পাইয়াছিল। সেইজন্যই ইহা লোকপ্রিয় হইয়া থাকিবে। ধর্ম ও নীতির শাসনের কঠোরতার বিরুদ্ধে মানুষের মন যখন বিদ্রোহী হয়, তখন জলে নিমজ্জমান মানুষ যেমন তৃণ ধরিয়াও ভাসিতে চায়, তেমনই এই প্রকার যুক্তির আশ্রয় লইয়াও নিজের বিদ্রোহকে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা দিতে চায়। এইরূপ ব্যাপার ইতিহাসের পৃষ্ঠায়—শুধু ভারতের নয়, জগতের ইতিহাসে—অনেক দেখা যায়। সেই হিসাবে চার্বাক ঐ শ্রেণীর বিদ্রোহের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু দর্শন হিসাবে তাঁহার মতে কোনো বৈচিত্র্য নাই। ইহার শাখাপ্রশাখা হয় নাই; পুনরাবৃত্তি হইয়াছে, তর্কে পরাজিত হইয়াও আবার মাথা তুলিয়াছে; এখনও এমন লোক আছে যাহাদের নিকট এই দর্শন মনোরম। প্রাচীন গ্রীসে ও ইপিকিউরস্ (Epicurus) প্রভৃতির মুখ হইতে এই ধরনের কথা জগৎ শুনিয়াছে। কিন্তু এই ধরনের দর্শনের ভিতর হ্রাস বৃদ্ধি নাই—পুষ্টি ও ক্ষয় নাই—গতি নাই—বিচিত্রতা নাই, সুতরাং ইহার কোনো ইতিহাস নাই। প্ল্যাটোর কিংবা কাণ্টের কিংবা বেদান্ত দর্শনের যেমন শাখাপ্রশাখায় বিস্তীর্ণ, নূতন নূতন ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ একটা দীর্ঘ, বৈচিত্র্যময় ইতিহাস পাওয়া যায় এবং একটা প্রবীণ সাহিত্য আছে, চার্বাক দর্শনের তাহা নাই—হইতেও পারে না। শুধু সময়ে অসময়ে নীতি ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মন ইহার পুনরাবৃত্তি করিয়াছে, এই মাত্র।

২. জৈন-দর্শন

আমরা পূর্বেও বলিয়াছি, আবারও বলি, দর্শনগুলি বৃক্ষের মতো ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। বৃক্ষ যেমন ভূমি হইতে, বায়ু হইতে, সূর্যের কিরণ হইতে উপাদান আহরণ করিয়া বৃদ্ধি পায়, দর্শনও ঠিক তেমনই নানা দিক্ হইতে নানাভাবে পুষ্টির উপকরণ সংগ্রহ করিয়া পরিণত আকার ধারণ করে। বৃক্ষের মৃদু ও সূক্ষ্ম ক্রমপরিণতি ভাবিতে আনন্দ আছে, অনুবীক্ষণের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক তাহা জানিতেও চান। দর্শনেরও তেমনই পরিণতির মৃদু মন্থর ও সূক্ষ্ম গতির ইতিহাস আলোচনায় আনন্দ আছে। কিন্তু তাহার জন্য যে ধৈর্যের প্রয়োজন তাহা হয়তো আমাদের সকলের নাই। তাহা ছাড়া, আমাদের অল্প পরিসরের মধ্যে আমরা এই দীর্ঘ বৃত্তান্তের স্থানও করিতে পারিব না। সুতরাং আমরা শুধু পরিণত বস্তুটির বিবরণ ও বর্ণনা দিতেই চেষ্টা করিব। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, একটি সন্দেশের মধ্যে যেমন বহু শত লোকের পরিশ্রম পুঞ্জীকৃত—লাঙলের নির্মাতা, ইক্ষুর চাষী, চিনির কলের মজদুর ইত্যাদি এবং গোয়ালা, হালুইকর প্রভৃতি বহু লোকের সমবেত পরিশ্রম হইতে যেমন একটি সন্দেশ উৎপন্ন হয়,—দর্শনও তেমনই বহু লোকের পুঞ্জীভূত পরিশ্রমের ফল। সন্দেশের বেলায় যেমন আমরা ময়রার নাম লইয়াই ইতিহাস শেষ করি, বাকি সব উহ্য থাকে, দর্শনের বেলায়ও তেমনই প্রধানদের নামই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পক্ষে যথেষ্ট। শুধু জৈন-দর্শনের বেলায় নয়, অন্য সমস্ত দর্শনের বেলায়ও এই কথাটা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত হইবে।

এখানে আমরা জৈন দর্শনকে বৌদ্ধ দর্শনের আগে স্থান দিতেছি। আস্তিক দর্শনের নিকট পরাজয়ের ক্রমঅনুসারে ইহার স্থান পরে হওয়া

উচিত। কারণ, জৈনধর্ম ও জৈনদর্শন এখনও ভারতে বর্তমান আছে; ভারতের বাইরে উহারা কোথাও নাই; কিন্তু ভারত হইতে তাহাদিগকে নির্বাসিত করাও সম্ভব হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন এখন প্রায় অভারতীয় হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ উভয়ের বেদবিশ্বাসী হিন্দুর প্রতি ব্যবহার পৃথক্ ধরনের ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ উভয়ই হিন্দুমতে নাস্তিক; কিন্তু উভয়ের সঙ্গে হিন্দুর ধর্ম ও দর্শনের সংগ্রাম সমান তীব্র হয় নাই। আর, জৈন-মতও হিন্দু-মতের উপর আক্রমণ কম করিয়াছে। হিন্দুর বর্ণাশ্রম সে মানিয়াছে; হিন্দুর দেবতাদের অনেককেও সে গ্রহণ করিয়াছে, এবং হিন্দুর আচারনিয়মও অনেক রক্ষা করিয়াছে। সেইজন্য উভয়েই প্রাচীন কলহ বিস্মৃত হইয়া— জেতা-পরাজিত শত্রুর মধ্যেও যেমন মৈত্রী সম্ভব হয় সেইভাবে পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করিয়া—ভদ্র প্রতিবেশীর মতো বাস করিতেছে। কিন্তু বৌদ্ধমতের সঙ্গে হিন্দুর সংগ্রাম তীব্রতর হইয়াছিল। পরে যদিও বৈষ্ণবেরা বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তথাপি সকলে তাহা মানে নাই; আর, বৌদ্ধদের দিক্ হইতে তেমন কোনো আপসের চেষ্টা—একটা সমন্বয়ের চেষ্টাও হয় নাই। ফলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে; ভারতে বুদ্ধের স্মৃতিমাত্র রহিয়াছে।

আমরা এখানে জৈন দর্শন আগে লইতেছি, তাহার কারণ ইতিহাসে উহার স্থান আগে। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক ও দার্শনিক অনেকেরই আবির্ভাবকাল আমাদের জানা নাই। কিন্তু মহাবীর বুদ্ধের পূর্ববর্তী ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। উভয়ত্রই দর্শন ধর্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং সন তারিখের খুব সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া জৈন দর্শনের আলোচনা আগে করা চলে।

কিন্তু মাধবাচার্য তাঁহার সর্বদর্শন-সংগ্রহে জৈনদর্শনের আলোচনা

আরম্ভ করিয়াছেন এইভাবে—"মুক্ত-কচ্ছদের (অর্থাৎ বৌদ্ধদের) এই সব মত সহ্য করিতে না পারিয়া বিবসনেরা (অর্থাৎ দিগম্বর জৈনেরা) কোনোরকমে স্থায়িত্ব লাভ করিয়া তাহাদের ক্ষণিকত্ব বাদ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছে ইত্যাদি। বলার ভঙ্গি হইতে মনে হইতে পারে যে বৌদ্ধদের মতটাই আগে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু মাধবাচার্যের ইতিহাস-জ্ঞানের উপর খুব বেশী নির্ভর করা চলে না। তিনি তাঁহার বিবরণে শঙ্কর দর্শন সকলের পর বিবৃত করিয়াছেন—রামানুজেরও পরে। শঙ্কর দর্শনের মূল্য বেশী হইতে পারে; কিন্তু উঁহার আবির্ভাব হইয়াছে রামানুজের পূর্বে। কাজেই মাধবাচার্যকে আশ্রয় করিয়া ঐতিহাসিক ক্রম নির্ধারণ করা চলে না। অবশ্যই বৌদ্ধদের মত জৈন পণ্ডিতেরা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—যেমন, হেমচন্দ্র, অগ্নিবেশ প্রভৃতি। বৌদ্ধেরাও পরমত খণ্ডনের চেষ্টা ততটা না করিলেও করিয়াছেন, যেমন, ন্যায়বিন্দু প্রণেতা ধর্মকীর্তি, উঁহার টীকাকার ধর্মোত্তর প্রভৃতি। এইরূপ পরমত খণ্ডনের চেষ্টা কমবেশি অন্যত্রও আছে, যেমন বেদান্তে। কিন্তু এসব তো অনেক পরবর্তী কালের কলহের কথা—গোড়ার কথা নয়। ইহা দ্বারা মূল দর্শন সমূহের কালিক ক্রম নির্ধারণ করা কঠিন। মহাবীর বুদ্ধের আগে—জৈন ধর্মের আবির্ভাব ও প্রচারও বৌদ্ধ ধর্মের আগে। সেই হিসাবে জৈনধর্মকেও বৌদ্ধ ধর্মের আগে লওয়াই উচিত। এখানে আমরা আমাদের গৃহীত জয়-পরাজয়ের ক্রম অতিক্রম করিতেছি; তাহার কারণ, এখানে ইতিহাসের সংবাদ স্পষ্ট জানি; আর, বৌদ্ধ দর্শনের বিস্তৃতি এবং পূর্ণতা জৈন দর্শন হইতে বেশী বলিয়াও জৈনদের দর্শনের কথা আগে তুলিতে হয়। অধিকন্তু, জৈনদের মতে, বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন জৈন মত হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে;—বৌদ্ধেরা জৈনদেরই একটা

উপশাখা— কোনো বিদ্রোহী সম্প্রদায়। সে কারণেও জৈনদের কথা আগে ভাবিতে হয়।

জৈনদের ধর্ম ও দর্শন

জৈন দর্শন জৈন ধর্মের পরিপূরকরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা আমরা সাধারণত মহাবীরকেই মনে করিয়া থাকি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মহাবীরের পূর্বে আরও অনেক ধর্মপ্রবর্তক এই ধর্মই জগৎকে দান করিয়া গিয়াছেন, জৈনরা তাহা বিশ্বাস করেন। ইঁহাদিগকে তীর্থংকর বলা হয়। ইঁহাদের মধ্যে পার্শ্বনাথ বেশী প্রসিদ্ধ। তাঁহার নির্বাণ-স্থান বলিয়া বাংলার পশ্চিম সীমান্তে একটি পাহাড়েরও ঐ নাম হইয়াছে। কিন্তু পার্শ্বনাথের শিক্ষার লিখিত বিবরণ বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। সুতরাং ধর্মটাকে অনাদি মনে না করিয়া মহাবীর হইতেই উহা আরম্ভ হইয়াছে, এরূপ মনে করিলে ইতিহাসের দিক দিয়া কোনো ত্রুটি হয় না। অবশ্যই সব সময় একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে অকৃষ্ট ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন শস্য হয় না, তেমনই দেশ কোনো ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত না হইলে সে ধর্মের প্রচার হয় না। এই প্রস্তুতির জন্য প্রবর্তকের পুরোগামীদের নিকট দেশ ঋণী থাকে। খ্রীষ্টের আগে যেমন 'জন' (John) আসিয়া ছিলেন তেমনই মহাবীরের পূর্বেও অনেক আচার্য ঐ ধরনের কথা দেশকে শুনাইয়া ছিলেন নিশ্চয়ই। তথাপি খ্রীষ্টধর্ম যেমন খ্রীষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়াই ইতিহাস বলে, তেমনই মহাবীরকে জৈন ধর্মের প্রবর্তক বলা অসংগত নয়।

মহাবীরের জন্ম খৃঃ পূঃ ৫৯৯ অব্দে হয়, ইহাই সাধারণত গৃহীত

মত। মহাপুরুষদের জন্ম সম্বন্ধে ভক্তি ও নিরঙ্কুশ কল্পনা মিলিয়া যেসব আখ্যায়িকা অন্যত্র রচনা করিয়াছে, মহাবীরের বেলায়ও সে সকলের অভাব নাই। মহাবীর ব্রাহ্মণীর গর্ভে উদ্ভূত হইয়া পরে ক্ষত্রিয়া জননীর গর্ভ হইতে প্রসূত হইয়াছিলেন, এরূপ কথিত আছে। তাঁহার ক্ষত্রিয়া জননী তাঁহার জন্মের পূর্বে কীকী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং সেগুলির কী অর্থ, ইত্যাদি অনেক কথা জৈন শাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই সব কাহিনী ভক্তমণ্ডলে এবং কথকতার আসরে নয়নবারির উৎস খুলিয়া দিতে পারে, কিন্তু ইতিহাস নয়; সুতরাং আমরা উপেক্ষা করিতে পারি। তাহার পর মহাবীরের জীবনের যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা জানা গিয়াছে, তাহাও আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের জন্য প্রয়োজন নয়; সুতরাং সেসবও এখানে অনুক্ত থাকিবে। বড়ো ঘটনা হইতেছে এই যে, প্রচারের ফলে বহুলোকে তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। প্রথমত বিহারে—বর্তমান পাটনার চারিদিকে এই ধর্ম প্রচারিত হয় এবং বিস্তৃতি লাভ করে। তাহার পর, দাক্ষিণাত্যে মহীশূরে ইহার একটা শাখা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এক সময়ে মথুরাও একটা বড়ো কেন্দ্র হয়। বর্তমানে জৈনদের সংখ্যা গুজরাটেই বেশী। কিন্তু মোটের উপর ভারতে ইহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়; কয়েক লক্ষ মাত্র হইবে।

জৈনদের সংখ্যা যাহাই হউক না কেন, তাহাদের ধর্মের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যাঁহা সত্যসত্যই আদরের যোগ্য। প্রকৃতপক্ষে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম সাধারণত গৃহীত অর্থে ধর্ম নয়; কারণ, জগৎস্রষ্টা, জগৎপাতা, পাপীর শাস্তা ও ত্রাতা করুণাময়। প্রার্থনায় দ্রবচিত্ত ঈশ্বরই সেখানে কেন্দ্র নয়। এই অর্থে হিন্দু ধর্মও ধর্ম নয়। ঠিক এই অর্থে ধর্ম, ইহুদি, খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের ধর্ম। জৈন ও বৌদ্ধরা ঈশ্বর

মানে নাই ; তাহাদের দর্শনেও ঈশ্বর নাই। হিন্দুর দর্শনেও সকলে ঈশ্বর স্বীকার করে ; যাহারা করিয়াছে, তাহাদের ঈশ্বরও ঠিক খ্রীষ্ট কিংবা মুহম্মদের ঈশ্বরের মতো নয়। কিন্তু ধর্ম কথাটার প্রাচীন ভারতীয় অর্থে জৈনদের ধর্মও ধর্ম। ইহাতে ঈশ্বর নাই— শাসক ও তারক কোনো একজন নাই, ঠিক ; কিন্তু ইহাতে চারিত্র আছে, সংযম আছে, পাপ পুণ্য বোধ আছে, এক ভগবানে বিশ্বাস ছাড়া ধর্মের আর যাহা অঙ্গ, সে সমস্তই আছে। ভগবানের কাছে কান্নাকাটি করিয়া কৃত পাপের মার্জনা চাওয়া এবং নানাবিধ বিশেষণ দ্বারা তাঁহার সুখ্যাতি কীর্তন করা, জৈন ধর্মে নাই। কিন্তু ভোগ দ্বারা পাপের ক্ষয় এবং নিজের কৃত কর্মদ্বারা পুণ্য অর্জন করিবার উপদেশ আছে ; নিজের ভবিষ্যৎ নিজে গঠন করিবার আজ্ঞা আছে। সে হিসাবে ইহাকে ধর্ম না বলিয়া চারিত্র-নীতি বলিলে পাশ্চাত্ত্য পরিভাষা অনুসারে হয়তো ভালো হয় তাহাতে আপত্তি করিবারও কিছু নাই। তবে ভারতে উহা ধর্ম বলিয়াই কথিত হইয়া আসিতেছে।

কর্ম ও জন্মান্তর

নামের তর্ক ছাড়িয়া দিয়া জৈনদের বিশ্বাসের মধ্যে যাহা মূল কথা তাহার কথঞ্চিৎ উল্লেখ না করিলে তাহাদের দর্শন বুঝিতে আমাদের অসুবিধা হইবে। প্রথমত, কর্ম ও জন্মান্তর বাদ জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু— সমগ্র ভারতীয় চিন্তার মধ্যে এমনভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে যে, ইহার কথা না বলিলেই নয়। ইহা কাহার সম্পত্তি জোর করিয়া বলা কঠিন। ইহা সাধারণ— প্রাকৃত জনের— বিশ্বাস, না, দার্শনিক চিন্তার আবিষ্কৃত ফল, তাহা লইয়াও তর্ক করা চলে। এই দেহে জাত হইবার পূর্বে আমি আরও অনেক দেহে বাস করিয়া

আসিয়াছি, এ কথা গীতায় কৃষ্ণ বলিয়াছেন। তিনি সেইসব জন্ম মনে করিতে পারিতেন; অর্জুন পারেন নাই, আমরাও পারি না। যাঁহারা যোগশক্তি কিংবা তপঃশক্তির প্রভাবে তাহা পারেন, তাঁহাদিগকে 'জাতি-স্মর' বলা হয়। জৈনদের তীর্থংকরদের সেই শক্তি ছিল, বুদ্ধের নিজের পূর্বজন্মসকলের বৃত্তান্ত 'জাতক' গ্রন্থে সংগৃহীত আছে। কিন্তু কেহ মনে করিতে পারুক বা না পারুক, জন্ম ইহার পূর্বেও সকলেরই আরও হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইতে পারে। ইহারই নাম জন্মান্তরবাদ। আর এই সব জন্ম হয় কর্ম অনুসারে। ইহার নাম কর্মবাদ। কিন্তু এ সব কি শুধু বিশ্বাসের কথা, না, প্রমাণও কিছু আছে? বিশ্বাসটি যে ভারতের চিন্তায় বর্তমান তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু প্রমাণ কী। একটা প্রমাণ এই দেওয়া হয় যে, মানুষের মানুষে যেসকল প্রভেদ আছে— দেহে, মনে, ভাগ্যে— তাহার একটা সহজ ব্যাখ্যা প্রাক্তন কর্মে বিশ্বাস করিলে পাওয়া যায়। একই পিতামাতার একই গৃহে জাত সন্তানদের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহারও কারণ প্রাক্তন কর্ম হইতে পারে। সুতরাং প্রাক্তন কর্ম মানিলে কয়েকটা প্রশ্নের সহজ উত্তর পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতেই জিনিসটা প্রমাণিত হয় না। সর্বরঞ্জন চুরি করিয়াছে মনে করিলে আমার বাড়ির চুরির একটা ব্যাখ্যা হইয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতেই সর্বরঞ্জন যে চোর, তাহা প্রমাণিত হয় না। প্রমাণিত হউক বা অপ্রমাণিতই থাকুক, কর্ম ও জন্মান্তর যে ভারতে প্রবলভাবে বিশ্বসিত ইহা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। জৈনদেরও ইহা একটি প্রধান বিশ্বাস।

অহিংসা

অহিংসা জৈন ধর্মের আর-একটি বৈশিষ্ট্য। অহিংসা পরম ধর্ম, এই কথা বৌদ্ধদের অপেক্ষা বেশী সূক্ষ্ম এবং বিস্তৃত অর্থে গ্রহণ করিয়াছে জৈনরা। বেদের পশুবধের বিরুদ্ধে উভয়ের প্রতিবাদ সমান। সকল প্রকার জীবহত্যার নিন্দা ইহারা দুই-ই করিয়াছে। কিন্তু কোনো প্রকারে —পরোক্ষে অপরোক্ষে জীবহত্যার নিমিত্ত হওয়াও যে অধর্ম, এই কথা জৈনরা ঢের বেশী জোর দিয়া বলিয়াছে। জীবহত্যা নিষিদ্ধ হইলেও অন্য কর্তৃক হত জীব ভক্ষণ করা দোষের নাও হইতে পারে। জীব হত্যা করিয়ো না আর মাংস খাইয়ো না, দুইটি নিষেধ ঠিক একার্থ বুঝায় না। ভারতের বাহিরে—ব্রহ্মে, চীনে, তিব্বতে— বৌদ্ধ ধর্ম এইভাবে জীব হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াও মৎস মাংস ভক্ষণে তেমন বাধা দেয় নাই। কিন্তু জৈনরা জীবহত্যাকে এত বড়ো পাপ মনে করে যে গৌণভাবে এই হত্যার কারণ হওয়াকে তাহারা পাপ বলিয়াছে। যে হত্যা করে সে তো পাপ করেই, যাহার জন্য হত্যা করা হয় সেও পাপী, ইহাই জৈনদের ধর্ম। রাত্রে না খাওয়া, জল কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া খাওয়া, মুখ কাপড় দিয়া ঢাকিয়া কথা বলা ইত্যাদি অনেক আচার যে জৈন সন্ন্যাসী ও গৃহস্থদের ভিতর দেখা যায় তাহাও অনিচ্ছাকৃত জীবহত্যা নিবারণ করার জন্যই। মশা, ছারপোকা মারা পর্যন্ত জৈনদের মতে নিন্দনীয় কাজ। অহিংসার এত বিস্তৃত অর্থ পৃথিবীর আর কোনো ধর্মই গ্রহণ করে নাই। সাধারণভাবে জীবে দয়া পুণ্য বলিয়া ঘোষিত হইলেও দৃশ্য অদৃশ্য কীটাণু বধ করাও যে হিংসা এবং পাপ এই কথা পৃথিবীতে স্পষ্টত এক জৈনরাই বলিয়াছে।

রুগ্নজীবের রক্ষা ও পরিচর্যার জন্য 'পিঁজরাপোল' জৈনরাই নির্মাণ

করে, আর মশা, মাছি প্রভৃতির জন্য আহার সংগ্রহ করিয়া দেওয়াও যে পুণ্য এই কথাও জৈনরাই বলিতে সাহস পাইয়াছে। মানুষের রক্ত দিয়া ছারপোকা পোষণ করা পুণ্য কিনা, সে বিষয়ে তর্ক করা সহজ; কিন্তু ছারপোকার মতো আপাতঘৃণ্য জীবও যে রক্ষণীয়—অবধ্য—এই কথা পৃথিবীতে জৈন ছাড়া আর কেহ বলিতে সাহস পায় নাই।

এই অহিংসা ব্রতের জন্য কতকগুলি ফল ও উদ্ভিদ্ পর্যন্ত জৈনরা অভক্ষ্য মনে করে; কারণ, তাহাতেও জীব আছে, এই তাহাদের বিশ্বাস। কাঁচা ফল, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি এই কারণে অনেক জৈন ভক্ষণ করে না। পাকাফলের অপেক্ষা শুষ্ক ফল খাওয়া ভালো, কারণ, পাকাফলেও জীব অনেক থাকে। জীব সর্বত্রই আছে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা সর্বত্র সমান নয় এবং সকলেই মানুষের দ্বারা ভক্ষিত হইয়া সমান কষ্ট পায় না, এই যুক্তি অনুসারে জৈনশাস্ত্রে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিভেদ করা হইয়াছে।

অন্যান্য ধর্ম

শম-দমাদির প্রশংসা হিন্দুধর্মে যেমন আছে, জৈনধর্মে তাহা অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নয়। সত্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ প্রভৃতির প্রশংসা জৈনরাও যথেষ্ট করিয়াছে; শুধু তাই নয়, গৃহী অ-গৃহীর জীবনের ব্রত হিসাবে এই সমস্ত অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছে। যতি-ধর্মের প্রতি জৈনদের শ্রদ্ধা গভীর এবং তাহাদের ব্রতাদি আরও কঠোর।

ত্যাগ

জৈনরা সংখ্যায় কম হইলেও তাহাদের মধ্যে বহু ধনী আছে। ব্যবসায়ে বর্তমান ভারতে জৈনদের স্থান অত্যন্ত বড়ো। ব্যবসায়ে এবং বাণিজ্যে তাহারা তাহাদের এই উচ্চনীতি কতট রক্ষা করিতে পারে

তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন। সকল ধর্মেই আদর্শচ্যুত লোকের সংখ্যা প্রচুর। আদর্শচ্যুত ব্যক্তিদের আচরণ দ্বারা ধর্মের আদর্শের বিচার চলে না। জৈনধর্মের আদর্শ যে মহান্, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সঞ্চিত ধনের অধিকারী তাহাদের মধ্যে অনেক থাকিলেও ত্যাগ তাহাদের ধর্মের শিক্ষায় অতি বড়ো জিনিস; এবং সন্ন্যাস অপেক্ষা বড়ো জিনিস তাহাদের মতে কিছু নাই। আহার ত্যাগ করিয়া মৃত্যু বরণ পর্যন্ত যাহারা প্রশংসা করিয়াছে, তাহারা ধনের লোভকে প্রশ্রয় দেয় নাই। লোভ মানুষের মন হইতে দূর করিতে কোনো ধর্মই পারে নাই, সুতরাং জৈনধর্মের সেখানে ব্যর্থতা অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মতো কিছু নয়।

শাখা-ভেদ : শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর

জৈন সাধুদের ত্যাগের প্রশ্নটা মহাবীরের তিরোধানের অল্প পরই গুরুতর আকার ধারণ করে। সন্ন্যাসী সব ত্যাগ করিবে; সুতরাং কোনো প্রকার বস্ত্র রাখিতে পারিবে কিনা, ইহাই হয় তখন প্রশ্ন। এক শ্রেণীর জৈনরা সমস্ত প্রকার বস্ত্র—কৌপীন পর্যন্ত—ত্যাগ করিয়া একেবারে দিগম্বর থাকাই শ্রেয় মনে করিতে থাকেন। আর এক শ্রেণী সামান্য শ্বেত বস্ত্র পরিধান বিহিত মনে করেন। কোন্‌টি ঠিক শাস্ত্রবিহিত—মহাবীরের ঈপ্সিত—এই প্রশ্নের কোনো সর্ববাদিসম্মত মীমাংসা না হইয়া দুইটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। বেদের বিভিন্ন শাখায় যেমন মন্ত্রভেদ ও প্রয়োগভেদ দৃষ্ট হয়, তেমনই ইহাদের মধ্যেও শাস্ত্রের পাঠ, প্রক্রম, আচার ও নিয়ম ইত্যাদিতে কতকগুলি পার্থক্য আছে। মধ্যে মধ্যে আচার্যদের নামও ইহারা ভিন্নভাবে গ্রহণ করিয়াছে; যথা, 'তত্ত্বার্থাধিগম সূত্র' নামক গ্রন্থের

প্রণেতাকে দিগম্বরেরা বলে 'উমা স্বামি,' আর শ্বেতাম্বরদের মতে তাঁহার নাম 'উমাস্বাতি'।

দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর এই দুইটি প্রধান শাখা ছাড়া জৈনদের মধ্যে আরও সম্প্রদায়-ভেদ আছে। মূল ধর্ম বুঝিবার জন্য সে সকলের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; দর্শনেও তাহাদের অস্তিত্ব উল্লেখযোগ্য কোনো মতভেদ সৃষ্টি করে নাই। ইহাদের ধর্মের চরম তত্ত্ব উমাস্বাতির গ্রন্থের প্রথম সূত্রেই রহিয়াছে— "সম্যগ্ দর্শন-জ্ঞান-চারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ"; সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান এবং সম্যক্ চারিত্র—এই তিনটি মোক্ষলাভের পথ। এখানে 'দর্শন' মানে জ্ঞান নয়, বিশ্বাস,—তত্ত্বদৃষ্টি-জনিত ধ্রুব বিশ্বাস—তত্ত্বার্থে শ্রদ্ধা;—'তত্ত্বার্থশ্রদ্ধানং সম্যগ্-দর্শনং'। জ্ঞান কথার অর্থ স্পষ্ট। 'চারিত্র' বলিতে কী কী গুণ ও কর্ম বুঝায় তাহার কতক আভাস আমরা এইমাত্র পাইলাম। এই তিনটির একত্রে নাম "রত্ন-ত্রয়"।

জৈনদের মন্দির আছে, তীর্থংকরদের মূর্তি-পূজা আছে। ক্রিয়াকর্মে হিন্দু-দেবতা গণেশের পূজাও হয়। হিন্দুদের মতো তাহাদের তীর্থযাত্রাও আছে। জাতকর্ম, চূড়াকরণ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি হিন্দুর দশকর্মের মতো আচারও অনেকগুলি পরিবর্তিত আকারে তাহাদের মধ্যে আছে। বিবাহের আচারেও অনেক সাদৃশ্য আছে। হিন্দুদের মধ্যেও সর্বত্র ঐ সব আচার এক রকম নয়; সুতরাং জৈনদের আচার বাহির হইতে দেখিলে অ-হিন্দু মনে হইবার কোনো কারণ নাই। এক পশুবলি ছাড়া ধর্মে ও আচারে হিন্দু ও জৈনের মধ্যে বাহ্যত খুব বেশি পার্থক্য দেখাইবে না। পশুবলিও বৈষ্ণব হিন্দুরা পরিত্যাগ করিয়াছে। সুতরাং সামাজিক জীবনে জৈন ও হিন্দুর প্রভেদ অত্যন্ত কম। ইহাই বড়ো কারণ যেজন্য জৈনধর্ম এখনও ভারতে জীবিত আছে—যে ভারতে বৌদ্ধধর্মের স্থান হয় নাই।

দর্শন

ধর্মের কথা আমাদের যতটুকু বলা প্রয়োজন বলিয়াছি। ইহা হইতে যে দর্শন উদ্ভূত হইয়াছিল—প্রমাণ ও প্রমেয়, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধারণা নিঃসৃত হইয়াছিল,— তাহার কথা এখন বলিতে হয়।

প্রমাণ

জ্ঞান লাভের উপায়কেই আমরা প্রমাণ বলিয়া থাকি। জৈনদের মতে জ্ঞান লাভের—তাহাদের ভাষায় অধিগমের— দুইটি উপায় আছে, 'প্রমাণ' ও 'নয়'। 'নয়' নামক জিনিসটি প্রমাণ ছাড়া আর-একটি উপায়। প্রমাণ আবার দুই প্রকার—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রমাণ বুঝিবার জন্য জ্ঞানের প্রকার ভেদগুলিও জানা দরকার। জ্ঞান পাঁচ প্রকারের—মতি, শ্রুত, অবধি, মন-পর্যয় এবং কেবল। ইহাদের মধ্যে মতি ও শ্রুত পরোক্ষ প্রমাণ দ্বারা লাভ করা হয়; বাকি তিনটি প্রত্যক্ষ লভ্য। মতি শব্দ স্মৃতি, সংজ্ঞা, অনুমান ইত্যাদি বুঝায়। সোজাকথায় চিন্তা দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়— জ্ঞাত পদার্থের যে স্মৃতি আছে অথবা জানা জিনিস দেখিয়াই যে চিনি বলিয়া মনে হয়— যাহাকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে—আর, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িবে, ধুঁয়া যেখানে আছে সেখানে আগুনও আছে, ইত্যাদি যে অনুমান— এই সমস্তই মতি অর্থে বুঝায়। ইহা চিন্তালব্ধ জ্ঞান সুতরাং পরোক্ষ। তাহার পর শ্রুত। ইহা আর আস্তিকদের শ্রুতি প্রায় একই জিনিস। জৈনরা বেদ মানে নাই কিন্তু নিজেদের শাস্ত্র (অঙ্গ) মানিয়াছে। মহাবীর ও তাঁহার পূর্বগামী তীর্থংকরদের উক্তি বলিয়া যাহা প্রচলিত আছে, সে সব মানিয়াছে।

এ-সকলও একটা জ্ঞানের উপায়। ইহারই নাম শ্রুত। আবার বিশ্বস্ত লোকের কথা হইতেও জ্ঞান হয়। সুতরাং শ্রুত দুই প্রকার—অঙ্গ-প্রবিষ্ট ও অঙ্গবাহ্য; অর্থাৎ শাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত আর শাস্ত্র ছাড়া অন্য উপায়ে প্রাপ্ত। এই দুইপ্রকার শ্রুতই মতির ন্যায় পরোক্ষের অন্তর্ভুক্ত।

'প্রত্যক্ষ' তিন প্রকার—অবধি, মনঃপর্যয় এবং কেবল। সাধারণত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা তো সকলের মতেই প্রত্যক্ষ। মনের সূক্ষ্ম শক্তির সাহায্যে সূক্ষ্ম তত্ত্বও অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন; ইহাও প্রত্যক্ষই। আস্তিকদের ভাষায় উহার নাম যোগি-প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান যে কোনো ব্যক্তিই পাইতে পারে না। এই উভয়ের মাঝামাঝি আর-এক রকম জ্ঞান আছে যাহা দ্বারা আমরা বাহির হইতে অন্যের মন জানিতে পারি। সাধারণ ইন্দ্রিয়লভ্য যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাহার নাম অবধি আর পরের মনের যে প্রত্যক্ষ লভ্য জ্ঞান তাহার নাম মনঃপর্যয়। সর্বোচ্চ পরম-তত্ত্বের যে সাক্ষাৎ জ্ঞান তাহার নাম কেবল। এই তিন প্রকার জ্ঞানই অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ।

জৈনরা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বিভাগ ক্রিয়ায় পটু। উপরে উক্ত প্রমাণগুলির মধ্যে আবার নানারকম প্রভেদ তাহারা কল্পনা করিয়াছে। সেগুলি আধুনিক পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষক মোটেই নয়; আর সব-গুলি গ্রহণযোগ্যও নয়। সুতরাং ততদূরে আমরা যাইতে চাই না।

জৈনদের ভাষায় প্রমাণ দুইটি—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ; কিন্তু আসলে উহা তিনটি, কারণ পরোক্ষ বলিতে অনুমান ও শ্রুত বা শ্রুতি এই দুইটি বুঝায়। আস্তিকেরা যাহাকে শব্দ বা শ্রুতি বলে, জৈনরা তাহা স্বীকার করে না। কিন্তু শ্রুতির বদলে শ্রুত শব্দ ব্যবহার করিয়া তাহারা নিজেদের শাস্ত্রকে শব্দ প্রমাণের সামিল করিয়া লইয়াছে। সুতরাং

কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে জৈনদের মতে প্রমাণ কয়টি? তাহা হইলে দুইটি—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইহাই বলা উচিত। কিন্তু তিনটি বলিলেও মারাত্মক ভুল কিছু হইবে না। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জৈনরা চার্বাকের মতো শুধু ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকেই প্রত্যক্ষ বলিতেন না; আর, অনুমান স্বীকার করিলেও মীমাংসকদের মতো অর্থাপত্তি, উপমান ও অনুপলব্ধি বলিয়া পৃথক প্রমাণ মানিতেন না। প্রত্যক্ষজ জ্ঞানই ইহাদের মতে মুখ্যজ্ঞান, কারণ উহা জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা রাখে না। পরোক্ষ জ্ঞান গৌণ, কারণ তাহা পূর্বলব্ধ জ্ঞানের সাহায্য অপেক্ষা করে; মতি যে পূর্বলব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে তাহা স্পষ্ট; শ্রুত ও শব্দার্থের জ্ঞান না হইলে জ্ঞান দিতে পারে না। সুতরাং ইহারা দুইই গৌণ জ্ঞান।

স্যাদ্‌বাদ

উমাস্বাতি বলিয়াছেন—প্রমাণনয়ৈরধিগমঃ; অর্থাৎ অধিগম বা সত্যকার জ্ঞান লাভের একটি উপায় 'প্রমাণ' অপরটি 'নয়'। আস্তিকদের ভাষায় যাহাকে ন্যায় বলা হয়, 'নয়' তাহারই মতো বস্তু। জ্ঞান লাভ করিয়া সেই জ্ঞান আমরা একটি বাক্যে প্রকাশ করি, যেমন 'আকাশ নীল' ইত্যাদি। জ্ঞানকে এই প্রকারে বাক্যাকারে প্রকাশ করার আগে বিচার করা উচিত কোন্ ভঙ্গিতে বাক্য রচিত হইলে প্রকৃত সত্য প্রকাশ পায়। এই বাক্যভঙ্গিরই নাম 'নয়'। ইহাও একটি জ্ঞানলাভের উপায়; কারণ যে-কোনো ভাবে জ্ঞান প্রকাশ করিলে অধিগম—ঠিক ঠিক জ্ঞান—হইবে না; ভুল থাকিয়া যাইবে। সেইজন্য অধিগমের জন্য প্রমাণের সঙ্গে নয়ের কথাও ভাবিতে হয়। জৈনদের মতে যে কোনো সত্য সাত প্রকার-

ভঙ্গিতে প্রকাশ করা যায়। সেইজন্য ইহার নাম সপ্ত-ভঙ্গি। জৈনদের সংস্কৃতে এই সাতটি ভঙ্গি এইরূপ :

১. স্যাৎ অস্তি (হয়তো আছে); ২. স্যাৎ নাস্তি (হয়তো নাই) ৩. স্যাৎ অস্তি নাস্তি (হয়তো আছে, হয়তো নাই); ৪. স্যাৎ অবক্তব্যঃ (হয়তো ঠিক বলা যায় না); ৫. স্যাৎ অস্তি অবক্তব্যঃ (হয়তো আছে কিন্তু ঠিক বলা যায় না); ৬. স্যাৎ নাস্তি অবক্তব্যঃ (হয়তো নাই কিন্তু ঠিক বলা যায় না); ৭. স্যাৎ অস্তি নাস্তি অবক্তব্যঃ (হয়তো আছে হয়তো নাই এবং উভয়থাই অবক্তব্য)।

একটা দৃষ্টান্ত না দিলে এই 'সপ্তভঙ্গি নয়'টি পরিষ্কার হইবে না। যদি প্রশ্ন হয়, জৈনদের মত কি সত্য। হয়তো সত্য এবং হয়তো সত্য নয়,— এ উত্তর যে-কোনো লোক সহজেই দিতে পারে; আর যে জানে না, সে অবশ্যই বলিবে, বলিতে পারিতেছি না (অবক্তব্য)। এই তিনটি সহজ উত্তর। যাহার মনে হইবে কতক সত্য কতক নয়, সে তো সোজা বলিবে— সত্যও বটে অসত্যও বটে (স্যাৎ অস্তি নাস্তি)। যে কিছুটা জানে, বাকিটা অস্পষ্ট, সে বলিবে—সত্যই মনে হয়, তবে ঠিক বলিতে পারিতেছি না। আর যে অসত্য অংশটুকুর সংবাদ রাখে, বাকি জানে না, সে বলিবে—সত্য নয় বলিয়া মনে হয়, তবে ঠিক বলিতে পারিতেছি না। আর যে সত্য অসত্য দুই-ই জানে অথচ স্থির সিদ্ধান্ত করে নাই, সে বলিবে—সত্যও বটে, অসত্যও বটে তবে জোর করিয়া কিছু বলিতে পারিতেছি না। জৈনদের মতে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে যে-কোনো তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এই সাত প্রকার বাক্যভঙ্গিতেই প্রকাশ করা উচিত; তাহা না হইলে পূর্ণ সত্য প্রকাশ করা হইবে না। সব জিনিসই এক অর্থে আছে তো অন্য অর্থে নাই, এক জায়গায় আছে অন্য জায়গায় নাই; সূক্ষ্মতর অর্থে অবক্তব্য। অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে

কিছু কোনো প্রশ্নের উত্তরেই বলা যায় না ; একটা অনিশ্চয়তা সর্বত্রই রহিয়াছে। এই যে 'সপ্তভঙ্গি নয়', ইহার নামান্তর 'স্যাদ্‌বাদ'। প্রত্যেকটি বাক্যভঙ্গিরই আরম্ভে স্যাৎ (হইতে পারে) এই কথাটি থাকে বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। এই মতের আর-একটি নাম 'অনেকান্ত বাদ'; কারণ কোনো কথাই একান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা ইহার সিদ্ধান্ত নয়। মল্লিষেণ বলিয়াছেন 'স্যাদিত্যব্যয়মনেকান্তদ্যোতকং'—'স্যাৎ' এইটি অনেকান্ত বোধক একটি অব্যয়। (অন্যযোগব্যবচ্ছেদিকা—শ্লোক ৫)।

প্রমাণ ও নয়

প্রমাণ ও নয়ের সাহায্যে যে তত্ত্বার্থ অধিগত হওয়া যায়, তাহা কী প্রকার। 'অস্তি-নাস্তি অবক্তব্য' যে ক্ষেত্রে সর্বদাই প্রযোজ্য, সেখানে নিশ্চিত জ্ঞানের কি সম্ভাবনা রহিয়াছে। এইখানে জ্ঞানের আপেক্ষিকতার কথা আসিয়া পড়ে। আমরা সাধারণত যেভাবে কথা বলি তাহাতে জ্ঞান যে আপেক্ষিক তাহা সব সময় মনে রাখা হয় না। অভ্যাসের ফলে এইরূপ হইয়া যায়। কাপড়খানা দশ হাত লম্বা' যখন বলি, তখন ১৮ ইঞ্চি হাতের কথাই ভাবি—ইহাই অভ্যাস ; হাত যে ছোটো বড়ো হইতে পারে, সে কথাটা মনে আসে না। কিন্তু বিচারের বেলায় কথাটা মনে রাখা উচিত। সময়ের মাপেও তাহাই সত্য ; বেলা ৮টা সব জায়গায় এক নয় ; পৃথিবীতে এক বৎসর আর বৃহস্পতি গ্রহে এক বৎসর সমান নয়। ওজনের সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। পৃথিবীর এক সের চন্দ্রে কম, বৃহস্পতিতে বেশি হইবে। এইভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের জ্ঞানের মধ্যে একটা আপেক্ষিকতা আছে। কোনো একটা জিনিস এক সেরও বটে, এক সের নয়ও বটে ; তেমনই একটা দৈর্ঘ্য এক হাতও হইতে পারে,

বেশি কমও হইতে পারে। জৈনদের স্যাদ্‌বাদে এই আপেক্ষিকতার কথাটা বেশ প্রকট হইয়াছে। ইহার অগৌণ ফল এই দাঁড়াইবে যে, কোনো কিছুর সম্বন্ধেই জোর করিয়া—নিশ্চিতভাবে—কিছু বলা সম্ভব হইবে না। আস্তিকদের শ্রুতি বলে, 'একমাত্র ব্রহ্ম সত্য'; জৈনদের 'স্যাদ্‌বাদ' অনুসারে এখানেও 'হাঁ,' 'না,' 'জানি না,' 'বলা যায় না' ইত্যাদি সাতরকম উক্তি সম্ভব। ইহাতে জ্ঞানে অনিশ্চয়তা আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু জৈনদের দর্শনে ঠিক তাহাই ঘটে নাই। 'স্যাদ্‌বাদ' একটা সতর্কীকরণ মাত্র; নিশ্চিতভাবে, অন্যমত উপেক্ষা করিয়া, কিছু বলার পক্ষপাতী জৈনরা নয়; কিন্তু সত্য একেবারে অজ্ঞেয়, ইহাও তাহাদের মত নয়। সত্য জানা যায়, ভাষায় প্রকাশ করাও যায়; কিন্তু সাবধানে করা উচিত; কোনো একটা উক্তিকে একেবারে অকাট্য সত্য মনে করিবার আগে চিন্তা করা উচিত।

প্রমেয় বা তত্ত্ব

১. ঈশ্বর

সপ্তভঙ্গি নয়ের সাবধান বাণী মনে রাখিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যে আমরা জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে কী জানিতে পারি। প্রথমত, ঈশ্বরের কথা ধরা যাক্। ঈশ্বর সম্বন্ধে জৈনদের স্থির-নিশ্চিত সিদ্ধান্ত,—ঈশ্বর নাই। স্যাদ্‌বাদের সঙ্গে এরূপ একটা নিশ্চিত উক্তি পরস্পরবিরোধী মনে হইবে নিশ্চয়ই। কিন্তু জৈনরা অজ্ঞেয়ত্ববাদী নয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে আছেন কি নাই, জানি না, বলিতে পারি না, এরূপ ধরনের অস্পষ্ট, খণ্ড উক্তি তাহাদের অভীষ্ট নয়। সোজা সিদ্ধান্ত ঈশ্বর

নাই। কথাটা নূতন নয়। জৈনদের পূর্বে ও পরে অনেকেই ঈশ্বর অস্বীকার করিয়াছে। সুতরাং যুক্তির কথা এখানে তুলিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর নাই ইহার অর্থ, সর্বগ, নিত্য, স্ববশ, বুদ্ধিমান, জগতের কর্তা পুরুষবিশেষ কেহ নাই।[1] কিন্তু ঈশ্বরের অস্বীকৃতি হইতে ইহা বুঝায় না যে, সর্বজ্ঞ কেহ নাই কিংবা দেবতা নাই। তীর্থংকরেরা সকলেই সর্বজ্ঞ; আর, স্বর্গবাসী বহু জীব আছেন, যাঁহাদিগকে মানুষ দেবতা বলিয়া মানে এবং পূজা করে।

২. জীব ও অজীব

আধুনিক দর্শনে আমরা সাধারণত জীব বা মানবাত্মাকে জগৎ হইতে পৃথক করিয়া ভাবি: উভয়ে অসম্পৃক্ত নহে, কিন্তু আলাদা বস্তু। সেইজন্য দর্শনের জ্ঞাতব্য বিষয় বলিতে আমরা জীব ও জগতের পৃথক্ উল্লেখ করি। আর, এই জীবকে আমরা জীবন বা চেতনা হইতেও পৃথক্ মনে করি। আধুনিক শারীরতত্ত্ব অনুসারে জীবনের কেন্দ্র হৃৎপিণ্ড, যাহার ক্রিয়া বন্ধ হইলেই জীব মরিয়া যায়; আর, আত্মার কেন্দ্র বা ক্রিয়ার যন্ত্র মস্তিষ্ক, যাহা নিষ্ক্রিয় হইলে জ্ঞান লোপ হয় কিন্তু প্রাণী মরে না। বৃক্ষ, লতা প্রভৃতির জীবন আছে; তাহাদের বৃদ্ধি হয়, একটি হইতে আর-একটির উৎপত্তি হয়, বাহির হইতে উপাদান খাদ্য বা রস সংগ্রহ করিয়া ইহারা বৃদ্ধি পায়; এসমস্তই জীবনের লক্ষণ; সুতরাং ইহাদের জীবন আছে। কিন্তু ইহাদের চিন্তা করিবার শক্তি নাই, স্মৃতি বা কল্পনা নাই, অনুমান করিবার শক্তি নাই; এই সমস্ত

১ তুঃ হেমচন্দ্র, 'অন্যযোগব্যবচ্ছেদিকা'—৬ষ্ঠ শ্লোকঃ—"কর্তাস্তি কশ্চিৎ জগতঃ স চৈকঃ, স সর্বগঃ স স্ববশঃ স নিত্যঃ। ইমাঃ কু-হেবাক-বিড়ম্বনাঃ স্যুঃ। তেষাং ন যেষামনুশাসকস্ত্বং ॥

আত্মার লক্ষণ; সুতরাং উদ্ভিদের জীবন আছে কিন্তু আত্মা নাই। আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞান ইহাই ধরিয়া লয়।

নিম্নশ্রেণীর প্রাণীতে পৌঁছিলে আমরা জীবনের সঙ্গে মন বা আত্মারও সাক্ষাৎ পাই। ইহাদের কমবেশি ভাবিবার ও মনে রাখিবার শক্তি আছে। কিন্তু সকলের উপরে মানুষ। মানুষের মনের সমান শক্তি জগতে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। উদ্ভিদের সঙ্গে নিম্নপ্রাণীর এবং নিম্নপ্রাণীর সঙ্গে মানুষের একটা সম্বন্ধ স্বীকৃত। ক্রমবিকাশের শাস্ত্র অনুসারে এই সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কিন্তু ভবিষ্যতে কী হইবে না জানিলেও এখন পর্যন্ত মানুষই ক্রমবিকাশের চূড়ান্ত বিকাশ; তাহার উপরে আর কেহ নাই। উদ্ভিদ ও নিম্নপ্রাণীর সঙ্গে তাহার সম্বন্ধে থাকিলেও সে এত বড়ো যে তাহাকে পৃথক করিয়া ভাবিতে হয়। এই চিন্তাপ্রণালী অনুসারে সর্বনিম্নে অচেতন জড, তাহার উপর উদ্ভিদ্, তাহার পর নিম্ন প্রাণী এবং সর্বোপরি মানবাত্মা। মানবাত্মা জগতের অন্তর্গত হইলেও তাহার পার্থক্য এত বেশি যে, চেতন-অচেতন সমস্ত জগৎ এক দিকে আর মানুষ অন্যদিকে, এইভাবেই আমরা ভাবি। মানুষে যাহা পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে, তাহার বীজ জগতে ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু পূর্ণ বিকাশের অধিকারী বলিয়াই মানুষকে সমগ্র জগৎ হইতে পৃথক মনে করা হয়। আধুনিক চিন্তায় জীব বা আত্মা বলিলে আমরা মানুষকেই বুঝি; বাকি সমস্তকেই 'জগৎ' এই সাধারণ আখ্যা দেওয়া হয়।

কিন্তু জৈনদের চিন্তার ধারা একটু ভিন্ন ধরনের। তাহাদের মতে জগৎ দুইভাগে বিভক্ত—জীব ও অজীব। জীব অর্থে জ্ঞাতা আত্মা এবং জীবনধারী প্রাণী এই উভয়কেই বুঝায়। চেতনা বা বোধশক্তি এবং জ্ঞান এই উভয়ই জীবের বিশেষণ। জীব জগতের সর্বত্র ছড়াইয়া

রহিয়াছে, মানুষের দেহেই সীমাবদ্ধ নহে। নিম্ন প্রাণীর দেহে, উদ্ভিদে, জলে, বায়ুতে সর্বত্র জীব রহিয়াছে। এইসব জীবের শ্রেণীবিভাগ নানাভাবে করা হইয়াছে। জৈনরা বিভাজ্য ও বিভাজক আবিষ্কারে অতি নিপুণ, একথা আমরা বলিয়াছি। জীবকে তাহারা যেসব শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে, তাহাতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১. জীব সংসারী ও সিদ্ধ হইতে পা . জীব স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক হইতে পারে; ৩. দেবতা, মানুষ, তির্যক ও নারকী—আর একটা জীবের বিভাগ; ৪. এক-ইন্দ্রিয়, দুই-ইন্দ্রিয়, তিন-ইন্দ্রিয়, চার-ইন্দ্রিয় এবং পাঁচ ইন্দ্রিয়—জীবকে এই পাঁচ প্রকারেও ভাগ করা যায়, ৫. পৃথ্বীকায়, অপ্‌কায়, তেজস্কায়, বায়ুকায়, বনস্পতিকায়—অর্থাৎ যেরকম দেহ ধারণ করিয়া থাকে, সেই অনুসারে জীবকে আরও এক প্রকারে বিভক্ত করা যায়। এইখানেই শেষ নয়; ইহার উপর আরও কতকগুলি বিভাগ করা হইয়াছে। সেগুলির ভিতর বৈজ্ঞানিক সত্য খুববেশি আছে, এমন নয়; সুতরাং এখানে বাদ দেওয়া চলে। এই সমস্তের নির্গলিত সিদ্ধান্ত এই যে, জীব জগতের সর্বত্রই আছে,—কর্মবশে মাটির দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া দেবদেহ পর্যন্ত আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; এবং এক হইতে পাঁচটি পর্যন্ত ইন্দ্রিয় পাইতে পারে। ইহাদের আয়ুর পরিমাণ করিবার চেষ্টাও হইয়াছে। যথা, বায়ুতে যে জীব আছে—ঘূর্ণিবাত্যা প্রভৃতিতে—তাহার আয়ু এক মুহূর্ত হইতে আরম্ভ করিয়া তিন হাজার বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে। উদ্ভিদে যে জীব আছে তাহাকে সেখানে দশ হাজার বৎসরও থাকিতে হইতে পারে; একই উদ্ভিদে হয়তো নয়, দেহবদল করিয়া। তাহার পর, উদ্ভিদের বদলে অন্য জাতীয় দেহ গ্রহণ করিবে হয়তো।

জীব কর্মবশে একটি তিন-ইন্দ্রিয় দেহ পাইতে পারে; যেমন

পিঁপড়া বা ছারপোকার দেহ। তিন ইন্দ্রিয় অর্থ স্পর্শ, জিহ্বা এবং ঘ্রাণ। এই প্রকার দেহে জীব ৪৯ দিনের বেশি বাস করিতে পারে না। চার ইন্দ্রিয় অর্থাৎ স্পর্শ, জিহ্বা, ঘ্রাণ এবং দৃষ্টি আছে যে দেহেতে—যেমন মশা, মাছি ইত্যাদিতে—সেখানে জীবের চূড়ান্ত আয়ু হয় ছয় মাস। এই সব তত্ত্ব সাধারণ লোকের জ্ঞানে আসে না; কিন্তু 'কেবলী' বা চূড়ান্ত তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারীর নিকট স্পষ্ট। সাধারণের পক্ষে এই সব সংখ্যা মনে রাখাও কষ্টকর; সুতরাং আর সংগ্রহের চেষ্টাও এখানে আমরা করিব না। একটা শুধু বলা দরকার যে এইসব তত্ত্বে অনেক অ-তত্ত্ব, অনেক ভুলও আছে। পিঁপড়ার কি চোখ নাই। মশা শব্দ করিতে পারে, কানে শুনে না?

জীব সম্বন্ধে আর-একটা উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, উহা যখন যে দেহে বাস করে, তখন সেই দেহের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ ঐ দেহের আয়তন পায়। ইহার অর্থ এই যে আত্মার বা জীবের বিস্তৃতি ও সংকুচন সম্ভব। মশার দেহ হইতে জীব যখন হাতির দেহে প্রবেশ করিবে, তখন তাহাকে অনেকখানি বিস্তৃত হইতে হইবে; আবার, ইহার বিপরীতটি যখন ঘটিবে তখন সংকুচনটাও তেমনই ভাবিবার মতো হইবে।

অন্য দার্শনিকেরা আত্মাকে এইভাবে কল্পনা করেন নাই। ন্যায় বেদান্ত ইত্যাদির মতে আত্মা 'অণু' অর্থাৎ সূক্ষ্ম। দেহের সর্বত্র তাহার বিস্তৃতি 'চন্দনবৎ', অর্থাৎ চন্দন এক জায়গায় থাকিয়া কিছুদূর পর্যন্ত যেমন গন্ধ বিস্তৃত করিতে পারে, আত্মাও তেমনই দেহের একাংশে অবস্থিত থাকিয়াও সর্বত্র ক্রিয়া ও প্রভাব বিস্তার করে। সমস্ত দেহ ব্যাপ্ত হইয়া সে থাকে না। জৈনদের মত ইহার ঠিক বিপরীত। তাহাদের মতে দেহের অনুপাতে আত্মা ছোটো বড়ো হইয়া থাকে। আধুনিক

দর্শনেও প্রশ্নটা জটিল, স্বীকার করিতে হইবে। তবে, সে আলোচনা আমাদের সীমার বাহিরে।

৩. অজীব বা জগৎ

জীব ছাড়া বিশ্বের বাকি সমস্তই 'অজীব'। সেইটুকু কী। ধর্ম অধর্ম, আকাশ ও পুদ্‌গল। ইহারা সব দ্রব্য। জীবও দ্রব্য। ইহাদের মধ্যে ধর্ম অধর্ম ও আকাশের অর্থ স্পষ্ট। তবে, ইহাদের স্বরূপটা ভাবা প্রয়োজন। ইহারা সব রূপহীন, অবিভাজ্য, নিষ্ক্রিয় এবং জগতের সর্বত্র বর্তমান। জীব এবং এই চারিটি অজীব বিস্তৃতিমান, ইহাদের কায় আছে। ইহা ছাড়া আর একটি দ্রব্য আছে, কাল। কালের কায় বা বিস্তৃতি নাই, কিন্তু অসংখ্য অণু আছে। ধর্ম, অধর্ম ও আকাশের মতো কালও অরূপী। অজীবের মধ্যে 'পুদ্‌গল' রূপী। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, পুদ্‌গলের অর্থ জড়। ধর্মাদি অজীবের বিভাগ নাই; পুদ্‌গলের বিভাগ আছে—ইহা অণুতে বিভাজ্য। কর্মবশে এই পুদ্‌গলের সঙ্গে জড়াইয়া গেলেই জীবের বন্ধ হয়।

এই জগতের সম্পূর্ণ বিবরণ আমরা দর্শনের নিকট আশা করি না। নদী-পর্বতের বিবরণ আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের কথা বিভিন্ন প্রাণী ও মানুষের সকল তত্ত্ব— ভৌগোলিক ও জ্যোতিষিক সমস্ত তথ্য—দর্শন দিবে এমন নয়। এখন এই সব বিদ্যা সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া গিয়াছে। আরিস্টটলের সময় তাহা ছিল না, প্রাচীন ভারতেও ছিল না। জৈন-দর্শনও সেইজন্য এইসব দর্শনাতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছে। ফলে, হিন্দুর পুরাণের কাহিনীর মতো জৈনদর্শন এমন অনেক কথা বলিয়াছে যাহা আধুনিক জ্ঞানের তাপে উবিয়া যায়। ধরণী এখন আর সপ্তদ্বীপা নয়; নদী ও পাহাড়ের সংখ্যা সব একরকম

জানা হইয়া গিয়াছে। এসব জ্ঞানের জন্য আমরা আর প্রাচীন দর্শনের দিকে চাহিব না। তবে, প্রাচীনদের চেষ্টার একটা মূল্য আছে। ভুল করিয়া করিয়াই মানুষ সত্যে পৌঁছে।

ভূগোলের ভিতর জৈনরা ৮৭ লক্ষ নরকের বিবরণ ঢুকাইয়াছে। প্রত্যেকটি নরকের ক্ষেত্রফল কত যোজন, তাহাও আমাদিগকে শুনাইয়াছে। প্রাণিবিদ্যার অন্তর্গত করিয়া এইসব নরকের বাসীদের দেহ, চিন্তা, দুঃখ ইত্যাদিরও বর্ণনা করা হইয়াছে। ভূগোলের অন্তর্গত সমুদ্রগুলির কথাও বলা হইয়াছে। তাহাদের গভীরতা ও যোজনের মাপ প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহার পর, গঙ্গা,সিন্ধু প্রভৃতি ভারতের —অন্য দেশের অবশ্যই নয়— নদনদীর কথাও পাই। নদ-নদীর মধ্যে পূর্বদিক্‌বাহী ও পশ্চিমদিক্‌বাহী কোন্‌গুলি, সে কথাও বলার বাকি থাকে নাই। ভুল যথেষ্টই আছে; যেমন গঙ্গা ও সিন্ধুর শাখা-নদী ও উপনদীর সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে চৌদ্দ হাজার।

নৃতত্ত্বের মধ্যে আর্য ও ম্লেচ্ছের প্রভেদটা বড়ো করিয়াই দেখানো হইয়াছে। আর্যদের মধ্যে ঋদ্ধি-প্রাপ্ত ও অনৃদ্ধি-প্রাপ্ত এই দুইটি প্রধান শ্রেণী আছে। ঋদ্ধি কথায় নানা প্রকার উন্নতিই বুঝায়। ম্লেচ্ছদেরও একাধিক শ্রেণী আছে।

তির্যগ যোনিদেরও শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে। এই সব দেহে জীব প্রবেশ করিলে কোথাও বা তিনদিন, কোথাও বা ছয় মাস কোথাও বা ৭২,০০০ বৎসর, আবার কোথাও বা তাহারও বেশি আয়ু পায়।

এই প্রকার গবেষণা হিন্দুদের পুরাণেও যথেষ্ট রহিয়াছে। ইহার মধ্যে অসত্য বা ভ্রান্তি অনেক রহিয়াছে, স্বীকার না করিলে আধুনিক বিজ্ঞানের নিকট অপরাধী হইতে হয়। কিন্তু জানিবার এই উদ্যম যে

প্রশংসনীয়, সে-বিষয়েও সন্দেহ করা উচিত নয়। আর ঐ সময়ে জগৎ ইহার বেশি জানিতও না।

সপ্ত বা নব তত্ত্ব

জীব ও অজীব জানিলেই আমাদের সব জানা হইল না। শুধু এইটুকু জ্ঞানেই মোক্ষ হইবে না। মোক্ষের জন্য যেসব তত্ত্ব জানা প্রয়োজন তাহাদের সংখ্যা উমাস্বাতির মতে সপ্ত, আবার কাহারও কাহারও মতে নব। এই সাতটি তত্ত্বের মধ্যে জীব ও অজীব অবশ্যই আছে; অধিকন্তু আছে আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষ। যাঁহারা নব-তত্ত্ব মানেন, তাঁহারা ইহাদের সঙ্গে পুণ্য ও পাপ এই দুইটি যোগ করিয়া লন। যাঁহাদের মতে সংখ্যা সাত, তাঁহারা পুণ্য ও পাপকে আস্রব ও বন্ধের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন।

পাপ পুণ্যের যে সূক্ষ্ম শ্রেণীবিভাগ জৈনরা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই শ্রদ্ধার উপযুক্ত। অবশ্যই এ সকল বিচার হিন্দু বা আস্তিক দর্শনেও কম হয় নাই। পাপ আর পুণ্য সব সময়ই একটি ঠিক আর একটির বিপরীত নয়—কোনো ক্ষেত্রে উভয়ে পৃথক্, কোনো ক্ষেত্রে একটি আর-একটির বিপরীত। হিংসা পাপ, অহিংসা পুণ্য, সত্য পুণ্য, অসত্য পাপ; এই সব ক্ষেত্রে একটি আর-একটির বিপরীত। কিন্তু কতকগুলি ক্রিয়া আছে যাহা না করিলে পাপ হয় না, কিন্তু করিলে পুণ্য হয়, যেমন অন্ন, বস্ত্র, পানীয় ইত্যাদির দান। পুণ্যের মধ্যে অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও ব্রহ্মচর্যের স্থান অতি উচ্চে।

শুভ ও অশুভ কর্ম যখন জীবকে আশ্রয় করে তখনই তাহার বন্ধ হয়। এই শুভ-অশুভ কর্ম যে উপায়ে জীবে আশ্রয় পায় তাহার নাম আস্রব। নানা ভাবে কর্ম জীবকে জড়াইয়া ফেলিতে পারে; সুতরাং

আস্রবও নানা প্রকার। যথা, ইন্দ্রিয় পাঁচটি—জীবের বিষয়াসক্তি উদ্রিক্ত করিতে; রসনার লোভ, শ্রুতিমধুর শব্দের লোভ, ইত্যাদি পুদ্‌গলের বা জড়ের সঙ্গে জীবকে সংশ্লিষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। ক্রোধ প্রভৃতি রিপুও এক প্রকার আস্রব। অসূয়া বা পরনিন্দাও আস্রব। জৈন-শাস্ত্রে এই সকলের যে বিস্তৃত আলোচনা আছে, তাহার উল্লেখ মাত্র এখানে করিতে পারি; পরিপূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। সাবেক কালের চিন্তায় পাপ ইত্যাদির নামকরণ ও সংখ্যানির্দেশ একটা সূক্ষ্ম গবেষণা বলিয়া মনে করা হইত। এখন আমরা স্পষ্ট করিয়া পাপ-পুণ্যের স্বরূপ নির্দেশই যথেষ্ট মনে করি, নাম ও সংখ্যা তত বড়ো জিনিস নয়।

আস্রবের সাহায্যে কর্ম জীবে প্রবিষ্ট হয়,—সচ্ছিদ্র নৌকায় যেমন জল প্রবেশ করে, তেমনই। আর 'সম্বর' দ্বারা এই প্রকার কর্ম-প্রবেশ রুদ্ধ হয়। কী কী উপায়ে কর্ম-প্রবেশ নিরুদ্ধ করা যায় তাহাদেরও সংখ্যা এবং প্রকৃতি জৈনশাস্ত্র বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছে। সংখ্যাগুলি আমরা খুব প্রয়োজনীয় মনে করি না; তবে মনে রাখা ভালো, এই সংখ্যা কম নয়, পঞ্চাশেরও উপর। সংখ্যা হইতে স্বরূপটা আমাদের কাছে অধিক প্রয়োজনীয়। দুই একটি দৃষ্টান্ত লইলে সবই হযতো পরিষ্কার হইবে।—১. পথ চলিতে হুঁশিয়ার হওয়া উচিত, পাছে পদ-পেষণে কোনো জীব হত হয়; ইহা একটি 'সম্বর'। ২. কথা বলিতেও সাবধান হওয়া উচিত; রুক্ষ ভাষায় কাহাকেও কষ্ট দিলে পাপ হইবে; অসত্য-ভাষণেও পাপ হয; এবং এইসব উপায়ে কর্ম প্রবেশ করে। এ সকল প্রতিরোধ করার নামই 'সম্বর'। ৩. আহারে বিচার ও সংযম আস্তিক দর্শনের মতো এখানেও প্রশংসিত হইয়াছে। ৪. চিত্ত-দমন সব দর্শনেই বড়ো জিনিস; ইহাও একটা 'সম্বর'। ৫. ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদি

দমন প্রবৃত্তি-দমনের অন্তর্গত, সুতরাং পৃথক্‌ উল্লেখ না করিলেও চলে। ৬. উপবাস, ধ্যান-ধারণা, বিবেক ও বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধনার অঙ্গ হিসাবে ব্যবস্থিত হইয়াছে।

'বন্ধ' আসে যখন উপরি-উক্ত 'সম্বর' দ্বারা জীব কর্মকে রোধ করিতে পারে না তখন। জৈনদের মতে এই 'বন্ধ' মানে পুদ্‌গলের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক। 'বন্ধের'ও প্রকার-ভেদ আছে। দড়ির বাঁধন যেমন ঢিলা ও আঁটা হইতে পারে, কর্মেরও তাহাই।

কর্মকে সম্পূর্ণ রোধ করিতে পারিলে সকল ল্যাঠাই চুকিয়া যায়। কিন্তু তাহা সহজেই হয় না। কোনো না কোনো রকমে জীব কর্ম দ্বারা বদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং সম্বরের পরও আবার একটা জিনিসের কথা ভাবিতে হয়, যাহা দ্বারা অজ্ঞাতসারে প্রবিষ্ট কিংবা পূর্বসঞ্চিত কর্ম জীব হইতে একেবারে নিষ্কাশিত হইয়া যায়। ইহারই নাম 'নির্জরা'। গাড়ু হইতে কিংবা সচ্ছিদ্র পাত্র হইতে জল যেমন আস্তে আস্তে বাহির করিয়া দেওয়া যায়, তেমনই জীবও একটা উপায়ে সমস্ত কর্ম আস্তে আস্তে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে। এই উপায়ের নাম 'নির্জরা'। 'নির্জরা' তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন। এই তপস্যা বা কৃচ্ছ্রসাধন আবার দুই প্রকার— বাহ্য ও আভ্যন্তর। উপবাস ইত্যাদি কায়িক ক্লেশ দ্বারাও কর্মক্ষয় হয়; ইহা বাহ্য নির্জরা। আভ্যন্তর নির্জরা বলিতে অনুশোচনা ও প্রায়শ্চিত্ত বুঝায়। গুরুর নিকট কৃত-পাপ স্বীকার করা, তাহার জন্য অনুশোচনা করা এবং প্রায়শ্চিত্ত করাও কর্মক্ষয়ের একটা উপায়। প্রায়শ্চিত্ত অর্থ কর্মক্ষয়ের জন্য কর্ম। ইহার কথা হিন্দুশাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। অনুশোচনার উপর যীশুর শিক্ষায় যথেষ্ট জোর দেওয়া হইয়াছে। জৈনরা এই দুইটিকেই স্বীকার করিয়াছে। এখানেও অনেক শ্রেণীবিভাগ জৈনশাস্ত্রে রহিয়াছে। আমাদের কাছে সেগুলি

খুব জরুরি নয়। তবে শাস্ত্রাধ্যায়ী জৈনরা সেগুলিকে মোটেই উপেক্ষণীয় মনে করেন না।

সম্বর দ্বারা কর্ম রুদ্ধ এবং নির্জরা দ্বারা কর্ম ক্ষীণ হইলে আসিবে 'মোক্ষ'। মুক্ত আত্মাকে জৈনরা 'সিদ্ধ'ও বলিয়া থাকেন। এই মুক্ত অবস্থার বর্ণনায় ভারতীয় দর্শনে অনেক প্রভেদ দেখা দিয়াছে। অনস্তিত্ব হইতে অনন্ত আনন্দময় অস্তিত্ব প্রভৃতি নানাভাবে মুক্তির কল্পনা করা হইয়াছে। অদ্বৈত বেদান্তের মুক্তি ও বৌদ্ধদের নির্বাণ এ মোক্ষ; কিন্তু উহাই এক রকমের। জৈন মোক্ষ সেরূপ নয়। জৈনমতে সিদ্ধ পুরুষ অসীম ও অনন্ত শান্তিতে নিজের পৃথক্ সত্তা রক্ষা করিয়া দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় অনন্তকাল নিঃশ্রেয়স ভোগ করিবেন।

মোক্ষ সমেত এই যে নয়টি বা সাতটি তত্ত্বের কথা বলা হইল, তাহাদের সম্যগ্ জ্ঞান এবং তাহাদের প্রতি সম্যক্ শ্রদ্ধা মোক্ষ লাভের উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু শুধু জ্ঞান ও শ্রদ্ধাই যথেষ্ট নয়; চারিত্রও দরকার। উমাস্বাতির প্রথম সূত্রেই সেকথা বলা হইয়াছে— "সম্যক্ দর্শন-জ্ঞান-চারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ"। চারিত্রের অর্থ আগেও বলা হইয়াছে। যেসব তত্ত্বের কথা বলা হইল, কার্যত জীবনে সে সকলের অনুসরণ করার নামই চারিত্র। অহিংসা বা অস্তেয় পুণ্য জানিলেই শুধু হইবে না, জীবনে উহা পালন করিতে হইবে। অজীব হইতে নিজেকে চেষ্টার দ্বারাই মুক্ত করিতে হইবে। শুধু জ্ঞান চেষ্টা নয়; চেষ্টা হয় চারিত্রে। জ্ঞান ও বিশ্বাসের কথা জৈনরা বলিয়াছে বটে, কিন্তু সকলের উপর বেশী বলিয়াছে চারিত্রের কথা—অনুষ্ঠানের কথা। জীবনের কর্মে যে-তত্ত্ব অনুসৃত না হয়, তাহা মোক্ষ আনয়নে সহায়তা করে না।

জৈন-দর্শন বলিতে প্রায় একই জিনিস বুঝায়। ইহার শাখা-

প্রশাখার বালাই বিশেষ কিছু নাই। ধর্মের দিক্ দিয়া অনেক সম্প্রদায়-ভেদ আছে; ইহাদের সংখ্যা নগণ্য নয়। কিন্তু দর্শনে এত বিভাগ, এত বিচিত্রতা দেখা দেয় নাই। তত্ত্বের সংখ্যা সাত না নয়, পাপ-পুণ্যের পৃথক্ উল্লেখ উচিত কি না, ইত্যাদি প্রশ্ন ঠিক দার্শনিক প্রশ্ন নয়; আর এই সব লইয়াও তর্ক বেশী হয় নাই। সুতরাং দর্শন তাহাদের অনেকগুলি হয় নাই।

দর্শন হিসাবে ইহার মূল্য কী, তাহা অন্যান্য দর্শনের সঙ্গে তুলনায় সহজেই ধরা যাইবে। ঈশ্বর নাই। জীব ও জগতের কথার বিচারই কি খুব সূক্ষ্ম হইয়াছে। দেহের পরিমাণ আত্মা—কথাটা লইয়া তর্ক হইয়াছে। স্বর্গ ও নরকের অধিবাসীদের শ্রেণীবিভাগ ও আয়ুনির্ণয় ইত্যাদি আধুনিক চিন্তায় উচ্চ স্থান পাইবে না। পুদ্গলের কল্পনা উপেক্ষণীয় না হইলেও ভূগোল ও খগোলের যেসব তত্ত্ব বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে অসত্য ও অর্ধ-সত্য অনেক রহিয়াছে। সুতরাং জৈনদের দার্শনিক উদ্যমের প্রশংসা করিয়াও আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, ইহাতে অপূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। দর্শনে জৈনদের দান খুব বড়ো নয়।

কিন্তু ভারতের জৈনদের বড়ো দান তাহাদের দর্শন নয়, চারিত্র-নীতি। অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ইত্যাদির কথা জৈনরা হয়তো হিন্দুদের অপেক্ষা বেশী বলিয়াছে। আর জৈন সন্ন্যাসীদের তপশ্চর্যাও অত্যন্ত কঠোর। অহিংসার নীতি তাহারা এত উচ্চে তুলিয়াছে যে তাহাতে জীবন ধারণও একটা তপস্যা হইয়া দাঁড়ায়। বায়ুতে যে অদৃশ্য জীবাণু আছে তাহার প্রতিও অহিংসা রক্ষা করিতে গেলে শ্বাস-প্রশ্বাসও একটা কঠোর ব্রতে পরিণত হয়। সেজন্য এসব নীতি ষোলো আনা আধুনিক চিন্তা গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে জৈনদের আদর্শের উচ্চতা অস্বীকৃত হয় না।

বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত হিন্দুধর্মে যত পরিবর্তন হইয়াছে তাহার অনেকটা যে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সহিত সংঘর্ষের ফল, তাহা তো মানিতেই হইবে। এই সংঘর্ষে হিন্দু আস্তিক্য শেষ পর্যন্ত জয়ী হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই জয়ের মধ্যে কল্যাণ-অকল্যাণ দুই-ই নিহিত রহিয়াছে। আর পরাজিত জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন হিন্দুর জীবনের আদর্শ যে কতকটা উন্নত করিয়া দিয়াছে, তাহা স্বীকার না করিলে ঋণ অস্বীকার করা হয়—অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায। দর্শনে জৈনদের দান তত সূক্ষ্ম না হইলেও ধর্মের আদর্শ তাহাদের বড়ো। ইহাও একটা কারণ, যেজন্য জৈন মত ও ধর্ম এখনও ভারতে স্থান পাইয়াছে।

৩. বৌদ্ধ-দর্শন

বৌদ্ধ-দর্শনের কথা ভাবিতে গেলে বুদ্ধের ধর্মের কথাও তুলিতে হয়। এই ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বা শাক্যমুনি বুদ্ধ, তথাগত, সুগত প্রভৃতি অনেক বিশেষণের অধিকাবী। 'বুদ্ধ' কথাটিই প্রচলিত বেশী। বুদ্ধের প্রবর্তিত ধম ও দর্শন 'বৌদ্ধ' এই বিশেষণে বিশেষিত হইয়া আসিতেছে। খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধের আবির্ভাব হয ; সুতরাং এই ধম আজ ২৫০০ বৎসরেরও বেশী পৃথিবীতে চলিয়া আসিতেছে। জৈন-ধর্ম-প্রবর্তক মহাবীরের অল্প পরেই বুদ্ধ আবির্ভূত হন। সেই হিসাবে জৈনধর্ম প্রাচীনতম। কিন্তু জৈনধর্ম সর্ব-জাগতিক ধর্ম নয ;—ভারতের বাহিরে কোথাও উহা প্রবেশ করিতে পারে নাই : বুদ্ধের ধর্ম ভারতে এক সময় খুবই প্রবল ছিল। ভারতের বাহিরেও উহা পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের কূল ও পূর্বে জাপান আর উত্তরে চীন-তাতার, দক্ষিণে লঙ্কা, মলয় প্রভৃতি দেশে দ্রুত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এখনও ঐ সব দেশের অনেক জায়গায় উহাই গৃহীত ধর্ম। সুতরাং বুদ্ধের ধর্ম সর্ব-জাগতিক

ধর্ম। খ্রীস্টান ধর্ম আর ইস্‌লাম যেমন পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, বৌদ্ধ ধর্মও তাহাই। ভারতে অধুনা এই ধর্ম বিলুপ্ত হইলেও ইহার চিহ্ন নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। বহু 'স্তূপ', 'চৈত্য', বিহার, শিলালিপি, শিলাস্তম্ভ প্রভৃতি ইহার আবির্ভাবের প্রমাণ ধারণ করিয়া দেশের বুকে বিরাজ করিতেছে।

জৈনদের বেলায় যেমন বৌদ্ধদের বেলায়ও তেমনই ঐ নামের দর্শন ঐ ধর্মের পরিপূরক রূপেই আবির্ভূত হয়; আর হিন্দু বা বেদ-বিশ্বাসী দর্শনের সঙ্গে তর্কদ্বন্দ্বে নিয়োজিত হইয়া ক্রমশ শক্তি লাভ করে। বুদ্ধ নিজে তাঁহার সময়ের প্রচলিত দর্শন ইত্যাদি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি প্রচার করিয়াছিলেন ধর্ম,—দর্শন নয়। সেই ধর্মের পক্ষে যুক্তি দিতে এবং তাহার প্রতিপক্ষের যুক্তি নিরসন করিতে গিয়া বুদ্ধের ধর্ম যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা এক বিরাট দর্শন-শাস্ত্রের সৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহারই সাধারণ নাম বৌদ্ধ-দর্শন। বৌদ্ধ ধর্ম বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্ম; কিন্তু বৌদ্ধ দর্শন বুদ্ধের প্রবর্তিত নয়, বৌদ্ধদের প্রবর্তিত দর্শন।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা অনেকে এই দর্শনের বহু সুখ্যাতি করিয়াছেন। অনেকে ইহাকে প্রাচীন যুগের একমাত্র স্বাধীন চিন্তা মনে করিয়াছেন। বেদ-বিশ্বাসীদের চিন্তা বেদের শিক্ষা অতিক্রম করিতে পারিত না; সুতরাং পূর্ণ স্বাধীনতা উহা কোনো ক্ষেত্রেই অর্জন করিতে পারে নাই। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনের ধারা কোনো গৃহীত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই; সেইজন্য উহা স্বাধীন ছিল, ইহাই অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের অভিমত। কিন্তু সকলে ইহা মানেন নাই। তাঁহাদের মতে বৌদ্ধ-দর্শন বেদ অমান্য করিয়াছিল ঠিক, কিন্তু বুদ্ধের উক্তিসকল তাঁহাদের বেলায় বেদের স্থান অধিকার করিয়াছিল। সুতরাং স্বাধীন চিন্তা বলিতে আমরা বর্তমানে

যাহা বুঝি, বৌদ্ধ দর্শন ঠিক তাহাই ছিল না; কিছু অধীনতা উহারও ছিল।

জৈন দর্শন সম্বন্ধেও ঠিক এই একই কথা প্রযোজ্য। নাস্তিক দর্শনের এই দুই শাখাই বেদ অগ্রাহ্য করিয়া একটা একান্ত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু উভয়ত্রই ধর্ম-প্রবর্তকের উক্তি উপেক্ষা করিয়া দার্শনিক চিন্তা অগ্রসর হইতে পারে নাই। জৈন-দর্শন মহাবীরের মত আর বৌদ্ধ-দর্শন বুদ্ধের মত গ্রহণ করিয়া পরে দার্শনিক চিন্তায় অগ্রসর হইয়াছে; কাজেই পূর্ণ স্বাধীনতা ঠিক কোথাও ছিল না। তবে, বৌদ্ধ দর্শনের পক্ষে একটা কথা এই যে, বুদ্ধ নিজে দার্শনিক প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর কদাচিৎ দিয়াছিলেন; সেইজন্য পরবর্তীরা একটা বন্ধনহীন ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারিয়াছিলেন।

বৌদ্ধদর্শনের স্বাধীনতার পক্ষে বিপক্ষে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অসত্য নয়। মহাবীর ও বুদ্ধ উভয়েই বেদবিহিত ধর্ম বর্জনের উপদেশ দিতে সাহসী হইয়াই একটা সুসম্বদ্ধ সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়ান। ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসে মার্টিন লুথার (Martin Luthar) যেমন ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা দাবি করিয়াছিলেন, মহাবীর ও বুদ্ধও তেমনই একটা স্বাধীনতা দাবি করিয়াছিলেন। সুতরাং আরম্ভে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম একটা প্রচণ্ড স্বাধীনতার আন্দোলন ছিল। আর, সেই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দর্শনও পরাধীন ঠিক নয়। অধিকন্তু, মহাবীর ও বুদ্ধ দর্শনের উপদেশ তেমন কিছু দেন নাই বলিয়া পরবর্তী দার্শনিকেরা বদ্ধ প্রাচীরে আবদ্ধ ছিলেন না—উন্মুক্ত গগনের নীচে মুক্ত বায়ুতেই বিচরণ করিতে পারিতেন। তবে, চিন্তার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পৃথিবীতে সেই যুগে কোথাও ছিল না। ভারতেও ছিল না। ক্রমশ শাস্ত্র রচিত ও গৃহীত হইয়া একটা আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়াছিল যাহা অতিক্রম করা কঠিন ছিল।

স্বাধীনতা জৈনদের অপেক্ষা বৌদ্ধেরা কার্যত ব্যবহার করিয়াছিলেন বেশী। বৌদ্ধদের দার্শনিক বিচার অনেক সূক্ষ্ম ও গভীর এবং অনেক উচ্চ ও বিস্তৃত। বুদ্ধের শিক্ষা এবং বৌদ্ধ দর্শন এখনও একাধিক ভাষায় রক্ষিত আছে। পালি ও সংস্কৃত ভারতে ও লঙ্কায় ইহার ভাষা হইয়াছিল। চীনে এবং তিব্বতে ঐ সব ভাষায় উহার প্রচার ও সংরক্ষণ ঘটিয়াছে। ভারতেও বৌদ্ধদের কীর্তি জৈনদের অপেক্ষা বেশী। নালন্দা, তক্ষশিলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল। সারনাথ প্রভৃতির ভগ্নস্তূপ বৌদ্ধ কীর্তির প্রচারক। সম্রাট অশোকের শিলালিপি প্রভৃতি বুদ্ধের জগৎব্যাপী যশোগাথা বহন করিয়া রাখিয়াছে। বুদ্ধের শিক্ষা ও বৌদ্ধ দর্শনের সহিত পরিচিত হওয়ার জন্য চীনের পরিব্রাজকেরা কত কষ্টে এ দেশে আসিতেন। ইহা তাঁহাদের পুণ্যতীর্থ। পরাজিত ও নির্বাসিত হইয়াও বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন ভারতে তাহার অক্ষয় চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। যে মহাপুরুষের অনুপ্রেরণায় এই সব সম্ভব হইয়াছিল, তাঁহাকে সেইজন্যই পরবর্তী হিন্দুধর্ম—বিশেষত বৈষ্ণব শাস্ত্র—বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়া সম্মানিত করিয়াছিল। এই অবতার-বাদও বৈষ্ণবেরা বৌদ্ধদের কাছে শিখিয়াছে কিনা, জিজ্ঞাসা করা চলে। কারণ, আদিম হিন্দুধর্মগ্রন্থ উপনিষদাদিতে ঈশ্বরের আকারের কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নাই। বুদ্ধের এবং মহাবীরের শিক্ষায় জগতের উপকারার্থে 'তথাগত' ও 'তীর্থংকরেরা' বার বার আবির্ভূত হন, একথা পাওয়া যায়। গীতার অবতার সম্বন্ধে উক্তি তাহার আগে কি পরে, তাহাও প্রশ্নের বাহিরে নয়।

বুদ্ধের ধর্ম—স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি

সকল ধর্মের মধ্যেই কতকগুলি জিনিস স্বীকৃত হয় আর কতক হয় অস্বীকৃত। পরস্পরের পার্থক্য এই সকল স্বীকৃতি অস্বীকৃতির উপর

নির্ভর করে। ইস্‌লাম ও খ্রীস্টান ধর্মের মধ্যে একটা বড়ো প্রভেদ এই যে, ইস্‌লাম ঈশ্বরের অবতার স্বীকার করে না; মুহম্মদ পয়গম্বর ছিলেন, কিন্তু মানুষ; যীশুর ধর্মে যীশু ঈশ্বরের অংশ-অবতার,—সাধারণ মানুষ নহেন। বুদ্ধের ধর্মেরও বৈশিষ্ট্য এইরূপ কতকগুলি স্বীকৃতি অস্বীকৃতি দ্বারা নির্ধারিত করা যায়। বুদ্ধের ধর্মে ঈশ্বর নাই। এইখানে জৈন বৌদ্ধ মত এক। জগতের কর্তা, এক ও অদ্বিতীয় সর্বজ্ঞ সর্বগ ও নিত্য কোনো পুরুষ নাই। জগতের কথা পরে ভাবিব; ঈশ্বর যে নাই একথাটা আগে মনে রাখিতে হইবে। আর সকলের মধ্যে বেশী অস্বীকৃত বেদ; বেদের ধর্ম ও পশুঘাত শুধু যে অস্বীকৃত তাহা নয়; নিন্দনীয় এবং হেয়। বেদ অস্বীকার করিলে বেদের দেবতারাও অস্বীকৃত হন। শুধু তাই নয়; উপনিষদের ব্রহ্ম—অর্থাৎ জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ আনন্দময় সৎ-পদার্থও অস্বীকৃত।

বুদ্ধের ধর্ম তবে স্বীকার করে কী। সকলের অপেক্ষা বেশী স্বীকার করে কর্ম। মানুষ যে কর্ম করিয়াছে এবং করে তাহা তেলের ভাণ্ডে তেলের মতো তাহার আত্মায় লাগিয়া থাকে এবং ইহার ফলে তাহার বার বার দেহ-প্রাপ্তি ঘটে। এই ভাবে কর্মের অর্থ বেদান্ত করিয়াছে। কিন্তু বুদ্ধের কর্ম আছে অথচ আত্মা নাই। তেল আছে, উহা এক ভাণ্ড হইতে অন্য ভাণ্ডে যায়, কিন্তু স্থির ও স্থায়ী কোনো ভাণ্ড নাই। কী ভাবে তাহা সম্ভব, তাহা সূক্ষ্ম বিচারের বিষয়। কেহ যদি বলে, কুকুর ল্যাজ নাড়ে, আমরা তাহার মানে বুঝি। কিন্তু কেহ যদি বলে ল্যাজ কুকুর নাড়ে, তাহা হইলে বুঝিতে কষ্ট হয়, ওলট-পালট মনে হয়। কিন্তু কেহ যদি বলে, ল্যাজও নাই, কুকুরও নাই, আছে শুধু নড়ন, তাহা হইলে কী মানে হইবে। একেবারে মানে হইবে না, এমন নয়; তবে উহা সহজবোধ্য নয়। বিজ্ঞানে এমন কথা বলা হয়; দৃষ্টান্ত দরকার নাই; বুদ্ধও

বলিয়াছেন। পুনর্জন্ম কথাটাও বুদ্ধের ভাষায় আছে, তবে একটু অসাধারণ অর্থে। কর্ম ও পুনর্জন্ম এই দুইটি বুদ্ধের স্বীকৃতি। দেহেতে আত্মার জীবন সুখের নয়—দুঃখময়, ইহা বুদ্ধের আর-একটি স্বীকৃতি। এই দুঃখের কারণ কর্ম, তাহা তো দেহান্তরের প্রাপ্তি হইতেই বুঝা যায়। এই দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব, কিন্তু এই নিবৃত্তির উপায় জ্ঞান নয়—বেদের জ্ঞান তো নয়ই; এই উপায় কঠোর নৈতিক জীবন—কঠোর চারিত্র। দুঃখ-নিবৃত্তির পর যে অবস্থা হয়, এক কথায় তাহার নাম 'নির্বাণ'। জীবন দুঃখময় এই দুঃখ বিনা কারণে হয় না, ইহার নিবৃত্তি সম্ভব এবং এই নিবৃত্তির একটা পন্থা আছে—এই চারিটি স্বীকৃতিকে বৌদ্ধেরা—চত্বারি আর্য সত্যাণি—চারিটি মহা-সত্য বলিয়া থাকেন। সকল দুঃখের অবসানের নাম 'নির্বাণ'।

এই স্বীকৃতির পর ধর্মের প্রধান কাজ, দুঃখনিবৃত্তির উপায় নির্ধারণ করা। জৈনদের মতো বৌদ্ধেরাও চারিত্রের উপর জোর দিয়াছে; সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ দর্শনের কথা এখানেও উঠিয়াছে। জগতের সবল গৃহীত সাধারণ চারিত্রনীতি এখানেও উপেক্ষিত হয় নাই। কিন্তু অহিংসার উপর জৈনরা যেভাবে এবং যতটা গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে, বৌদ্ধেরা ততটা করে নাই। বুদ্ধের মতে এই দুঃখনিবৃত্তির প্রথম সোপান সম্যক্ দৃষ্টি; ইহা জৈনদের সম্যক্ দর্শনের অনুরূপ। দ্বিতীয় সোপান সম্যক্ সংকল্প—জৈনদের ব্রতের অনুরূপ। তৃতীয় সম্যক্ বাক্—ইহা হিন্দুদের বাক্‌সংযম, জৈনদের মিথ্যাভাষণ পরিত্যাগ ইত্যাদির মতো। চতুর্থ, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ জীবন, সম্যক্ চেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি ও সমাধি ইত্যাদি। ইহাদের পৃথক্ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আদর্শের উপলব্ধি হইলে এ সকলের কথা আপনি মনে আসিবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে প্রজ্ঞা, সমাধি, ও শীল—জ্ঞান, ধ্যান ও চারিত্র—ইহাই বুদ্ধের ধর্মের

সার কথা। বৈদিক ধর্ম যে-পরিমাণে যজ্ঞাদি কর্মকে বড়ো মনে করিয়াছে, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম সেই পরিমাণে বৈদিক কর্ম পরিত্যাগ করিয়া চারিত্রকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছে। তথাকথিত নাস্তিকদের বেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ও সংগ্রামের সুফল যাহা হইয়াছিল তাহা এই চারিত্র-নীতির আদর্শে প্রকাশ পাইয়াছে।

জৈন ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মই ভোগ অপেক্ষা ত্যাগকে অনেক বড়ো মনে করিয়াছে। সেইজন্য উভয়ত্রই সংসারত্যাগী অগৃহী সন্ন্যাসী-জীবনের মূল্য বেশি। সন্ন্যাসীদের—ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের—সংঘ গঠন বৌদ্ধ ধর্মের একটা বৈশিষ্ট্য। এই ব্যাপারে জৈন ধর্ম ততদূর অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সন্ন্যাস হিন্দুদের বর্ণাশ্রম ধর্মেও বিহিত আছে, কিন্তু উহা জীবনের চতুর্থ এবং শেষ অধ্যায়। যদিও জাবাল-শ্রুতি বলিয়াছে 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'—যেদিন বৈরাগ্য মনে আসিবে, সেইদিনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে,—তথাপি উহা সাধারণ বিধি নয়। সাধারণ বিধি, ব্রহ্মচর্যের পর গৃহী হইবে, তাহার পর 'বনী' এবং সর্বশেষে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। কাজেই শংকর যে ব্রহ্মচর্যের পরই সন্ন্যাস লইয়াছিলেন তাহা জাবাল-শ্রুতির অনুমত হইলেও শ্রুতি-স্মৃতির সাধারণ বিধি নহে। সেখান হইতে আরম্ভ করিয়া চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত—এবং পরেও অগ্রসর হইয়া খ্রীস্টীয় বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত—এই সন্ন্যাস গ্রহণ ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠনের ভিতর কোনো বৌদ্ধ প্রভাব নাই, ইতিহাসের পক্ষে সেকথা বলা বোধ হয় কঠিন। হিন্দুর সন্ন্যাস-বিধিতে 'সংঘ' করিয়া থাকার কোনো বিধি নাই। উহা বুদ্ধের নিয়ম। জৈনদের 'ত্রিরত্নে'র মতো বৌদ্ধেরা বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের কথা বিশেষ করিয়া স্মরণ করে।

রাজারাও বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা সম্রাট অশোক।

কিন্তু সন্ন্যাসীদের সংঘেই উহাব পরিণতি এবং তাহাদের দ্বারাই উহার বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। আর, উহাদের 'বিহারে'ই বিদ্যার কেন্দ্র—দর্শনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

জৈনধর্ম যেমন গোড়ার দিকেই শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায়, বৌদ্ধধর্মেও তেমনই বুদ্ধেব তিরোভাবের খুব বেশী পরে নয়—'হীনযান' ও 'মহাযান' নামক দুইটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। 'হীনযান' উত্তর-ভারতে আর 'মহাযান' দক্ষিণে এবং চীনে, তিব্বতে এবং লঙ্কায় ছড়াইযা পড়ে। উভযের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, হীনযানের মতে মানুষের পক্ষে মানুষের নিজের মুক্তির চিন্তাই যথেষ্ট, কিন্তু মহাযানের মতে জগতের মুক্তিই আসল কাম্য। 'হীন' আর 'মহা' এই দুইটি বিশেষণ দ্বারা এই উদ্দেশ্যের ছোট-বড়র কথাটাই বুঝানো হয। 'যান' অর্থ যাহা দ্বারা যাওয়া যায। ক্ষুদ্র যানের গন্তব্য ছোটো; আর মহাযানের লক্ষ্য বৃহৎ। নাম দুইটির এই অর্থ হইতে মনে হয়, উহা মহাযানিকদেরই সৃষ্টি; কারণ সাধারণ গৃহীত অর্থে মহাযানের শ্রেষ্ঠত্বই সূচিত হয়।

এই প্রভেদ ক্রমে তীব্রতর হয; ধর্মে সর্বত্রই এইরূপ ঘটে। আচার, অনুষ্ঠান, নিয়ম ইত্যাদি নানাদিকে ইহাদের প্রভেদ প্রকাশ পাইতে থাকে। ফলে, উভযের সংঘর্ষও অনিবার্য হইয়া দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত উভয়ের প্রতিবেশীরূপে বাস করাও অসম্ভব হইয়া উঠে; উভযের বাসস্থানও পৃথক্ হইযা যায়; উত্তর-ভারতে হীনযান আর বহির্ভারতে মহাযান আবাস করিযা লয়।

মহাযানের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, প্রত্যেক বুদ্ধ প্রভৃতির কল্পনা কতকটা ঈশ্বরের ও দেবদেবীর স্থান পূরণ করে; আর, ব্যক্তির উদ্ধারের অপেক্ষা সমস্ত জীব ও জগতের উদ্ধার কাম্য

বলিয়া ঘোষণা করিয়া উহা সহজেই একটা আন্তর্জাতিক স্থান অধিকার করে; এবং ফলে ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন জাতিকে সহজেই আপন করিয়া লইতে পারে। হীনযান ও মহাযানের প্রভেদ মূলত ধর্মাচারের প্রভেদ, দর্শনের নয়; সুতরাং আমাদের পক্ষে উহা খুব জরুরি বিষয় নয়।

বৌদ্ধধর্ম কেন ভারতে টিঁকিতে পারিল না, সে কথার উত্তর ইতিহাস দিবে। বেদের বিরুদ্ধে এবং বর্ণভেদের বিরুদ্ধে বুদ্ধের মনোভাব প্রথম হইতেই অনমনীয় ছিল; পরবর্তীদের মধ্যেও ইহার কোনো পরিবর্তন দেখা যায় নাই। জৈনদের সঙ্গে হিন্দুদের কলহ কোনোদিনই এত প্রবল হয় নাই, বৌদ্ধদের সঙ্গে যতটা হইয়াছিল। কাজেই সর্বগ্রাসী সংগ্রামের পরাজয়ের ফলে যাহা হয়, বৌদ্ধদের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধেরাই কেন পরাজিত হইল হিন্দুরা কেন হইল না—সমগ্র-ভারত কেন বৌদ্ধ হইয়া গেল না—অশোকের মতো সম্রাটও কেন উহাকে সকলের ধর্ম করিতে পারিলেন না—ইহার সাম্য-নীতি, ইহার উচ্চ চারিত্রের আদর্শ সত্ত্বেও কেন সাধারণ-লোকে বেদের প্রাধান্য—ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য—পুনবার মানিয়া লইল, এক কথায় তাহার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়; আর আমাদের পক্ষে উহা প্রয়োজনীয়ও নহে। যাহা ঘটিয়াছে তাহা জানাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। তবে একটা কথা বোধ হয় বলা যায়, যে, এই পরাজয় ধর্মের ক্ষেত্রে ততটা হয় নাই, যতটা হইয়াছে দর্শনের আঙিনায়। উভয়ত্রই বৌদ্ধ মতের একটা অপূর্ণতা ছিল, যেজন্য উহা পরাজিত হয়।

বুদ্ধের ধর্মে একটা অপূর্ণতা ছিল। উহা জ্ঞানী এবং উচ্চ চরিত্রবানের কাছে যতই মূল্যবান্ হউক না কেন, সাধারণ লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই। প্রাকৃত জন ভবিষ্যতের আশায় জীবন ধারণ করে; স্বর্গবাসের আশায় সে কঠোর তপস্যাও করিতে পারে।

কিন্তু কোনো ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষাকেও যদি 'তৃষ্ণা' বলিয়া বর্জন করিতে হয়, তবে মানুষ ধর্ম অনুসরণ করিবে কেন। বৈদিক ধর্ম স্বর্গের লোভে লোককে সহজেই কর্মে প্রবৃত্ত করিতে পারিয়াছিল। ইন্দ্রত্ব-দেবরাজত্ব —নিশ্চয়ই লোভনীয় বস্তু; দেবত্বও লোভের অযোগ্য নয়; শুধু স্বর্গবাসও আকাঙ্ক্ষণীয়। স্বর্গের কত বর্ণনা পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। তাহাতে কি সাধারণ মানুষের মন একেবারেই প্রলুব্ধ হয় না? সুতরাং বৈদিক ধর্ম যে মানুষের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল তাহাতে আর আশ্চর্য কী। জগতের অন্যান্য ধর্মও তেমনই স্বর্গ ও নরকের কথা তুলিয়াছে, লোকের চিত্ত ধর্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য। আর বুদ্ধ? স্বর্গলোভও লোভ, সুতরাং ত্যাজ্য। ইহাতে কি সাধারণের চিত্ত দ্রব হইতে পারে। স্বর্গবাসের অধিক মোক্ষ, একথা উপনিষদ্ ও বেদান্ত বলিয়াছে। সে অবস্থায় আত্মা একটা অনাবিল আনন্দ নিত্যকাল ভোগ করে। ইহার প্রাপ্তির জন্য মানুষ দর্শনে প্রবৃত্ত হইতে পারে এবং হইয়াছেও। কিন্তু বুদ্ধ? নিত্যকাল আনন্দ উপভোগ করিবে, এরূপ নিত্য আত্মাও তো তাহার মতে নাই। তৈল ও বর্তির সংযোগে প্রদীপ জ্বলে—উহাদের অভাব হইলে নিভিয়া যায়। আত্মা নামক যে জিনিস সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে, তাহারও 'নির্বাণ'ই চরম গতি ও পরিণতি! এই সব কারণে নৈতিক আদর্শের তুঙ্গতা সত্ত্বেও বুদ্ধের ধর্ম দীর্ঘকাল লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই। আর প্রতিদ্বন্দ্বীরাও ঠিক এই দুর্বল কোণেই অনবরত আঘাত করিতেছিল; সেইজন্য তাহাদেরই জয় হইয়াছে। বুদ্ধের ধর্মে যেমন বৌদ্ধ দর্শনেও তেমনই একটা দুর্বলতা ছিল, যাহার জন্য উহাও পরাজিত হইয়াছিল। সেই দুর্বলতা কোথায়, দর্শনটির স্বরূপ চিন্তা করিলেই স্পষ্ট হইবে।

দর্শন—প্রমাণ ও প্রমেয়

সাধারণভাবে সমগ্র বৌদ্ধ দর্শনে দুইটিমাত্র প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। জৈনরা বেদ না মানিলেও 'শ্রুত' মানিয়াছে। বৌদ্ধেরা প্রকাশ্যে তাহাও করে নাই। কার্যত বুদ্ধের বাণী বলিয়া গৃহীত যাহা তাহা অতিক্রম করিয়া চিন্তাকে অগ্রসর হইতে না দিলেও বুদ্ধের বাণী 'শ্রুতি' বা 'শ্রুত'—অর্থাৎ একটা প্রমাণ—জ্ঞানলাভের একটা উপায়—একথা বৌদ্ধদর্শন বলে না। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের স্বরূপ কী—কখন উহারা জ্ঞান হয় আর কখন হয় ভ্রম, ইহাদের ভিত্তি কী—ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন দর্শনে উঠিয়াছে, বৌদ্ধদর্শনেও উঠিয়াছে। এসব বিচারে 'ধর্মকীর্তি'-প্রণীত 'ন্যায়বিন্দু' একখানা প্রামাণ্য গ্রন্থ। বৌদ্ধদের মতে প্রত্যক্ষ চারি প্রকার—ইন্দ্রিয়-জ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, আত্ম-সংবেদন ও যোগ-জ্ঞান; ইন্দ্রিয় সাহায্যে লব্ধজ্ঞান প্রত্যক্ষ, তাহা সকলেই মানে। কিন্তু ইন্দ্রিয় একটা জিনিস দেখিলে কিংবা স্পর্শ করিলে আর-একটা জিনিসের জ্ঞানও মনে আসিতে পারে; তাহাও প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ জ্ঞান, কিন্তু ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান নহে; ইহাই 'মনোবিজ্ঞান'। আর নিজের সুখ দুঃখের জ্ঞানও প্রত্যক্ষ, অথচ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান নয়; এবং এই জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞাতা আত্মাকেও জানে—আমি 'সুখী', এইরূপ প্রতীতি হয়, সেইজন্য ইহার নাম 'আত্মসংবেদন'। আর যোগীরা—জৈনদের ভাষায় 'কেবলী'রা—যে অনেক অতীন্দ্রিয় বস্তু প্রত্যক্ষ করেন তাহা প্রসিদ্ধ; যোগীরাই শুধু উহা পান বলিয়া এই প্রত্যক্ষকে যোগি-প্রত্যক্ষ বলা হয়। এই চার প্রকার সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান; ইহা জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা না করিয়াই উৎপন্ন হয়।

অনুমান দুই প্রকার—স্বার্থ ও পরার্থ। ধূম দেখিয়া আমি যখন

জানি যে ঐ জায়গায় আগুন আছে, সুতরাং জায়গাটা গরম, সুতরাং ঐ খানে ঠাণ্ডা নাই, ইত্যাদি, তখন আমি নিজের জন্য অনুমান করি, পরকে বুঝাইবার জন্য নয়। ইহা স্বার্থ অনুমান। আবার, যে যুক্তিতে নিজে অগ্নির অস্তিত্ব জানিয়াছি তাহাই যখন বাক্যে প্রকাশ করিয়া পরকে বুঝাইতে চাই, তখন ঐ অনুমান হয 'পরার্থ'। প্রথমটিতে নিজের জানা দ্বিতীয়টিতে প্রতিবাদীকে স্বমতে আনয়ন করা, এইটি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য। 'পরার্থ' অনুমান তর্কে বা বাদে ব্যবহৃত হয়; আর তাহাতে বাদী প্রতিবাদী উভয়েরই বাক্য ও পদ একার্থে ব্যবহার করিতে হয; কোনো পদ দুইজন দুই অর্থে ব্যবহার করিলে চলিবে না; আর উভয়ের স্বীকৃত একটা সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তর্ক অন্য সিদ্ধান্তে অগ্রসর হইতে পারে না। যাঁহারা তর্ক করেন তাঁহারা এই সব জিনিস সহজেই বুঝিবেন।

প্রমাণ ও প্রমেযের মধ্যে সম্পর্ক এই যে, প্রমাণ ছাড়া প্রমেযের জ্ঞান হয না। কিন্তু প্রমাণের অভাব হইলেই প্রমেয থাকে না এমন নয়। আমি দেখিতেছি না, সুতরাং আমি জানিতেছি না; কিন্তু আমার অদৃষ্ট বস্তু থাকিতে পারে। অনুমানের বেলাযও তাহাই। আমার অনুমান হইতেছে না, সুতরাং আমার জানা হইতেছে না; কিন্তু অনুমেয বস্তু নাই, একথা বলিবার অধিকার আমার নাই।

বৌদ্ধেরা এসব আলোচনায যাহা বলিয়াছে, তাহা আধুনিক শ্রেষ্ঠ চিন্তার সহিত তুলিত হওযার স্পর্ধা করিতে পারে। আমাদের আলোচনার পরিসরের মধ্যে সে সকলের স্থান করা সম্ভব নয়। তবে এই সব বিচারের কোনো দিকই বৌদ্ধদের বুদ্ধির অগোচরে পড়িয়া থাকে নাই, ইহা অনেক সমালোচকেই স্বীকার করিযাছেন, আমরাও করিতে বাধ্য।

নাস্তিক দর্শন

প্রমেয়

বৌদ্ধদের ঈশ্বর নাই ; সুতরাং একটা বড়ো প্রমেয়-বস্তুর বিচার হইতে তাহারা আমাদিগকে অব্যাহতি দিয়াছে। শুধু জীব বা আত্মা এবং জগতের কথাই তাহারা আলোচনা করিয়াছে ; এই আলোচনা সত্যসত্যই অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে হইয়াছে ; এবং সূক্ষ্মভাবে হইয়াছে বলিয়াই মতভেদও সম্ভব হইয়াছে। শংকরের দিগ্বিজয়ের পর, অর্থাৎ খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধদর্শন ভারতে নিষ্প্রভ হইতে আরম্ভ হয়, তাহার পর আস্তে আস্তে নিভিয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলেও হাজার বৎসরেরও অধিক কাল এই দর্শন প্রবল শক্তিতে ভারতের চিন্তাকে আলোড়িত করিয়াছে ; এই হাজার বৎসরের সমস্ত চিন্তা সংক্ষেপে সংগ্রহ করিতে গেলে কিছু আমাদিগকে বাদ দিতেই হইবে।

বুদ্ধ নিজে দার্শনিক গবেষণা অপেক্ষা উচ্চ চরিত্র গঠনের বেশী পক্ষপাতী ছিলেন। সেইজন্য তিনি অনেকবার সূক্ষ্ম দার্শনিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াও উত্তর না দিয়া সেগুলিকে অনাবশ্যক জিজ্ঞাসা বলিয়াছেন। জগৎ নিত্য না অনিত্য, আত্মার পরলোক আছে কিনা, এসব প্রশ্ন তাঁহার শিক্ষায় নিষ্প্রয়োজন জিজ্ঞাসা। তথাপি তাঁহার শিক্ষা ও ধর্ম যাহারা গ্রহণ করিযাছিল তাহাদিগকে এই সকল প্রশ্নের বিচার করিতে হইয়াছিল এবং উত্তরও দিতে হইয়াছিল। এই উত্তরের মধ্যে কয়েকটা জিনিস অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠে।

প্রতীত্য-সমুৎপাদ

কোনো প্রশ্নের মীমাংসা না করিলেও একটা জিনিস আমাদের সকলেরই চোখে পড়িবে যে, জগতে একটা প্রবাহ রহিয়াছে ; এবং যতদূর দেখা যায়, উহা অনাদি ও অনন্ত। জীবনে বাল্যের পর কৈশোর, যৌবন,

বার্ধক্য ও মৃত্যু আসে। বাহ্য জগতে গ্রীষ্মের পর বর্ষা ইত্যাদি। এই ভাবে একটি ক্ষুদ্র কীটাণুর জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া বিশাল বিশ্বের চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র-মণ্ডল প্রভৃতি সর্বত্র একটা প্রবাহ—ঘটনার পর ঘটনা—একটা বিরাট পরম্পরা—একটা অপরিমেয় পরিবর্তন স্রোত দেখা যায়। ইহার ভিতর নিত্য কিছু আছে কি। বৌদ্ধদের উত্তর, সব ক্ষণস্থায়ী—'সর্বং ক্ষণিকং'।

দ্বিতীয়ত, এই ক্ষণিক বস্তুর প্রবাহের ভিতর যখন যাহা আবির্ভূত হয়, তাহা তাহার পূর্বে আগত ঘটনা-স্রোতের ফল—স্বাধীন বা স্বয়ম্ভু নয়—কারণ ছাড়া উৎপন্ন নয়। প্রত্যেকেরই কারণ আছে এবং এই কারণ স্রোতের পূর্বাংশে বর্তমান ছিল। সুতরাং সমস্ত কিছুরই আবির্ভাব বা 'সমুৎপাদ' পূর্ব আবির্ভূত ঘটনা হইতে সঞ্জাত—উহা হইতে প্রতীত্য আসিয়া সমুৎপন্ন হয়। এই বাদের নাম 'প্রতীত্য-সমুৎপাদ'। এই মত অনুসারে ঈশ্বর-কর্তৃত্ব, ব্রহ্ম-স্রষ্টৃত্ব, আরম্ভবাদ ইত্যাদি মত পরিহৃত হয়।

জৈনদের 'স্যাদ্‌বাদ' যেমন তাহাদের সম্যক্ চিন্তাকে একটা বিশিষ্ট আকার দিয়াছে, উহাকে 'অনেকান্তবাদে' পর্যবসিত করিয়াছে, তেমনই বৌদ্ধদের এই 'প্রতীত্য-সমুৎপাদ-বাদ'ও তাহাদের দর্শনকে একটা বিশিষ্ট আকার দিয়াছে। স্বয়ম্ভূ, স্বয়ংসিদ্ধ কিছু নাই, এইটি ধরিয়া লইয়া যেখান হইতেই আমরা আমাদের চিন্তা শুরু করি না কেন, একটা কার্য-কারণের প্রবাহে আমাদিগকে পড়িতেই হইবে। আরম্ভ করিব কোথায়? জগতে যদি সকল অপেক্ষা সত্য কিছু থাকে তবে সেটি বৌদ্ধদের মতে দুঃখ। "সর্বং দুঃখং দুঃখং"। জীবনে রোগ, জরা, মৃত্যু ইত্যাদি সহজ দৃষ্টান্ত। এ সকল এবং আরও শত শত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে দুঃখ জগতে রহিয়াছে। কার্য-কারণের

স্বীকৃত প্রবাহ অনুসারে এই দুঃখের একটা কারণ নিশ্চিত রহিয়াছে। এই ভাবেই বৌদ্ধ-দর্শনের স্রোত আরম্ভ হয়। ইহাতে এই দুঃখ-বাদ সর্বত্র পরিস্ফুট রহিয়াছে।

এই দুঃখের কারণ খুঁজিতে গিয়া বৌদ্ধ-দর্শন বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান স্বীকৃতি কর্মবাদকেই সমর্থন করিয়াছে। মানুষের কৃত কর্ম একটা জাগতিক ব্যাপার; অন্যান্য জাগতিক ব্যাপারের ন্যায় ইহারও উৎপত্তি হয়, ইহারও ফল বা কার্য আছে, আর সেই কার্য উৎপন্ন হইবার পর ইহারও বিলয় হয়। কর্ম হইতে সৃষ্ট হয় বন্ধ—বন্ধ হইতে হয় দুঃখ। এই সকলের মধ্যে আরও সূক্ষ্ম স্তর-ভেদ আছে; সাধারণ দৃষ্টিতে এই পর্যন্ত সহজেই দেখা যায়।

এই বন্ধ হয় কার? আমরা সাধারণ ভাবে বলি আত্মার। জৈনরাও তাহাই বলে। ইহার অর্থ এই যে দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে এবং এই দেহের পর দেহান্তরে সে গমন করে। কিন্তু বৌদ্ধদের মতে স্থির দেহাতিরিক্ত কোনো আত্মা নাই। যাহাকে আমরা আত্মা বলি, তাহাও একটা প্রবাহ মাত্র; অনুভূতির পর অনুভূতি, সুখের পর দুঃখ, বাসনার পর বাসনা—এই ভাবে চলিতেছে একটা প্রবাহ। নদীর স্রোত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত জল যেমন একটু ঘোলাটে থাকেই, তেমনই এই স্রোতও রুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত দুঃখ থাকেই। যাহারা নিষ্কৃতি চায় তাহাদের কর্তব্য এই স্রোত রোধ করা—এই প্রবাহ বন্ধ করা। বাসনাকে নির্মূল করিতে পারিলেই এই প্রবাহ থামিয়া যায়। ইহার জন্য প্রয়োজন সম্যক্ জ্ঞান; অর্থাৎ জানিয়া ফেলা দরকার যে আত্মা নামক স্থির কোনো পদার্থ নাই; আর সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত আত্মার আবেষ্টন জগৎটি কী তাহাও বুঝা দরকার।

জগৎ

একটা বিচিত্র, বহুধা-প্রতিভাত আবেষ্টনের মধ্যে আমরা বাস করি এবং এইটিকেই আমাদের জগৎ বলিয়া জানি। কিন্তু মানুষের জ্ঞানে কত ভুল থাকে, জগতের জ্ঞান কি আমরা ঠিক ঠিক পাই? কত বস্তু আমাদের চারিদিকে রহিয়াছে, নীল আকাশ, সুনীল জলধি, উত্তুঙ্গ পর্বত, বৃক্ষ লতা ইত্যাদি; সাধারণ জ্ঞানে ইহাদিগকেই বাহ্য বস্তু বলে এবং সাধারণ জ্ঞান ইহাদিগকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু ইহারা সত্য কি।

এইখানে বৌদ্ধ-দর্শন চারিটি শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার দুইটি হীনযানের আর দুইটি মহাযানের অন্তর্গত। বাহ্যজগৎ আমরা কিভাবে এবং কতটুকু জানি, ইহাই প্রশ্ন। উত্তরে কেহ কেহ বলিয়াছেন, উহা যেমন ঠিক তেমনই আমরা জানি এবং প্রত্যক্ষ দ্বারা জানি। আবার, কেহ কেহ বলিয়াছেন, আমরা জানি ঠিকই, তবে প্রত্যক্ষ দ্বারা নয়, অনুমানে। বাহ্যবস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ে যে ক্রিয়া করে তাহা হইতে আমরা ঐ সব বস্তুর অস্তিত্ব অনুমান করি। যেমন, হঠাৎ কানে কী ঘটিল; চিন্তা করিলাম, এবং জানিলাম বাহির হইতে আগত একটা শক্তির—বাহিরে ঘটিত একটা ঘটনার ইহা ফল, নাম দিলাম 'শব্দ'। এই অনুমানে শব্দের অস্তিত্ব জানিলাম। অন্যান্য বাহ্য পদার্থও এইরূপ অনুমানের সাহায্যেই আমরা জানি। প্রথমে-উক্ত শাখার নাম 'বৈভাষিক', আর দ্বিতীয়টির নাম 'সৌত্রান্তিক'। ইহারা হীনযানের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদিগকে 'সর্বাস্তি-বাদী'ও বলা হয়; কারণ, ইহারা উভয়েই সব বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে—বাহ্য জগৎ ও অভ্যন্তর আত্মা, দুই-ই স্বীকার করে। কিন্তু ইহাদের স্বীকৃত বস্তু

সবই 'স্ব-লক্ষণ'—অর্থাৎ প্রত্যেক অনুভূতির বিষয়টি পৃথক্ এবং একক—কোনো জাতির অন্তর্গত নয়। আমি দেখি 'ইহা'—একটি মাত্র পদার্থ; যখন বলি 'বৃক্ষ', তখন উহাকে বৃক্ষ-নামক জাতির অন্তর্গত করিয়া লই; এটি আমার নিজের কৃতিত্ব, কিন্তু সত্য নয়, ভ্রান্ত, একটু বেশী বলা। প্রত্যেক বস্তুই কোনো-এক মুহূর্তে একটি ক্ষণিক পদার্থ মাত্র; চিরস্থায়ী কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়। সেইজন্য বলা হয় 'সর্বং স্বলক্ষণং'—প্রত্যেকেরই নিজের লক্ষণই লক্ষণ।

ইহাও বলা চলে এবং বলা হইয়াছে যে, বাহ্য জগৎ নাই—অলীক—শুধু আমাদের বিজ্ঞানপ্রসূত সৃষ্টি মাত্র—আমাদের চিন্তা হইতে উদ্ভূত। ইহার নাম 'বিজ্ঞানবাদ' এবং এই শাখার নাম 'যোগাচার'। এই মত-অনুসারে জ্ঞাত জগৎ অলীক, কিন্তু জ্ঞাতা আত্মা সত্য। বিজ্ঞাতা মাকড়সার জাল বুনার মতো নিজের চিন্তাদ্বারা নিজের চারিদিকে একটা কাল্পনিক বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া লয়।

আর-এক ধাপ উপরে উঠিলেই মনে হইতে পারে, জগৎ যদি কাল্পনিক প্রবাহ মাত্র হয়, তবে আত্মাকে স্থায়ী মনে করিবারই বা এমন কী অকাট্য যুক্তি থাকিতে পারে। সুতরাং 'সব শূন্য'—'সর্বং শূন্যং'; জগৎ নাই, আত্মা নাই,—আছে শুধু একটা অলীক প্রবাহ—ভিতরে বাহিরে একটা বিরাট ইন্দ্রজাল। কুকুরও নাই, ল্যাজও নাই, আছে শুধু নড়ন—কম্পন! যে শাখা এই মত পোষণ করিতেন তাঁহাদিগকে বলিত 'মাধ্যমিক'। যোগাচার ও মাধ্যমিক শাখা মহাযানের অন্তর্গত।

সমস্ত একত্রে লইলে বৌদ্ধদের সিদ্ধান্ত যাহা দাঁড়ায়, তাহাকে মাধবাচার্য 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' 'ভাবনা-চতুষ্টয়' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সমস্ত ক্ষণিক, সমস্তই দুঃখময়, সমস্তই স্বলক্ষণ এবং সমস্তই শূন্য—এই চারিটি 'ভাবনা'।

'বৈভাষিক' প্রভৃতি চারিটি নামেরও হেতু আছে। নামকরণ বিনা অর্থে হয় না। ইহাদের সকলেরই মূল উৎস বুদ্ধের বাণী। কিন্তু এক-এক শাখা উহার এক-একটা দিকের উপর দৃষ্টি দিয়াছে বেশী। এই সব পার্থক্য বুঝাইবার জন্যই হয় নিজেরাই ঐ সব নাম গ্রহণ করিয়াছিল কিংবা অন্যে দিয়াছিল। নামের ইতিহাসটা আমাদের এখানে খুব আবশ্যকীয় নয়।

এই চারিটি দার্শনিক ধারার বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে, বৌদ্ধদর্শনে প্রমাণ আছে কিন্তু প্রমেয় নাই। জীব, জগৎ ও ঈশ্বর, কোনটিই সত্য নয়। ঈশ্বর তো নাই-ই ; মহাযানিকেরা কেবল 'বোধিসত্ত্ব' স্বীকার করিয়াছে অথবা বুদ্ধকেই ঈশ্বর করিয়া লইয়াছে। জীব ও জগতের ভাগ্যে স্থিরত্ব ও স্থায়িত্ব নাই। বৌদ্ধদর্শনে প্রবল, তীব্র চিন্তা আছে, কিন্তু শেষ ফল 'শূন্য'। উগ্র নৈতিক আকাঙ্ক্ষা আছে, সমাপ্তি 'নির্বাণ'। বৈচিত্র্য ও প্রগাঢ়তা যথেষ্ট আছে, কিন্তু মানবাত্মার আশ্রয় কিছুই নাই। এককথায় বৌদ্ধদর্শনের সার বলিতে হইলে ইহাই আমাদিগকে বলিতে হয়।

কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত হইবে যে, যত সংক্ষেপে আমরা সার সংগ্রহ করিয়াছি, আসল আলোচনা তত সংক্ষিপ্ত নয়। দীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, এই সব চিন্তাধারা পুষ্টি লাভ করিয়াছে। কত যুক্তি-তর্ক, কত অন্যমত নিরসন ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে। বৌদ্ধ-দর্শনের বৈচিত্র্য ঠিক ঐখানেই। আর-একটা কথা। বৌদ্ধদর্শনের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় যেসব মতবাদ প্রকাশ পাইয়াছে, এবং অতি সূক্ষ্ম ভাবে বিচারিত হইয়াছে, তাহাদের সবগুলিই কোনো-না-কোনো রকমে

বিগত পাঁচ শত বৎসরের প্রতীচ্য চিন্তায়ও দেখা দিযাছে। বড়ো গৌরবের বিষয় এই যে, দর্শনে আজ প্রতীচী যে গৌরব অর্জন করিতেছে, তাহার অনুরূপ কৃতিত্ব দুই হাজার বৎসর আগে ভারতের মনীষীরাও অর্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের পতন আরম্ভ হয়। বড়ো বাড়ি যখন ভাঙিয়া পড়ে, তখন তাহার মহৎ রূপ লোপ পায়—থাকে শুধু ভগ্নস্তূপ আর জঞ্জাল ও আবর্জনা। পতনের সময় বৌদ্ধধর্মেও তেমনই আবির্ভূত হয় তন্ত্র। এই ব্যাপারে হিন্দুদেরও যথেষ্ট কৃতিত্ব রহিয়াছে, বিশেষত বাংলায়। কে কাহাকে উৎসাহিত ও পরিচালিত করিয়াছিল, বলা কঠিন; পারস্পরিক সহাযতা হওয়াও খুব সম্ভব। যাহা আবির্ভূত হইয়াছিল তাহা অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে। এই তন্ত্রের কথা আমরা পরে আবার তুলিব।

নাস্তিক দর্শনের দান

নাস্তিকদের নাস্তিক্য কোথায় তাহা এতক্ষণে আমাদের কাছে স্পষ্ট হওয়ার কথা। বেদ, বেদের পশুঘাত, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি মতের বিরুদ্ধ বলিয়াই নাস্তিকদিগকে আস্তিকেরা ঐ নাম দিয়াছে। কিন্তু নাস্তিকদের মধ্যেও মতভেদ আছে। চার্বাকের মত জৈন ও বৌদ্ধ কেহই গ্রহণ করে নাই। জৈন ও বৌদ্ধদের মধ্যেও প্রভেদ রহিযাছে—মূলগত মতভেদ রহিয়াছে। জৈনরা গাছে পাথরে জীব বা আত্মা দেখে আর বৌদ্ধদের মতে আত্মাই নাই। এই সব তর্কে উপহাস সব সময় বর্জিত হয় নাই। জৈনরা বলে তরুর চৈতন্য আছে, কেননা, সে মরে; বৌদ্ধ ধর্মোত্তর বলেন, জৈনরা মরণ মানেই জানে না—'মরণং ন জ্ঞাতং' (ন্যায়বিন্দু টীকা, ৩।৬১)। আবার জৈন

হেমচন্দ্র সুগতের (বুদ্ধের) মতকে ইন্দ্রজাল বলিয়াছেন—বিলূনশীর্ণং সুগতেন্দ্রজালং'—(অন্যযোগব্যবচ্ছেদিকা, ১৬)। কিন্তু এই সমস্ত মতানৈক্য সত্ত্বেও বেদের বিরুদ্ধে তাঁহারা সকলে একমত।

ইহার ফলে আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনের মধ্যে যে সহস্রাধিক বৎসর ব্যাপী সংগ্রাম ঘটিয়াছিল তাহাতে উভয়পক্ষে শক্তিক্ষয় যেমন হইয়াছে, শক্তিলাভও কম হয় নাই। তর্কযুদ্ধে উভয় পক্ষই শাণিত অস্ত্র ব্যবহার করিতেন। ইহাতে তর্কবিদ্যার প্রচুর উন্নতি হইয়াছে; ইহা উভয় পক্ষের কৃতিত্ব, কিন্তু এখন ভারতের সাধারণ সম্পত্তি। আর, বেদের ধর্ম যদিও লুপ্ত হয় নাই, তথাপি উহা সংস্কৃত ও পরিবর্তিত হইয়াছে। পশুবলি অবশ্যই কোনো-না-কোনো রকমে এখনও হিন্দুধর্মে বর্তমান, কিন্তু অহিংসার শ্রেষ্ঠত্বও একই সঙ্গে স্বীকৃত। সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতির প্রশংসা আস্তিকেরা করে নাই এমন নয়; কিন্তু নাস্তিকেরা বোধ হয় বেশী করিয়াছে; জন্মগত শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করিয়া চারিত্রের মূল্য তাহারা বেশী দিয়াছে।

তর্কে ও ধর্মে দানই নাস্তিকদের একমাত্র দান নয়। যাজ্ঞিক ক্রিয়া দ্বারা স্বর্গলাভ অপেক্ষা মোক্ষ শ্রেষ্ঠ, একথা উপনিষদে পাই; কিন্তু বুদ্ধ স্বর্গের লোভ এবং মোক্ষের লোভকে লোভ বলিয়া ঘোষণা করিয়া মানুষের আদর্শকে আরও ঊর্ধ্বে তুলিয়াছেন। নাস্তিক কথাটা প্রথমে অবশ্যই ঘৃণা ও অবহেলা প্রকাশ করিবার জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনকে জানিয়া আর তাহাদিগকে অবহেলা করা চলে না।

আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম বাহির হইতে আসে নাই। যে আর্য সমাজ ভারতে—বিশেষত গঙ্গার দুইধারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—যাহাদের মধ্যে যজ্ঞ ও সত্র সমাধানের পর পণ্ডিতেরা

বসিয়া উপনিষদের আলোচ্য বিষয়ে বিচার করিতেন, যাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি বর্ণ বর্তমান ছিল—সেই আর্য সমাজেরই অন্তর্গত দুইটি ক্ষত্র-বংশের অবতংস এই দুইটি ধর্ম প্রবর্তিত করেন। ইহারা পরে বিদ্রোহের আকার ধারণ করিলেও আদিতে সংস্কারের চেষ্টাই ছিল; এবং সমাজে তখন এই সংস্কার প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই এত সহজে ধর্ম দুইটি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এই সংস্কারের চেষ্টার ভিতর দিয়া ভারতের আর্য মন আপন সমাজের দোষ আপনি সংশোধন করিতে চাহিয়াছিল। জয়-পরাজয়ের কথাটা তেমন বড়ো নয়; কিন্তু এই সংস্কার-চেষ্টা যে জীবনের আদর্শকে উচ্চতর করিয়া দিয়াছে, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই।

৩

আস্তিক দর্শন—১

বেদে বিশ্বাস আছে এই কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়াই আস্তিক দর্শনগুলি ঐ আখ্যা গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু বিশ্বাস সকলেরই সমান, এই কথা অতিবড় মিত্রও বলিবে না। ছয়টি আস্তিক দর্শনের মধ্যে মীমাংসা ও বেদান্ত সত্যসত্যই বেদে বিশ্বাসী; শুধু বিশ্বাসী নয়, বেদের বাক্যের উপর তাহাদের প্রতিষ্ঠা। আর চারিটি অনেকটা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়াছে; কিন্তু শব্দ বা শ্রুতিকে একটা পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি বেশী প্রাচীন জোর করিয়া বলা শক্ত। তবে, প্রভাব কোন্‌টির বেশী হইয়াছিল এবং বড়ো সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে কোন্-কোন্‌টি, তাহা আমরা প্রাপ্ত গ্রন্থাদি হইতে বিচার করিতে পারি। সাংখ্যের মত মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থে এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে নানাভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে। কিন্তু সাংখ্যের সাহিত্য খুব বড়ো নয়; ভাষ্য, টীকা ইত্যাদি অনেক নয়। সাহিত্য এবং প্রভাব দুই-ই অত্যন্ত বেশী হইয়াছিল বেদান্তের। তাহার পর ন্যায় ও মীমাংসার নাম করা চলে। এসব কথা আবার প্রত্যেকের পৃথক্ আলোচনার সময় উঠিবে।

বেদ-বিশ্বাসী দর্শন বেদান্ত নাস্তিক দর্শনের সঙ্গে মীমাংসা ছাড়া বাকি চারিটি আস্তিক দর্শনকেও ভ্রান্ত মনে করিয়াছে; এবং যুক্তি দ্বারা ও প্রয়োজনমতো শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া ইহাদের মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বেদান্তের আক্রমণ সর্বাপেক্ষা তীব্র হইয়াছে সাংখ্যের

উপর। সাংখ্যও স্বপক্ষে কয়েকটি উপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত করিতে পারে এবং করিয়াছেও। বেদান্ত সেইগুলির অন্তরূপ অর্থাৎ সাংখ্য-বিরোধী অর্থ করিয়াছে। বাক্যগুলির আপাত-গম্য অর্থ হইতে মনে হয়, সাংখ্যের মত একেবারে অর্বাচীন নয়; উপনিষদাদিতেও ইহার আভাস আছে। এই সব কারণে আমরা সাংখ্যের কথাই আগে তুলিতেছি।

১. সাংখ্য দর্শন

সাংখ্যের মৌলিক গ্রন্থ আমরা মাত্র তিনটি পাই; 'তত্ত্ব-সমাস' নামক ২২টি সূত্র, ঈশ্বরকৃষ্ণের ৭০টি কারিকা, আর 'সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র' নামক বৃহত্তর সূত্র-গ্রন্থ। ইহাদের মধ্যে 'সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র' অত্যন্ত অর্বাচীন গ্রন্থ;—খ্রীঃ ৯ম শতাব্দীর—কাহারও কাহারও মতে আরও প্ররে—১৪শ শতাব্দীর রচনা বলিয়া অনুমিত। ঈশ্ববকৃষ্ণ তাহার কারিকায় 'ষষ্টি-তন্ত্র' নামক একখানা বইযের উল্লেখ করিয়াছেন; এই বইয়ের সারাংশ ঈশ্বরকৃষ্ণই রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু বইটি পাওয়া যায় না। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাও যে খুব প্রাচীন, তাহা নয়; কেহ কেহ ইহাকে খ্রীঃ ৪র্থ শতাব্দীর রচনা মনে করিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরকৃষ্ণ একটা শিষ্য-পরম্পরার উল্লেখ করিয়াছেন; ইহাতে তাঁহার লিখিত মত যে প্রাচীনকাল হইতে আগত, তাহা দ্যোতিত হয়। ৯ম শতাব্দীতে বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্য-কারিকার টীকা লিখেন। ১৬শ শতাব্দীর কাছাকাছি বাঙালী সন্ন্যাসী বিজ্ঞান-ভিক্ষু সাংখ্য-সূত্রের ভাষ্য লিখেন; আর তাঁহার কিছু পূর্বে, হয়তো ১৫শ শতাব্দীতে, অনিরুদ্ধ নামক আর-একজন সাংখ্যের ভাষ্যকার ছিলেন। এই তো প্রায় সাংখ্যের বড়ো বড়ো বই। মোটের উপর সাংখ্য-সাহিত্য খুব বিশাল নয়।

কিন্তু সাংখ্য সম্বন্ধে অন্যদিকে কয়েকটি কথা ভাবিবার আছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা বা প্রবর্তক কপিল ঋষি। ইনি খুবই প্রসিদ্ধ। গীতায় (১০।২৬) ইনি সিদ্ধদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। উপনিষদেও ইঁহার নাম পাওয়া যায় (শ্বেতাশ্বতর; ৫।২)। কিন্তু সংস্কৃতে 'কপিল' শব্দটি তাম্রবর্ণ অর্থে একটি বিশেষণও বটে। অনেকে শ্রুতির 'কপিল' শব্দটি সেই অর্থে গ্রহণ করিতে চান। কিন্তু প্রাণবান্ কপিলের উল্লেখ রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদিতে এত জায়গায় পাওয়া যায় যে, শুধু তাম্রবর্ণেই তাঁহাকে শেষ করা সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া, সাংখ্যের উপদেষ্টা হিসাবে আসুরি, পঞ্চশিখ, প্রভৃতি আরও অনেকের নাম পাওয়া যায়। একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, হিন্দুর (বিশেষত বাঙালী হিন্দুর) তর্পণ-বিধিতে সাংখ্যাচার্যদের তর্পণের ব্যবস্থা আছে; যথা,

"সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ঃ পঞ্চশিখস্তথা;
সর্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।"

এই ক্রমই সাংখ্য প্রবর্তনের ক্রম হইলে কপিলের আগেও সাংখ্যের উপদেষ্টা দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে কে আগে কে পরে, প্রশ্ন তুলিয়া কোনো লাভ নাই; কেননা, মীমাংসা অসম্ভব। এই তালিকাও সর্বত্র এক নয়। সূত্রে (৬।৬৮, ৬৯) পঞ্চশিখ ও সনন্দ বা সনন্দনের নাম আছে; আর, কারিকায় কপিলের শিষ্য আসুরি, আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ, এইরূপ উল্লেখ আছে। সুতরাং প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে কপিলকেই সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক মনে করা ভালো। তবে, তাঁহার পূর্বে ও পরে অনেক মনীষীর সমবেত চেষ্টায়-ই ইহার পরিপুষ্টি হইয়াছে, ইহাও মনে রাখিতে হইবে।

আস্তিক দর্শন

সাংখ্যের প্রভাব ও ইতিহাসের কথা ভাবিবার আগে ইহার মূল বক্তব্য জানিয়া লওয়া দরকার। অবশ্যই এখনও মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা পরিণত দর্শন হইতেই সার সংগ্রহ করিব, পরিণতির ক্রম-বিকাশ দেখানো সম্ভব হইবে না। সাধারণের পক্ষে তাহা প্রযোজনীয় নয়। ক্রমিক বিকাশ সব সময় ধরাও যায় না; আর ধরিতে চেষ্টা করিলে আলোচনা এত জটিলতায পূর্ণ হইয়া যায় যে, শুধু বিশেষজ্ঞই তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন। একটা দৃষ্টান্ত দেই—সাংখ্যে প্রকৃতি ও গুণ-ত্রয়ের কথা আছে; কোথা হইতে আসিল? কী ভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বেদ হইতে—সম্ভব হইলে আবেস্তা হইতে আরম্ভ করিতে হয। উপনিষদে 'প্রকৃতি' শব্দ আছে, কিন্তু তাহার অর্থ লইয়া মতভেদ আছে; কোন্ অর্থ সমীচীন, বিচার ও মীমাংসা করিতে হয়। মহা-ভারতাদি গ্রন্থে সাংখ্যাচার্যদের নাম রহিয়াছে; তাঁহাদের ইতিহাসও খুঁজিতে হয়। জৈন বৌদ্ধদের প্রভাব সম্ভব ছিল কিনা, চিন্তা করিতে হয়। এই ভাবে এক প্রকৃতির কল্পনা ও ইতিহাস বুঝিতেই প্রচুর শ্রম ও সময়ের দরকার। গুণত্রয় সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। এই সমস্তের ক্রম-বিকাশ দেখাইতে গেলে সাধারণ পাঠকের ধৈর্য থাকিবে কিনা সন্দেহ। আমরা দিক্ মাত্র এখানে দেখাইতে পারি। পরিপুষ্ট দর্শনের পশ্চাতে একটা নাতি-হ্রস্ব ইতিহাস রহিয়াছে, এইটুকু জানা থাকিলে অধিকতর জিজ্ঞাসু আকর-গ্রন্থেই প্রবেশ করিতে পারিবেন।

সাংখ্যের মূল বক্তব্য

বৌদ্ধদর্শনে যেমন, সাংখ্যদর্শনেও তেমনই দুঃখ একটি প্রধান স্বীকৃত সত্য। এই দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় তত্ত্বজ্ঞান; সেইজন্যই তত্ত্ব-জ্ঞান বা দর্শনের কথা উঠে। দুঃখ তিন প্রকার; আধ্যাত্মিক,

আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আত্মা বা দেহ-সংঘাতকে আশ্রয় করিয়া যে দুঃখ হয়, তাহা আধ্যাত্মিক; উহা আবার শারীর ও মানস এই দুই প্রকার। ব্যাধি ইত্যাদি দুঃখ শারীর; আর, কামাদি জন্য দুঃখ মানস। ব্যাঘ্র, চোর ইত্যাদিও তো মানুষকে কষ্ট দেয়; ইহার নাম আধিভৌতিক দুঃখ। আর, আগুন, বায়ু ইত্যাদি হইতে যে কষ্ট হয় তাহার নাম আধিদৈবিক। কথা কয়টির কিঞ্চিৎ ভিন্ন অর্থও কেহ কেহ করিয়াছেন; সেটা খুব বড়ো জিনিস নয়। আসল কথাটি এই যে, মানুষ নানা রকমে কষ্ট পায়; সাময়িক ভাবে এই সব কষ্টের উপশম অন্য প্রকারে সম্ভব হইলেও আত্যন্তিক নিবৃত্তি তত্ত্বজ্ঞান ছাড়া অন্য উপাযে হইতে পারে না; সুতরাং সাংখ্যের তত্ত্ব চিন্তা করিতে হয়।

দর্শনে প্রমাণ ও প্রমেয়ের বিচার হয়; সাংখ্যও তাহাই করিয়াছে। প্রমাণ সম্বন্ধে সাংখ্যের আলোচনায় উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নাই। তিনটি প্রমাণ স্বীকৃত—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। শব্দ সম্বন্ধে সাংখ্যের মত মীমাংসার বিরোধী; কারণ, সাংখ্যের মতে শব্দ অনিত্য।

সাংখ্য যেসব তত্ত্ব বা প্রমেযের কথা বলিয়াছে, সে সকলের জ্ঞান লাভ হয অনুমান দ্বারা। প্রত্যক্ষ দ্বারা বাহ্য, স্থূলবস্তুর জ্ঞান পাওয়া যায়, ইহার বেশী নয়। আর শ্রুতি যদিও প্রমাণ, তথাপি সাংখ্যের তত্ত্ব-সমূহ প্রমাণ করার জন্য শ্রুতি পদে পদেই পাওয়া যায় না। বেদান্ত বা মীমাংসা যেমন কথায় কথায় শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিতে পারিয়াছে, সাংখ্যের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। আর কোনো আস্তিক দর্শনও মীমাংসাদ্বয়ের মতো এত পদে পদে শ্রুতি উদ্ধৃত করিতে পারে নাই। যখন পাওয়া যায় তখন সাংখ্যও শ্রুতির দোহাই দিয়াছে এবং শ্রুতিবাক্যও সম্ভবমতো উদ্ধৃত করিয়াছে। যেমন, ১।৫ সূত্রে মোক্ষ যে স্বর্গাদি অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ ইহা বলিতে গিয়া শ্রুতির নাম করা হইয়াছে। কোনো কোনো স্থলে টীকাকারেরা লুপ্ত শ্রুতির কথাও ইঙ্গিত করিয়াছেন। তথাপি সাংখ্যের বেশীর ভাগ বক্তব্যের পক্ষে অনুমানই প্রধান প্রমাণ। কিন্তু এই অনুমানের আলোচনায় জৈন, বৌদ্ধ ও ন্যায় দর্শনের মতো সাংখ্য তেমন প্রগাঢ়তা দেখাইতে পারে নাই।

সাংখ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের কথা বাদ দিয়া বর্তমানে সাংখ্য বলিয়া গৃহীত দর্শনে আমরা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপদেশ পাই। যথা, প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার, এগারটি ইন্দ্রিয়, পাঁচটি তন্মাত্র ও পাঁচটি মহাভূত, এই ২৪টি; আর পুরুষ। এই সব সুদ্ধ পঁচিশটি তত্ত্ব। ইহাদিগকে 'গণ'ও বলা হয়। এইখানে একাধারে আমরা জীব ও জগতের কথা পাইতেছি। অতঃপর ইহাদের আবির্ভাব, পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ, ইত্যাদি বিবেচনা করিতে হয়।

প্রথমত, পুরুষ বা জীব সাংখ্যের মতে বহু; ঠিক জৈনদের মতের অনুরূপ। পুরুষ বহু একথা যাহারা বলিযাছে, তাহারা সেই উক্তি প্রমাণের চেষ্টাও করিযাছে; কারণ উপনিষদনিঃসৃত বেদান্ত এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা বলিয়া আপাতত বহুপুরুষের অস্তিত্ব অস্বীকারই করিয়াছে। যাহারা পুরুষ বহু বলে, তাহাদের প্রধান যুক্তি জন্ম-মৃত্যুর ব্যবস্থা। একজন মরিলেই সকলে মরে না; আর, জন্ম ও মৃত্যু ভিন্ন ক্ষেত্রে এক সঙ্গেই ঘটিতে পারে। পুরুষ এক হইলে তাহা সম্ভব হইত না। সুতরাং পুরুষ বা আত্মা বহু। এই পুরুষ দেহ হইতে ভিন্ন; আর, তাহার অস্তিত্ব আমরা অনুমানের সাহায্যে জানি।

সাংখ্যের মতে এই পুরুষ শুধু ভোক্তা, কিন্তু কর্তা নয়। সে নিষ্ক্রিয় সাক্ষীমাত্র; কিন্তু জ্ঞানোদয় না হওয়া পর্যন্ত জাগতিক ব্যাপার তাহার চিত্তে সুখ-দুঃখ—বেশির ভাগই দুঃখ—উৎপাদন করে। এইভাবে

তাহার ভোগ হয়। জ্ঞানোদয় হইলে অর্থাৎ কিসে কী হয জানিলেই তাহার ভোক্তৃত্বও লোপ পায়; তখনই সে হয় মুক্ত।

দ্বিতীয়ত, পুরুষ ছাড়া আর যে ২৪টি তত্ত্ব তাহাই জগৎ। ইহাদের মধ্যে স্থূল ভূত অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি প্রত্যক্ষ দ্বারাই জানা যায়। কিন্তু এই পঞ্চভূত সূক্ষ্মতর বস্তু দ্বারা ঘটিত, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়; এবং তাহা হইতেই 'তন্মাত্র' পাঁচটি অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ নামক সূক্ষ্ম ভূত অনুমান করা যায়। বাহ্য ও আভ্যন্তর ইন্দ্রিয—জ্ঞানের ইন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি পাঁচটি আর কর্মেন্দ্রিয় বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি, এবং জ্ঞান ও কর্ম এই উভয়াত্মক ইন্দ্রিয মন—এই এগারটি ইন্দ্রিয এবং পঞ্চ তন্মাত্র হইতে অহংকারের অস্তিত্ব অনুমান করা যায; আর, অহংকার হইতে মহৎ বা বুদ্ধির এবং তাহা হইতে মূল প্রকৃতির অনুমান হয়। এইভাবে পর পর অনুমান করিয়া পঁচিশটি তত্ত্বকেই আমরা জানিতে পারি।

ইহাদের মধ্যে সকলের মূল প্রকৃতি। ইহাই সমস্ত জগতের উপাদান। ইহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক তিনটি গুণের সাম্যাবস্থা: অর্থাৎ যখন এই তিনটি গুণ সমান ভাবে কোনোরূপ বিক্ষোভ সৃষ্টি না করিয়া অবস্থান করে, তখনই উহার নাম হয় প্রকৃতি। কিন্তু জলে ঢেউয়েব মতো ইহাদের হ্রাস বৃদ্ধি আরম্ভ হইলে প্রকৃতির বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়; এবং তখনই মহৎ, অহংকার ইত্যাদি পূর্বোক্ত ক্রম অনুসারে আবির্ভূত হইতে থাকে। ইহাই জগৎ-সৃষ্টি।

প্রকৃতি অচেতন এবং জড়; এবং সাম্যাবস্থায় উহা নিষ্ক্রিয়। কিন্তু অবস্থা-বিশেষে ইহা সক্রিয় হইয়া উঠে; তখন, দুধ হইতে যেমন দই হয কিংবা বাছুর দেখিলে যেমন গাভীর দুধ নিঃসৃত হয়, তেমনই ইহা হইতে এই বিরাট জগৎ-প্রপঞ্চের আবির্ভাব হয়।

প্রকৃতি সক্রিয় হয় পুরুষের সংস্পর্শে; যেন পুরুষকে সে বশ করিতে চায়, এই ভাবে। কিন্তু পুরুষ যখন তাহার এই লীলা বা হাবভাব বুঝিয়া ফেলে—অর্থাৎ যখন তাহার তত্ত্ব-জ্ঞান হয়, তখন প্রকৃতি সংকুচিত হইয়া সরিয়া যায় আর সেই পুরুষও মুক্ত হয়। প্রকৃতি যেন লাজুক মেয়ে; লুকাইয়া পুরুষকে অভিভূত করিতে চায়; কিন্তু ধরা পড়িলেই সরিয়া যায়। পুরুষের বন্ধন ও মুক্তির ইহাই ভিতরকার কথা।

এই তো সাংখ্যের জীব ও জগৎ—বন্ধন ও মুক্তি। কিন্তু ঈশ্বর? ঈশ্বরের কথা সূত্রকার তুলিয়াছেন গৌণভাবে। প্রত্যক্ষের স্বরূপ কী, প্রশ্ন উঠিয়াছে; সূত্রকারের মতে বাহ্যবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইতে যে জ্ঞান হয় তাহার নাম প্রত্যক্ষ। আপত্তি হইতে পারে, যোগীরা যে অতীত ও অনাগত বস্তু প্রত্যক্ষ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, সেখানে তো বাহ্য বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ হয় বলা যায় না; তাহা হইলে, হয় প্রত্যক্ষ শব্দের অন্য অর্থ করিতে হয়, অথবা উহা প্রত্যক্ষ নয় বলিতে হয়। সূত্রকার উহার একটিও করিতে প্রস্তুত নন। তাঁহার মতে কোনো নিয়মেরই একান্ত লোপ নাই, এবং কোনো নূতন নিয়মের আবির্ভাবও নাই; আছে শুধু বস্তুর অবস্থান্তর-প্রাপ্তি। যোগীরা এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝেন বলিয়া তথাকথিত অতীত ও অনাগতকেও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন—সাধারণে পারে না। দুধেতে দইয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে; দই একেবারে অনাগত নয়; আর অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু একেবারে লুপ্ত বা অতীত হইয়া যায় নাই! এইভাবে বস্তুর পরিণাম বা অবস্থান্তর প্রাপ্তি যে জানে, সে অতীত ও অনাগতকে বর্তমানের মতো প্রত্যক্ষ করিতে পারে। কার্যে লীন কারণ—এবং কারণে অব্যক্ত কার্য উভয়ই প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। এই অতিরিক্ত প্রত্যক্ষ সকলের সম্ভব না হইলেও উহা প্রত্যক্ষই।

ইহার পর আপত্তি উঠিল, যোগীদের যে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হয়, সেটি কী। উহাকে তো এরকম প্রত্যক্ষের সংজ্ঞায় ফেলা যায় না। উত্তর, ঈশ্বর তো অসিদ্ধ। ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নাই। সুতরাং ঈশ্বর প্রত্যক্ষের কথাই উঠিতে পারে না। ঈশ্বর অর্থ তো জগৎস্রষ্টা। তিনি কি বদ্ধ না মুক্ত। যদি মুক্ত হন, তবে সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হইবে কেন। আকাঙ্ক্ষা হয় বদ্ধ জীবের; বদ্ধ জীব ঈশ্বর নয়। সুতরাং ঈশ্বর নাই। শাস্ত্রে ঈশ্বর-বাচক অনেক কথা পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু সেগুলি হয় মুক্ত আত্মার প্রশংসা, নয়তো সিদ্ধদের উপাসনা। সুতরাং সাংখ্যের মতে ঈশ্বর নাই। পুরুষ ও প্রকৃতিই এই জগৎ-প্রপঞ্চ ব্যাখ্যার পক্ষে যথেষ্ট।

কেহ কেহ (যেমন বিজ্ঞান-ভিক্ষু) সাংখ্যের সাফাই গাহিতে গিয়া বলিযাছেন, সাংখ্য তো ঈশ্বর নাই বলেন না, শুধু 'অসিদ্ধ' বলিয়াছেন; 'অসিদ্ধ' অর্থ প্রমাণ দ্বারা অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করা যায় না, এই মাত্র। কিন্তু সাংখ্যসূত্রের আলোচনা এ ক্ষেত্রে এত স্পষ্ট যে, এই সাফাই টিকিতে পারে না। সেইজন্য সাংখ্যকে নিরীশ্বর দর্শনই ধরা হয়।

আত্মার বন্ধ, কর্মফল, জ্ঞানদ্বারা মুক্তি এই সব তো ভারতীয় দর্শনের সাধারণ কথা। সাংখ্যের বেলায় বন্ধন ঠিক কর্মফল নয়; ইহা অজ্ঞান-জনিত এবং প্রকৃতির সাহায্যে ঘটিত। জগতের তত্ত্ব জানিলে অর্থাৎ প্রকৃতির স্বরূপ বুঝিয়া ফেলিলে আর বন্ধন থাকে না। বন্ধনের কারণ অন্যেরা যাহা বলিয়াছেন—যেমন বেদান্তের অবিদ্যা—তাহা সাংখ্যের অভিপ্রেত নয়।

মুক্ত অবস্থায় আত্মার স্থিতি কিরূপ তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন। কারণ, বন্ধনটাই তাহার অস্বাভাবিক; উহা না আসিলে তাহার স্বাভাবিক

অস্তিত্ব সে ফিরিয়া পাইবে ; কর্তৃত্ব তো তাহার নাই ; মুক্ত হইলে ভোক্তৃত্বও লোপ পাইবে।

সাংখ্য কতকগুলি জিনিস অস্বীকার করিয়াছে। বৌদ্ধদের ক্ষণিকত্ব-বাদ এবং ন্যায়ের ঈশ্বর-কর্তৃত্ব সে মানে নাই। বৈশেষিকে ষট্-পদার্থ বাদ এবং ন্যায়-বৈশেষিকের পরমাণুবাদও অস্বীকৃত (সাংখ্য-সূত্র ৫।৮৫)। বেদান্তের মতে জগৎ ব্রহ্মাত্মক, আর এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সৎ, ইহাও সাংখ্য মানে নাই ; অবিদ্যা অস্বীকার করিয়াছে এবং অবিদ্যা হইতে আত্মার বন্ধন হয়, ইহাও ঠিক তাহার মত নয় ; কারণ, অজ্ঞান আর অবিদ্যা ঠিক এক পদার্থ নয়। মীমাংসকেরা শব্দকে নিত্য বলে, তাহাও সাংখ্যের অস্বীকৃত। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকৃত হইলেই বেদ নিত্য, একথা সাংখ্য স্বীকার করে না (সাংখ্য-সূত্র, ৪।১৫, ৪৮, ৪৩)। বেদ প্রমাণ, ইহা সাংখ্য বলে ; স্থির আত্মা আছে এবং তাহার বন্ধন ও মুক্তি সত্য ঘটনা, ইহাও সাংখ্য মানিয়াছে।

সাংখ্য দর্শনের বৈশিষ্ট্য

সাংখ্য দর্শনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে।

১. গুণত্রয় : সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণ তিনটির কথা এত একমে হিন্দুর চিন্তায় ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে যে উহা সাংখ্যের দান কিনা, প্রশ্ন উঠিতে পারে। আত্মার গতি, দেহান্তর প্রাপ্তি প্রভৃতি গৃহীত সিদ্ধান্ত হিসাবে উপনিষদাদিতে পাওয়া যায় ; পরে সমর্থনের জন্য যুক্তি প্রযুক্ত হইলেও, আগে যুক্তি-তর্ক করিয়া পরে এই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না ; গুণ-ত্রয় সম্বন্ধেও তাহাই মনে হয়। কল্পনাটা কোথা হইতে কিভাবে আসিল, বলা কঠিন ; তবে দ্রব্যমাত্রেরই গুণ আছে, ইহা সহজ প্রত্যক্ষ। এই বিবিধ গুণ হইতে

সূক্ষ্মতম তিনটি গুণের ধারণা আসিয়া থাকিবে। পরে বিচার আলোচনা দ্বারা ধারণাটা পুষ্ট হইয়া থাকিবে। সাংখ্যের মতে (সূত্র ৬।৩৯) ইহারা প্রকৃতির ধর্ম নহে—কাপড়ের রং কিংবা টাকার ওজনের মতো নহে—ইহারা প্রকৃতির স্বরূপ। প্রকৃতি একটা দ্রব্য আর সত্ত্বাদি তাহার গুণ—যেমন গোলাপ ও তাহার গন্ধ—এরূপ কল্পনা করিলে ভুল হইবে। প্রকৃতি গুণাধিকারী গুণী নয়, সত্ত্বাদি তিনটি গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। গুণ তিনটিও আবার পৃথক্ পৃথক্ কোথাও থাকে না; পরিমাণে কোনোটি বেশী কোনোটি কম হইতে পারে, এই মাত্র।

যেহেতু এই গুণত্রয়ই প্রকৃতি এবং প্রকৃতিই জগতের উপাদান, সেই হেতু জগতের সমস্ত বস্তুতেই এই গুণগুলি কম বেশী বর্তমান থাকিবে। ইহা স্বীকার করিয়াই সাংখ্য-মতানুসারীরা জগতের সব কিছুর বিভাগও করিয়াছেন। গীতা (১৭ অধ্যায) শ্রদ্ধা, আহার, তপস্যা, দান প্রভৃতিকেও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় অনুসারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। মানুষের চরিত্র এই সকল গুণ অনুসারে পৃথক পৃথক্ হইবে. ইহা তো সহজেই বুঝা যায়। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই বিভাগ পূজা ইত্যাদির বেলায় সাধারণ হিন্দু কথাবার্তায়ও করিয়া থাকেন।

২. সৎকার্য-বাদ: সাংখ্যের মতে কার্য কারণেতে অব্যক্ত বা লীন থাকে, নূতন কিছু নয়। অসৎ হইতে সতের আবির্ভাব হয় না। যাহা নাই, তাহা কখনও হয় না, আর যাহা ঘটে, তাহা সম্ভাবনারূপে কারণে বর্তমান থাকে। দই দুধে, তৈল সরিষায়, জগৎ প্রকৃতিতে সম্ভাবনারূপে বর্তমান থাকে এবং অবস্থাবিশেষে ব্যক্ত হয়। প্রকৃতিতে জগৎ অব্যক্ত থাকে; জগৎ আর প্রকৃতি ভিন্ন বস্তু নয়; সেইজন্য প্রকৃতিকে 'অব্যক্ত'ও বলা হয়। কার্য-কারণেতে সৎ বা বর্তমান, সাংখ্যের

এই মতের নাম দেওয়া হইয়াছে 'সৎকার্যবাদ'। ইহার বিপরীত মতের নাম 'অসৎকার্যবাদ' বা আরম্ভবাদ। এই মত অনুসারে জগতের আরম্ভ আছে, ইহা নূতনের আবির্ভাব, পুরাতনের প্রকাশমাত্র নয়। নৈযাযিকদের এই অভিমত। আর অদ্বৈত-বেদান্ত জগৎকে অসৎ বা মাযা বলিযা থাকে। সেই মতের নাম 'মাযাবাদ' বা 'বিবর্তবাদ'। আস্তিক দর্শনে এই তিনটি নাম এবং নামের বাচ্য খুব প্রসিদ্ধ।

৩. প্রকৃতি ও পুরুষ: সাংখ্যের সকলের অপেক্ষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মত উহার প্রকৃতি পুরুষের কল্পনা এবং এই উভযের সম্বন্ধের ধারণা। প্রকৃতি অচেতন এবং অজ্ঞান, পুরুষের সম্পর্কে আসিয়া সক্রিয় —যেমন চুম্বকের সংস্পর্শে লৌহও চুম্বক-শক্তি পায, সেইরূপ। ইহাতে তেমন দুর্বোধ কিছু নাই। কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষের সম্পর্ক বুঝাইতে গিযা সাংখ্য কতকগুলি উপমা ব্যবহার করিয়াছে, যাহাতে অনেক ভবিষ্যৎ কল্পনার বীজ গুপ্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। এই সব কল্পনা সাংখ্যের নিজস্ব না অন্য কোথা হইতেও গৃহীত, নিশ্চিত ভাবে বলা কঠিন। ইহার ইতিহাস অস্পষ্ট; তবে যাহা পরে ঘটিয়াছে, তাহা বলা যায়।

প্রকৃতি শব্দটি সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে স্ত্রীলিঙ্গ। ইহার নামান্তর 'প্রধান' বা 'অব্যক্ত' স্ত্রীলিঙ্গ নয়। শব্দের লিঙ্গ দ্বারা তাহার বাচ্য-বস্তুর লিঙ্গ সংস্কৃত ব্যাকরণে বুঝানো হয় না। এখানেও বাচক-শব্দের লিঙ্গ খুব বড়ো জিনিস নয়; কিন্তু বাচ্য-বস্তুটিকে স্ত্রীরূপেই সাংখ্য কল্পনা করিয়াছে। প্রকৃতি পুরুষকে মোহিত করে—যেমন নারী পুরুষকে বশ করে; প্রকৃতির ক্রিয়াও নারীর লাস্য ও হাস্য এবং হাব ও ভাবের অনুরূপ কল্পিত হইয়াছে। প্রকৃতিকে কোথাও লজ্জাশীলা বধূ (কারিকা ৬১), কোথাও নর্তকী (সূত্র ৩,৬৯) রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ইহার ফলে পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ ও সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ উভয়ই

নর-নারীর সম্বন্ধ ও সম্বন্ধচ্ছেদের মতো ভাবা হইয়াছে। অনাদিকাল হইতে নর ও নারীর যে লীলা জগতে চলিয়া আসিয়াছে—কবি ও দার্শনিক যাহাকে অনেক সময় সনাতন—চির-সত্য—মনে করিয়াছেন, সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতির লীলার বর্ণনায়ও যেন তাহাই মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। সাংখ্য কাব্য নয়, দর্শন। কিন্তু দার্শনিকের ভিতরে কি কবি-মন থাকিতে পারে না। গ্রীক দার্শনিক প্ল্যাতোর কি ছিল না।

সাংখ্যের মনে উহা স্পষ্টত উপস্থিত থাকুক বা না-থাকুক, তাহার পরবর্তী চিন্তায় অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ-প্রকৃতির সম্বন্ধটাকে নর-নারীর সনাতন সম্বন্ধের রূপক-রূপেই দেখা হইয়াছে। ঐতিহাসিক প্রমাণের সাহায্যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের মত এখানে কিছু উপস্থিত করিতে না পারিলেও ইহা বোধ হয় বলা যায় যে, অর্ধনারীশ্বর বা হর-গৌরীর যে কল্পনা পরবর্তী সাহিত্যে পাওয়া যায়, তাহাতে সাংখ্য দর্শনের ছায়া পড়িয়াছে। আর, বৈষ্ণব ধর্মের একটা দিকে রাধা-কৃষ্ণের যে কল্পনা পাওয়া যায়, তাহাও কি সাংখ্যের নিকট ঋণী হইতে পারে না? ভাবিবার মতো প্রশ্ন বলিয়া মনে হয়, তাই ইহাদের উল্লেখ এখানে করিলাম। ইতিহাস যদি কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরে নিশ্চিত ভাবে বলিয়া দিতে পারিত, তাহা হইলে কে ঋণী এবং কে ঋণদাতা, এই প্রশ্নের মীমাংসা সহজেই হইয়া যাইত। কল্পনাগুলির সাদৃশ্য এত বেশী যে, কোনো একটা সাধারণ উৎস হইতে ইহারা বিভিন্ন ধারারূপে বহির্গত হইয়াছে, ইহাও অচিন্তনীয় নয়।

প্রভাব ও পরবর্তী ইতিহাস

সাংখ্যের গুণত্রয় ও প্রকৃতি-পুরুষের কল্পনা সাহিত্যে কাব্যে ও পুরাণাদিতে বহু জায়গায় ব্যবহৃত হইয়াছে, একথা আমরা বলিয়াছি।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও—বিশেষত চরকে—সাংখ্য-মত নানাভাবে বর্তমান রহিয়াছে। চরক সাংখ্য-সূত্রের এমন কি সাংখ্য-কারিকারও অনেক আগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহাই সাধারণত গৃহীত মত। চরক খ্রীঃ ১ম শতাব্দীর লোক; সুতরাং তিনি বর্তমান সাংখ্য-সাহিত্য হইতে কোনো সাহায্য লইযাছিলেন, এরূপ বলা যায় না। তাহা হইলেই কল্পনা করিতে হয়, এই সাহিত্যসৃষ্টির পূর্বেও সাংখ্য মত বর্তমান ছিল, চরক এই উৎস হইতেই আহরণ করিযাছেন। এই চিন্তাধারা ক্রমশ পুষ্টিলাভ করিয়া কারিকা ও সূত্রে স্ফুটমূর্তি পরিগ্রহ করে। কপিলের পূর্বগামী অন্যান্য আচার্যের নাম হইতেও ইহাই অনুমান করিতে হয়। সাংখ্যের প্রাচীনত্বের ও প্রভাবের কতকটা আভাস এইখানেই আমরা পাইতেছি।

কিন্তু ইহার পরবর্তী ইতিহাস কী। সাংখ্যের চর্চা—পঠন-পাঠন—যে হইত এবং এখনও হয়, তাহা সন্দেহের অতীত। ইহা সহজবোধ্য দর্শন, সরল ভাষায় প্রকাশিত এবং উহাতে কাব্য-রসের ভাবনাও রহিয়াছে; সুতরাং উহা চিত্তাকর্ষক নয়, এরূপ বলা যায় না। কিন্তু দর্শন হিসাবে ইহার অদৃষ্ট খুব ভালো ছিল না। ইহার অবিস্তীর্ণ সাহিত্যই তাহার একটা প্রমাণ। আর, বেদান্তের কাছে ইহাকে অনেক আঘাত সহিতে হইয়াছে। অচেতন-প্রকৃতি জগতের উপাদান বলিয়া স্বীকৃত হইলে ব্রহ্মের মর্যাদা-হানি হয়। বেদান্ত সেইজন্য নানাভাবে এই প্রকৃতি-বাদ নির্মূল করিতে চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং কাব্যের ফোড়ন হিসাবে সাংখ্যের আদর থাকিলেও দর্শন হিসাবে পরবর্তী কালে বেদান্তকর্তৃক ইহা অত্যন্ত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। অন্যান্য দর্শনও—এমন কি নাস্তিক দর্শনও—ইহাকে আঘাত করিয়াছে। একবার-আবির্ভূত কোনো দর্শনই একেবারে বিলুপ্ত ও বিস্মৃত হইয়া যায়

না ; সাংখ্যও যায় নাই ; কিন্তু ধর্মে ও জীবনে তাহার প্রভাব পরের দিকে খুব বেশী হয় নাই।

২. যোগ-দর্শন

বেদান্ত-সূত্রে একাধিক স্থানে এবং নানাভাবে সাংখ্যের মত —বিশেষত তাহার প্রকৃতি-বাদ—খণ্ডনের চেষ্টা হইয়াছে। সাংখ্যের বিরুদ্ধে শেষ কথা বলিয়া বেদান্ত-সূত্রকার বলিতেছেন—"এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" (২।১।৩); অর্থাৎ যাহা বলা হইল তাহাতে যোগ-দর্শনও নিরস্ত হইল, যোগের বিরুদ্ধে আর পৃথক্ যুক্তি-প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, যোগ ও সাংখ্যের মধ্যে দর্শন হিসাবে পার্থক্য তেমন কিছু নাই। জীব ও জগৎ সম্বন্ধে উভয়ের মত এক। পার্থক্য শুধু ঈশ্বর সম্বন্ধে। সাংখ্য ঈশ্বর অসিদ্ধ বলিয়া প্রকারান্তরে তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছে। যোগ ঈশ্বর মানিয়াছে; প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে, এমন নয়, তথাপি স্বীকার করিয়াছে। এইটুকুই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ। সেইজন্য সাংখ্যকে 'নিরীশ্বর যোগ' আর যোগকে 'সেশ্বর সাংখ্য' বলিলে কোনো ভুল হয় না; বলা হইয়াও থাকে। দর্শনের প্রধান বিচার্য অন্য বিষয়ে উভয়ের মধ্যে আর কোনো পার্থক্য নাই।

যোগের ঈশ্বর-স্বীকৃতি জিজ্ঞাসা হিসাবে প্রশ্ন তুলিয়া যুক্তির সাহায্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত নয়। প্রসঙ্গচ্ছলে কথাটা উঠিয়াছে এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব ইঙ্গিত করা হইয়াছে, এই মাত্র। আলোচনাটা সংক্ষেপে এইরূপ,—সমাধির কথা উঠিয়াছে; তাহার ফল সহজে কী উপায়ে পাওয়া যায়, সে কথা উঠিয়াছে। তখনই বলা হইল—"ঈশ্বর-প্রণিধানাৎ বা' (১।২৩) অর্থাৎ ঈশ্বর প্রণিধান হইতেও ইহা হইতে পারে। প্রণিধান মানে

কী। ভক্তি ও উপাসনা ইত্যাদি। ঈশ্বর কে। পুরুষ-বিশেষ, যিনি ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়—যে সব দ্বারা মানুষের চিত্ত অভিভূত হয়—সে সব দ্বারা, 'অপরামৃষ্ট'—অর্থাৎ অনভিভূত এবং অস্পৃষ্ট। তিনি সর্বজ্ঞ, সকলের গুরু এবং 'প্রণব' তাহারই কথা বলে, ইত্যাদি। এই ঈশ্বর-প্রণিধানের কথা যোগ-সূত্রকার আরও কয়েক জায়গায় বলিয়াছেন, যথা, সূত্র ২।১, ২।৩২। সর্বত্রই ঐ একই কথা; ঈশ্বর-প্রণিধান সমাধি-সিদ্ধির একটা উপায়।

এই ঈশ্বর জৈনদের জিন বা তীর্থংকর, বৌদ্ধদের বুদ্ধ বা বোধি-সত্ত্ব প্রভৃতি হইতে অত্যন্ত প্রভিন্ন কিনা, জিজ্ঞাসা করা চলে। তাঁহার স্রষ্টৃত্বের কথা উঠে নাই, করুণার কথা নাই; এমন কি, তিনি কর্ম-ফলদাতা, একথাও বলা হয় নাই। তথাপি যোগ ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছে, ইহা মানিতে হয়; এবং এইখানেই সাংখ্যের সঙ্গে উহার পার্থক্য। দর্শন হিসাবে—প্রমাণ ও প্রমেয়ের বিচারে—উভয়ের মধ্যে আর কোনো প্রভেদ নাই। সুতরাং যোগ-দর্শনের আলোচনা আমরা এইখানেই শেষ করিতে পারিতাম এবং বেদান্ত-সূত্রকারের মতো বলিতে পারিতাম, যোগের সম্বন্ধে আর কিছু বলার নাই। কিন্তু যোগের আর-একটা দিক্ আছে।

যোগ ঠিক দর্শন নয়, যোগ; আর যোগ মানে চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"। এইভাবে যোগ-শাস্ত্র আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পর প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠিয়াছে—চিত্তবৃত্তি কী কী। নিরোধ হয় কী প্রকারে। নিরোধের বাধা কী কী। নিরোধের ফল কী ইত্যাদি। এইভাবে পুঁথি বাড়িয়া চলিয়াছে। চিত্তের বৃত্তি সকল নিরুদ্ধ হইলে যে অবস্থা হয়, তাহার নাম সমাধি। সমাধিরও প্রকার-ভেদ আছে; সুতরাং আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত নয়।

প্রমাণও চিত্তের একটি বৃত্তি (যোগ-সূত্র ১।৬); সুতরাং প্রসঙ্গক্রমে প্রমাণের কথা উঠিয়াছে। অন্যান্য বৃত্তির—যথা বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতির—স্বরূপ কী সে-সব বিচারও হইয়াছে। এই-গুলিকে নিরোধ করিয়া সমাধিলাভের উপায়-স্বরূপ ঈশ্বর-প্রণিধানের কথা উঠিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ঈশ্বরের স্বরূপও কতকটা বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর সমাধির প্রকার-ভেদ আলোচিত হইয়াছে, এবং তাহার বাধা কী কী, তাহাও চিন্তিত হইয়াছে।

এই সমাধিলাভের উপায় বা সাধন কী কী। তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধানের উপদেশ এই সম্পর্কে করা হইয়াছে। যোগাঙ্গের কথাও উঠিয়াছে। যোগের অঙ্গ আটটি—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। অর্থাৎ পর পর এই আটটি হইলেই যোগ হয—চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ হয়। ইহাদের বর্ণনায় নাস্তিক জৈন ও বৌদ্ধদের চিন্তার সহিত তাহাদের সাদৃশ্য স্থানে স্থানে লক্ষিত হয়। প্রথমত, 'যম' বলিতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ বুঝায। জৈনধর্মেও বিশেষভাবে এই কয়টির সাক্ষাৎ আমরা পাইয়াছি। অহিংসার উল্লেখ এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মতো। বেদ মানা আর অহিংসা প্রচার করা এক জিনিস নয়। অহিংসা ইত্যাদির অর্থ স্পষ্ট। ২. নিযমের মধ্যে আবার তপঃ, স্বাধ্যায ও ঈশ্বর-প্রণিধান ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে: অধিকন্তু শৌচ ও সন্তোষের কথা বলা হইয়াছে। অর্থ সব কয়টিরই স্পষ্ট। ৩. আসন—সাধারণ অর্থে ভালো হইয়া বসা; 'স্থিরসুখং আসনং'। সাংখ্য যোগ ছাড়া ন্যায় ও বেদান্তও এই সাধারণ অর্থে আসন শব্দটি গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যোগ আসনের অনেক ভেদ স্বীকার করিয়াছে: যথা, পদ্মাসন, বীরাসন, ইত্যাদি। ৪. 'প্রাণায়াম' কথাটাও অনেকের জানা; শ্বাস দ্বারা

বায়ু টানিয়া লওয়া, উহা কিছুক্ষণ ভিতরে আটকাইয়া রাখা এবং পরে আস্তে আস্তে নিশ্বাসে ছাড়িয়া দেওয়া। পূরক, কুম্ভক ও রেচক—এই তিনটি প্রক্রিয়ার একত্রে নাম প্রাণায়াম। ৫. প্রত্যাহার অর্থ চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলিকে তাহাদের বিষয় রূপ, স্পর্শ ইত্যাদি হইতে নিবৃত্ত করিয়া চিত্তে নিরুদ্ধ করিয়া রাখা। 'যম' হইতে 'প্রত্যাহার' পর্যন্ত পাঁচটি যোগের বহিরঙ্গ। ৬. 'ধারণা' অর্থে কোনো এক জায়গায়—নাভিচক্রে কিংবা হৃৎপুণ্ডরীকে—চিত্তকে আবদ্ধ করিয়া রাখা বুঝায়। ৭. 'ধ্যান' অর্থ অস্পষ্ট নয়; 'প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানং'—অর্থাৎ কোনো এক বস্তুতে চিত্তকে বিলীন করিয়া রাখার নাম 'ধ্যান'। আর, ৮. জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—ধ্যাতা ও ধ্যেয় বস্তুর পার্থক্যবোধ লোপ পাইলে হয় 'সমাধি'। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি যখন একই বিষয়ে হয় তখন তাহার নাম হয় 'সংযম'। এই তিনটিকে যোগের অন্তরঙ্গ সাধনও বলা হয়।

অনেক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, আর নয়। এখন জিজ্ঞাস্য, যোগের সমস্ত সাধন সুপ্রযুক্ত হইলে ফল কী হইবে। উত্তর, প্রথমে বিভূতি, পরে কৈবল্য বা মুক্তি। ইহারই নামান্তর যোগ-সিদ্ধি।

'বিভূতি' গায়ে কাঁটা না লাগা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বজ্ঞত্ব পর্যন্ত অনেক প্রকার হইতে পারে। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটির একত্র প্রযোগে—অর্থাৎ সংযমের সাহায্যে বিভূতি লাভ হয়। বিস্তৃত বিবরণ সকলের নিকট সুখপাঠ্য না-ও হইতে পারে; কাজেই সংক্ষেপে দৃষ্টান্ত দিতেছি। বস্তুর তিনপ্রকার পরিণাম আছে—অতীত, বর্তমান ও অনাগত; যেমন, মাটি জল দিয়া মাখিলে হয় কাদা, তাহাকে ঘটের আকার দেওয়া যায় এবং ঘটও ভাঙিয়া আবার গুঁড়া করা যায় ইত্যাদি; কাদা অবস্থায় মাটি অতীত, ঘট অনাগত; আর ঘট অবস্থায় কাদা অতীত, গুঁড়া অনাগত। এইভাবে বস্তুর পরিণামের বিষয়ে সংযম করিলে অতীত

ও অনাগতের জ্ঞান হয় ; ইহাও একটা বিভূতি। আর-এক রকম সংযম আছে, যাহা দ্বারা সকল জন্তুর ভাষা বুঝা যায়। আবার এক প্রকারের সংযমের সাহায্যে পূর্বজন্মের সব খবর জানা যায়। পর-চিত্ত-জ্ঞান, অদৃশ্য হওয়া, হাতির মতো বলবান্ হওয়া ইত্যাদিও বিভূতির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। সূর্যে সংযম করিলে ভুবনের জ্ঞান হয়, চন্দ্রে সংযম করিলে তারা-ব্যূহ জানা যায ; নাভি-চক্রে সংযম করিলে কায়-ব্যূহ বুঝা যায় ; আর-এক রকম সংযম আছে যাহা দ্বারা 'সর্ববিৎ' হওয়া যায়। সংযম দ্বারা আবার দেহস্থিত প্রাণ, অপান, ব্যান, উদ্দান ও সমান এই পঞ্চ বায়ুকে জয় করা যায়। উদান বায়ু জিত হইলে জল, কাদা ও কাঁটা গায়ে লাগে না (সূত্র ৩।৩৯)। সমান বায়ু জিত হইলে আগুনের মতো তেজ হয়, ইত্যাদি। তাহার পর আকাশ-গমন, ইন্দ্রিয়-জয়, ভূত-জয় ইত্যাদিও বিভূতি, এবং এইগুলি লাভ করারও উপায আছে।

অতঃপর অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য লাভ হয় ; ঈশ্বরত্বের সমান বলিয়া ইহাদিগকে ঐশ্বর্য বলা হয়। 'অণিমা' অণুর মতো ছোটো হওয়ার শক্তি ; 'লঘিমা' অর্থ লঘু বা হালকা হওয়া ; 'মহিমা' অর্থ যত খুশি বড়ো হওয়ার শক্তি ; 'প্রাপ্তি' অর্থ যা-কিছু পাওয়ার শক্তি—আঙুল দিয়া চাঁদও ধরিতে পারার শক্তি ('অঙ্গুল্যগ্রেণ-অপি স্পৃশতি চন্দ্রমসং') ; 'প্রাকাম্য'—যাহা-ইচ্ছা করিতে পারা ; যেমন মাটির ভিতর ডুবিয়া যাওয়া ইত্যাদি ; 'বশিত্ব' অর্থ সব-কিছুকে—মায় পঞ্চভূতকে—বশ করিতে পারা অথচ নিজে কাহারও বশ না হওয়ার শক্তি ; 'ঈশিত্ব' অর্থ সব-কিছুর উপর প্রভুত্ব, শেষ, 'যত্র কামাবসায়িত্ব'—অর্থাৎ সত্য-সংকল্পতা ; যাহা সংকল্প হইবে তাহাই সিদ্ধ করার শক্তি। এই অবস্থায় যোগী যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু সত্য সত্যই করেন না, মাটিকে জল কিংবা জলকে মাটি করিতে পারেন—সেই শক্তি হয়—কিন্তু করিবার প্রবৃত্তি ঠিক হয় না। কারণ,

তাহা হইলে সৃষ্টি ওলট-পালট হইয়া যাইবে। ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তির পর সেইরূপ প্রবৃত্তি তাঁহার হয় না। এই আটটি হইল ঐশ্বর্য। ইহা ছাড়া দেহের রূপ, লাবণ্য, বল প্রভৃতি তো বিভূতির অঙ্গীভূত বটেই।

এই সমস্ত বিভূতি যোগীরা পান। বিভূতিমান্ যোগীকে দেবতারাও সম্মান করেন। কিন্তু যোগীকে আরও অগ্রসর হইতে হইবে; বিভূতি দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া তাহাতে মগ্ন হইয়া থাকিলে চলিবে না; ইহাই শেষ লক্ষ্য নয়। বিভূতির আকর্ষণকেও জয় করিতে হইবে—বিবেক লাভ করিতে হইবে। যোগের চরম লক্ষ্য 'কৈবল্য'; পরিপূর্ণ স্বীয় জ্যোতি লাভ। 'কৈবল্য' শব্দটি 'কেবল' শব্দ হইতে আসিয়াছে। জৈনদের 'কেবল' জ্ঞান ও 'কেবলী'র কথা এখানে মনে করা যাইতে পারে।

যোগশাস্ত্রে কর্মের শুক্লাদি বর্ণ কল্পিত হইয়াছে (৪।৭), বাসনা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাহার অনাদিত্বও কল্পিত হইয়াছে (৪।৮-১০) এবং অহিংসার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই সকলের ভিতর কি জৈন ও বৌদ্ধ চিন্তার ছায়া দেখা যায় না? একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে অথচ কেহ কাহাকেও স্পর্শ করে নাই, এরূপ মনে করা কঠিন। জৈন-বৌদ্ধরা অবশ্যই নাস্তিক ছিল, কিন্তু অস্পৃশ্য ছিল না; তাহাদের সংস্পর্শ সর্বদাই আস্তিকেরা বর্জন করিতে পারিতেন না, চাহিতেনও না। সুতরাং তাহাদের কোনো প্রভাব আস্তিক দর্শনে দেখা গেলে, স্বীকার করা উচিত; না হইলে সত্য ও অস্তেয় এই দুইটি ধর্মের সংকোচ হয়।

যোগ-সাহিত্য

আমরা এ পর্যন্ত যোগের যে বিবরণ দিয়াছি তাহার আশ্রয় ও ভিত্তি পতঞ্জলির যোগসূত্র। ইহার রচনাকাল লইয়া মতভেদ আছে, ইহা বলা বাহুল্য; কারণ মতভেদ আমরা কোন্ জায়গায় না দেখিতে পাই। ইহা উপনিষদ্ ও জৈন বৌদ্ধ ধর্ম হইতে অর্বাচীন কিন্তু খুব সম্ভব অন্যান্য দর্শন—বিশেষত সাংখ্য দর্শনের সূত্র হইতে প্রাচীন। যোগসূত্রকার আর পাণিনি ব্যাকরণের 'মহাভাষ্য' রচয়িতা পতঞ্জলি একই ব্যক্তি কিনা, তাহাও সন্দেহের অতীত নয়। মীমাংসা করিতে চেষ্টা আমরা করি না; কারণ, এসব স্থানে ইতিহাসের মূকত্ব দূর করা কঠিন।

পতঞ্জলি যোগসূত্রই যোগের একমাত্র গ্রন্থ নয়; আরও গ্রন্থ আছে; সাহিত্যটি খুব বিস্তীর্ণ না হইলেও গ্রন্থের সংখ্যা তুচ্ছ নয়। যোগ-সূত্রের ভাষ্য ইত্যাদি তো আছেই; তাহা ছাড়া বিভিন্ন ধরনের আরও বই আছে।

প্রথমত, যোগের প্রচারক কতকগুলি উপনিষদ আছে। যথা, শাণ্ডিল্য, ধ্যানবিন্দু, নাদবিন্দু, হংস, যোগতত্ত্ব, অমৃতনাদ, বরাহ, মণ্ডল-ব্রাহ্মণ, যোগ-চূড়ামণি, যোগ-শিখা ইত্যাদি। মুক্তিকা-উপনিষদে যে উপনিষদগুলির একটা তালিকা দেওয়া আছে, তাহাতে ইহাদের প্রায় সকলগুলিরই উল্লেখ আছে; তবে নামে দুই এক জায়গায় পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। মুক্তিকা এবং এই যোগ-উপনিষদ্গুলি সমস্তই যে অর্বাচীন গ্রন্থ—যাহাকে আমরা উপনিষদের যুগ বলি, ঠিক সেই যুগের রচিত গ্রন্থ নয়—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইহাদের ভাষা, ভাব, রচনা-ভঙ্গি, অবৈদিক দেবতার উল্লেখ প্রভৃতি নানা কারণেই ইহাদিগকে অনেক পরবর্তী কালের রচনা মনে করিতে হয়।

এই যোগ-উপনিষদগুলি যোগ-সূত্র রচনার আগে না পরে, জোর করিয়া বলা কঠিন। সূত্র ও উপনিষদ্‌যোগের এই উভয় প্রকার গ্রন্থেই একটা ক্রমবিকাশের চিহ্ন লক্ষিত হয়। মনে হয় আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগাঙ্গের প্রচলন অনেক আগে হইতেই ছিল। খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে যখন সেকেন্দর ভারত আক্রমণ করেন, তখনও এই সব যোগাঙ্গ অনুসরণ করিত এমন যোগী বর্তমান ছিল, তাহা গ্রীক্‌দের 'নগ্ন-পণ্ডিতদের' বর্ণনা হইতে অনুমান করা যায়। যোগ-উপনিষদগুলিতে এই সব যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানের বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাদের রচনা-কাল সম্বন্ধে নিশ্চিত না হইতে পারিলেও ইহারা পুরাতন, প্রচলিত অনুষ্ঠানের কথা বলিতেছে, তাহা মনে করা চলে। কারণ, বিবিক্ত, দৃষ্টিসুখকর দেশে বসিয়া ধ্যান করার কথা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও (২য় অধ্যায়) পাওয়া যায়; এবং এই যোগের ফল যে লঘিমা, বর্ণ-প্রসাদ ইত্যাদি, তাহাও সেখানে বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর তো প্রাচীন উপনিষদ্‌ বলিয়া স্বীকৃত। সুতরাং যোগের অনুষ্ঠান, আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদির প্রাচীনত্ব অস্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, এইসব উপনিষদ্‌ ছাড়া যোগ-সাহিত্যের আরও একটা স্তর আছে; যোগ-সম্বন্ধে আরও এক শ্রেণীর বই আছে। কয়েকটির নাম দিতেছি—ঘেরণ্ড-সংহিতা, শিব-সংহিতা, অষ্টাবক্র-সংহিতা, ষট্‌-চক্র-নিরূপণ, যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি। এইগুলির অধিকাংশেরই নামের শেষে 'সংহিতা' শব্দটি রহিয়াছে; সুতরাং ইহাদিগকে যোগ-সংহিতা বলিলে ভুল হইবে না। তাহা হইলে যোগ-সাহিত্যে আমরা তিনটি স্তর বা শাখা পাইতেছি: ১. যোগ-উপনিষদ্‌; ২. যোগ-সূত্র ও তাহার আশ্রিত ভাষ্য ইত্যাদি; ৩. যোগ-সংহিতা। ইহাদের মধ্যে পতঞ্জলির যোগ-সূত্র দর্শনের পর্যায়ে গৃহীত; ইহার উপর ব্যাস-কৃত ভাষ্য প্রসিদ্ধ

এবং দার্শনিক গ্রন্থ বলিয়াই স্বীকৃত। বাকি যোগ-সাহিত্যে দর্শনের কথা সামান্যই আছে। যোগ-সূত্র ও তাহার ভাষ্য ইত্যাদিতে দর্শনের কথার সঙ্গে প্রাচীন যোগ-অনুষ্ঠানগুলির একটা দার্শনিক ভিত্তি দেওয়ার চেষ্টাও স্পষ্ট।

যোগের দার্শনিক মূল্য খুব বেশী নয়। দর্শন হিসাবে ইহা সাংখ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; এই সাংখ্যের তত্ত্বগুলির বিস্তৃত কোনো আলোচনাও যোগ করে নাই। ইহা হইতেই ইহার দার্শনিক প্রতিষ্ঠার পরিমাপ হইয়া যায়। কিন্তু যোগ-দর্শনে চিত্ত-বৃত্তির আলোচনায় যে সব মনোবিজ্ঞানেব কথা বলা হইয়াছে, সে সব বিচারের অযোগ্য নয়। অনেকে এসকলের ভিতর অখণ্ড সূক্ষ্ম তত্ত্ব দেখিয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করিলে ইহাদের কতটুকু মূল্য টিকিবে, বলা কঠিন। তবে, এসকল আলোচনার অযোগ্য নয, ইহা আমরা স্বীকাব করিতে প্রস্তুত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, হাজার হইলেও ইহা মনো-বিজ্ঞান, দর্শন নহে।

দার্শনিক অংশটুকু বাদ দিলে সমস্ত যোগ-সাহিত্যে যোগ-উপনিষদ্, যোগ-সূত্র ও যোগ-সংহিতার একটা সাধারণ ধারা লক্ষিত হয। কতকগুলি যোগাঙ্গ—আসন ইত্যাদির অভ্যাস এবং তাহা দ্বারা ঐশ্বর্য লাভের কথা সকলেই বলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শরীর-তত্ত্বের কথা উঠিয়াছে; ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ইত্যাদি নাড়ী, ষট্-চক্র, দেহাভ্যন্তরের অনেক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। দর্শন না হইলেও এসকলের একটু বিবরণ না দিলে যোগ-সাহিত্যের বিবরণ অত্যন্ত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

যোগের অনুষ্ঠান

যোগ-সূত্রও যোগের আটটি অঙ্গ স্বীকার করিয়াছে। অদার্শনিক যোগ-সাহিত্য—যোগ-উপনিষদ ও যোগ-সংহিতা—দুই-ই এই কয়টির কথাই বিশেষভাবে ভাবিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে সংহিতাদিতে আরও একটি যুক্ত হইয়াছে; সেটি তন্ত্রেও পাওয়া যায়; নাম 'মুদ্রা'। এসবের ভিতর দার্শনিক তত্ত্ব কিছুই নাই; কিন্তু একেবারে উপেক্ষা করিলে অনেকের কাছে আমাদের আলোচনা অঙ্গহীন মনে হইবে। অদার্শনিক যোগ-সাহিত্যে আসন, প্রাণায়াম ও মুদ্রার কথাই বেশী আলোচিত হইয়াছে। এই বিচার উপলক্ষে শরীরতত্ত্বের কথাও উঠিয়াছে; দেহে কতগুলি 'নাড়ী' আছে, 'চক্র' কয়টি, কোন্‌টির পরিমাণ ও আকার কেমন, ইত্যাদি। এই সম্পর্কে যোগ-সাহিত্যে গৃহীত সমস্ত সিদ্ধান্তকেই সত্য মনে করিলে শুধু যে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি অবজ্ঞা দেখানো হয়, তাহা নয়; আধুনিক বিজ্ঞানের অজ্ঞানও প্রকাশ হইয়া পড়ে। আবার সবগুলিকে বাতিল করিয়া দেওয়াও উচিত হইবে না। সুতরাং শ্রেয়স্কাম ব্যক্তি মধ্যপন্থাই অবলম্বন করিবেন।

ক. আসন

ছুটিয়া ছুটিয়া চিন্তা হয় না; ট্রাম-বাসে যাতায়াত করিবার সময় গোয়েন্দা-উপন্যাস পড়া গেলেও গভীর চিন্তা অসম্ভব। চিন্তার জন্য—ধ্যানের জন্য— স্থির হইয়া আরামে বসা প্রয়োজন; ইহা সকল দর্শনই স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু এক-এক ভাবে বসিলে এক-এক প্রকার ফল লাভ হয়, একথা দর্শন বলে নাই, বলিয়াছে যোগ ও তন্ত্র। এত প্রকার আসনের কথা যোগ-সাহিত্যে বর্ণিত হইয়াছে যে নকশা আঁকিয়া না দেখাইলে শুধু

কথার বর্ণনায় সবগুলি সকলের কাছে স্পষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয় না। কয়েকটির নাম করা উচিত, যথা, পদ্মাসন, সিংহাসন, সিদ্ধাসন, বীরাসন, গোমুখাসন, বৃষাসন, ময়ূরাসন, মৎস্যাসন, ভুজঙ্গাসন ইত্যাদি। ঘেরণ্ড-সংহিতায় ৩২টি আসনের উল্লেখ আছে। যেখানে 'আসন' কথার পূর্বে কোনো জন্তুর নাম আছে,—যেমন, সিংহ, গরুড়, বৃষ, মৎস্য, কুক্কুট, মণ্ডুক, ভুজঙ্গ ইত্যাদি—সেখানে সেই জন্তু যেভাবে বসে সেইভাবে বসার কথা হইতেছে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু মানুষের দেহটাকে মাছ বা ব্যাঘ্র বা সাপের মতো কিভাবে বসাইতে হইবে, তাহা বর্ণনায় শুধু নয়, গুরুর উপদেশের সাহায্যে বুঝিতে হয়। চিত্রের সাহায্যেও কতকটা পরিষ্কার হইত, যদি আমরা তাহা দিতে পারিতাম।

খ. মুদ্রা

যোগ-সূত্রে না হইলেও যোগ-সাহিত্যে এবং তন্ত্র-সাহিত্যে মুদ্রার উল্লেখ বহু আছে। 'মুদ্রা' কথাটার মানে একটু ঘোরালো। সাধারণত হাতের আঙুল কয়টির সংযোগ বিযোগ দ্বারা একটা আকার সৃষ্টি করিলে তাহাকে 'মুদ্রা' কহে; যথা, 'অঙ্কুশ'—মুদ্রা। আর সমস্ত দেহটাকে যখন একটা বিশেষ ভাবে স্থাপন করা হয়, তখন উহা হয় আসন। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম আছে। দৃষ্টান্ত, ঘেরণ্ড-সংহিতায় বর্ণিত কতকগুলি মুদ্রা—এগুলিতে সমস্ত দেহটাকেই একটা বিশেষভাবে স্থাপন করা হয়; যথা, মাথা এবং হাত মাটিতে রাখিয়া পা দুইটি উপরে তুলিয়া সোজাভাবে 'কুম্ভক' করিলে উহাকে 'বিপরীত-করণী' মুদ্রা কহে, আবার হাতের উপর সমস্ত দেহটাকে রাখিয়া মাথা ও পা বাঁকাইয়া উপর দিকে রাখিলে উহাকে 'বজ্রোলী' মুদ্রা বলা হয়, ইত্যাদি। দুই একটি মুদ্রা খুবই কঠিন বলিয়া মনে হয়; যেমন,

'খেচরী-মুদ্রা'। উহাতে জিহ্বাটিকে উল্টাইয়া উহার অগ্রভাগ জিহ্বার মূলে ঠেকাইতে হইবে এবং সেখানে যে নাড়ী আছে তাহা ছিন্ন করিয়া জিহ্বাকে ক্রমে উপর দিকে ঠেলিয়া ভুরু দুইটির মাঝামাঝি জায়গায় পৌছাইতে হইবে। অভ্যাস করিতে করিতে জিহ্বা ক্রমশ লম্বা হইবে এবং ভ্রূ পর্যন্ত পৌছিতে পারিবে, এই আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। এই সব মুদ্রার কতক আবার গ্রন্থান্তরে (যথা, শিবসংহিতায়) অন্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আবার দুই একটি মুদ্রা আছে যাহার বর্ণনা ভদ্র সাহিত্যে দেওয়া অসম্ভব; যেমন শিব-সংহিতায় বর্ণিত 'বজ্রোলী' 'অমরোলী' ও 'সহজোলী' প্রভৃতি মুদ্রা। ইহাদের নাম 'যোগ-তত্ত্ব' প্রভৃতি উপনিষদেও পাওয়া যায়; কিন্তু বর্ণনা সর্বত্র একরূপ নয়। শিবসংহিতায় বর্ণিত এই সব মুদ্রায় স্ত্রী-পুরুষের শারীরিক সম্বন্ধ প্রয়োজন।

গ. প্রাণায়াম

এই জিনিসটি হিন্দুর সাধারণ পূজা-অর্চনায় ব্যবহৃত হয়, সুতরাং কম-বেশী অনেকেরই জানা। প্রাণায়ামের তিনটি অঙ্গ: ১. নাকের একটি রন্ধ্র বন্ধ করিয়া অন্যটি দ্বারা যতটা সম্ভব বায়ু ভিতরে টানিয়া লইতে হয়, ইহার নাম পূরক; ২. যতক্ষণ সম্ভব এই বায়ু ভিতরে আটকাইয়া রাখিতে হয়, ইহার নাম কুম্ভক; ৩. তাহার পর নাকের অপর ছিদ্রটি দ্বারা এই বায়ু আস্তে আস্তে ছাড়িয়া দিতে হয়, ইহার নাম 'রেচক'। এই সব করার সময় বিভিন্ন মন্ত্র জপের উপদেশও রহিয়াছে। নাসিকার দুইদিকে 'ইড়া' ও 'পিঙ্গলা' এবং মধ্যস্থলে 'সুষুম্না' নামক নাড়ী আছে, ইহাও জানানো হইয়াছে।

ষট্‌চক্র

আসন ও প্রাণায়ামই যোগের বহিরঙ্গের মধ্যে প্রধান ; এবং যোগ-সাহিত্যে ইহাদের বিস্তৃত আলোচনাও হইয়াছে। কোনো কোনো যোগ-উপনিষদে ইহার উপর ষট্‌চক্রের কথাও আছে, যথা—যোগ-চূড়ামণি উপনিষদ্‌। ষট্‌চক্রের কথা 'শিবসংহিতা', 'ষট্‌চক্র-নিরূপণ' প্রভৃতি গ্রন্থেও রহিয়াছে ; শেষোক্ত গ্রন্থটির নাম হইতেই বুঝা যায়, উহাতে ষট্‌চক্র ছাড়া আর কিছুর কথা নাই। 'ষটচক্রবাদ' ব্যক্তিবিশেষের মত নয়, যোগ ও তন্ত্রের সমন্বয়ে উদ্ভূত শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে শরীরের ছয় জায়গায় ছয়টি পদ্মাকার বা চক্রাকার নাড়ী আছে ; যথা— মাথায়, চক্ষু দ্বয়ের মধ্যস্থলে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিমূলে এবং উপস্থ-মূলে, এবং উপস্থ ও পায়ুর মধ্যস্থলে। একসঙ্গে গণিলে সাতটি হয়। অথচ, সকলেই 'ছয়' চক্রের কথা বলেন ; কিন্তু হিসাব দেওয়ার বেলায় 'পদ্ম' গণেন সাতটি। ইহার সমন্বয়ের একমাত্র উপায় একটি পদ্মকে 'চক্র' মনে না করা অথবা পদ্মদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে চক্র বলা। 'ষট্‌চক্র-নিরূপণ', 'শিবসংহিতা' প্রভৃতি অনুসারে পদ্ম কয়টির নাম নিম্নদিক হইতে এইরূপ—আধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, সহস্রার। নামগুলির কোনো বিশেষত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। ছয়টি চক্র গণিতে সাতটি পদ্মের উল্লেখ হইয়াছে, এইটুকু বুঝাইবার জন্য নামগুলি আমরা উদ্ধৃত করিলাম। এই সঙ্গে কুল-কুণ্ডলিনীর ও ডাকিনী ইত্যাদির উল্লেখ হইয়াছে এবং তাহাদের অবস্থানও বর্ণিত হইয়াছে। সে সবের কথা বলিতে গেলে একেবারে তন্ত্রে প্রবেশ করিতে হয়।

যোগসূত্রে কথিত যোগের বহিরঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ আরও

অনেক ব্যাপার নানা সাহিত্যে উপদিষ্ট হইয়াছে; যেমন, ঘেরণ্ড-সংহিতার কথিত ধৌতি ইত্যাদি। এই সব প্রক্রিয়ায় জল, বায়ু, বস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা গল-নালী, জিহ্বা-মূল, দন্ত, মল-নালী প্রভৃতি ধৌত করিয়া শরীর শুদ্ধ ও কান্তিমান্ এবং যোগক্ষম করার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এ সকলের কতকগুলি স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে গৃহীত হইবার যোগ্য; কতক বিপজ্জনক, এই পর্যন্ত আমরা বলিতে পারি। ইহার বেশী আলোচনা আমাদের বিষয়ের বাহিরে।

তন্ত্র ও বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব

এই আলোচনা হইতে দেখা যায়, একটা ক্ষেত্রে তন্ত্র ও যোগ মিলিত হইয়াছিল। শুধু তাহাই নয়, বৌদ্ধ প্রভাবও জায়গায় জায়গায় লক্ষিত হয়; যথা, শিবসংহিতায় কথিত শূন্য-ধ্যান ইত্যাদি ব্যাপারে; "তিষ্ঠন্, গচ্ছন্, স্বপন-ভুঞ্জন্ ধ্যায়েৎ শূন্যং অহর্নিশং" (৫।৬৮)— অর্থাৎ সব সময়েই শূন্য ধ্যান করিবে। ইহা কি হিন্দু উপদেশ। শূন্যপুরাণ বৌদ্ধশাস্ত্র, শূন্যপূজা বৌদ্ধ অনুষ্ঠান, সুতরাং শূন্য-ধ্যানও তাহাই নয় কি। শিব-সংহিতা গোড়ার দিকে সমস্ত দর্শনের— এমন কি বৌদ্ধ মতেরও উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে এই সকল 'বিবাদশীল' শাস্ত্রদ্বারা কোনো উপকার হয় না; সুতরাং তাঁহার কথিত যোগশাস্ত্রই সকলের অনুশীলন করা উচিত। কিন্তু শূন্য-ধ্যানের উপদেশটা যে তিনি কোথা হইতে লইয়াছেন, তাহা ভাবেন নাই।—এই সব সাহিত্যের নিকৃষ্টতা এইভাবেই ধরা পড়ে।

যোগের বহিরঙ্গ আসন ইত্যাদির আলোচনা ও অভ্যাসকে সাধারণত হঠযোগ বলা হয়। ইহাতে শরীরের কথাই ভাবা হয়; এবং যেসব উপদেশ দেওয়া হয় তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য শরীরকে যোগের উপযুক্ত

করিয়া তোলা। ধারণা, ধ্যান প্রভৃতি কাহারও কাহারও মতে রাজ-যোগ। 'যোগ-শিখা' উপনিষদ রাজ-যোগের একটা বিদ্‌কুটে সংজ্ঞা দিয়াছে।[১] নামটা এক্ষেত্রে খুব বড়ো নয়। প্রভেদটা জানা দরকার। আসল যোগে মনোবিজ্ঞান কতকটা আছে, আমরা স্বীকার করিয়াছি। হঠযোগে ও তৎসংশ্লিষ্ট তন্ত্রাদিতে যে শরীর-তত্ত্বের বিবরণ আছে, যথা—নাড়ী, চক্র ইত্যাদি—সে সমস্তই বর্তমান বিজ্ঞান মানে না, ইহাও বোধ হয় স্বীকার করা ভালো। কল্পনার সাহায্য না লইলে শরীরের ভিতর ছয়-ছয়টা পদ্ম বা পদ্মাকৃতি কিছু পাওয়া দুর্ঘট, ইহাও সহজেই বুঝা যায়। কল্পনার সাহায্য বিজ্ঞানও লইয়া থাকে। আর, আকাশের কতকগুলি নক্ষত্রসমষ্টিকে যে জ্যোতিষ মেষ, বৃষ, মিথুন ইত্যাদি রাশি রূপে দেখে, তাহাতেও কল্পনার প্রযোগ আছে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাচীনেরা নরদেহ ব্যবচ্ছিন্ন না করিয়াও শুধু চিন্তার সাহায্যে নাড়ীর রূপ ও সংখ্যা সব জানিয়াছিলেন বলিলে কিছু বেশী বলা হয়। 'নাড়ী' শব্দের অর্থও খুব স্পষ্ট নয়। আয়ুর্বেদে যাহাকে 'নাড়ী' বলে ইড়া পিঙ্গলাও কি তাহাই। ইহা ধমনী, না শিরা, না স্নায়ু, না সন্ধি বন্ধনী—সব জায়গায় তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। প্রাচীনদের জানিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, স্বীকার করি; কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের জন্য কিছুই জানিবার বাকি রাখেন নাই, ইহা মানিতেও প্রস্তুত নহি।

যোগের বহিরঙ্গ আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি দ্বারা দেহ শুদ্ধ ও কান্তিমান্ হয় এবং যোগক্ষম হইয়া চিত্তশুদ্ধিরও সহায়তা করে। ইহা খুব প্রচলিত বিশ্বাস। কার্যে অনুসরণ করা অনেকের পক্ষে এবং অনেকগুলিই কঠিন হইলেও ইহারা যে উপকারী, সাধারণ স্বাস্থ্যের পক্ষেও উপকারী—ইহা

১ "রজসো রেতসো যোগাদ্ রাজ-যোগ ইতি স্মৃতঃ"। ১৩৭ শ্লোক।

অনেকেই বলেন। ডন্, কুস্তি, জিম্‌ন্যাস্টিক্, স্যাণ্ডোর ব্যায়াম প্রভৃতিও খুব সুখকর ব্যায়াম নয়; অথচ, ইহাদের উপকারিতা তো স্বীকৃত। তেমনই যোগ-শাস্ত্রে বর্ণিত আসনাদি দ্বারাও ব্যায়ামের মতো শরীরের উপকার হইতে পারে। ইহা স্বীকার করিতে আপত্তি হওয়া উচিত নয়। এগুলির দ্বারাও পেশী, স্নায়ু ইত্যাদির সঞ্চালন হয়; সুতরাং ব্যায়ামের যাহা উপকারিতা তাহা ইহাদের না থাকিবে কেন। কিন্তু কুস্তি করিয়া কেহ আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হয়, এমন দাবি এখনও শোনা যায় নাই। যোগের প্রাণায়ামাদির বেলায় সে দাবিও রহিয়াছে। সুস্থ দেহে মনও সুস্থ থাকে, এই প্রাচীন উক্তিই এই দাবির পক্ষে প্রধান যুক্তি।

যোগের উপনিষদ্‌গুলিতে মধ্যে মধ্যে এই কথাও বলা হইয়াছে যে, চারি বেদে কোথাও ব্রহ্মবিদ্যা না পাইয়া কোনো কোনো জিজ্ঞাসু যোগের উপদেষ্টার শরণ লইয়াছিল! শিবসংহিতা প্রভৃতিও যোগের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিতে গিয়া অনুরূপ দাবি করিযাছে। ইহা যে দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যার বিরুদ্ধে একটু মৃদু প্রতিক্রিয়া—একটু পশ্চাদ্‌গমন, তাহা সহজেই মনে আসে।

যোগের উপকারিতা বিশ্বসিত বলিয়াই অতি প্রাচীন কাল হইতে এখন পর্যন্ত— অর্থাৎ অন্যূন আড়াই হাজার বৎসর যাবৎ— ভারতে, সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে বিশেষত, যোগের অনুষ্ঠান ও অভ্যাস প্রভূত হইয়া আসিতেছে। সাধুরা যাহা করেন, তাহা সব সময়েই 'সাধু', এমন বলিলে একটু অতিশয়োক্ত হয়। কিন্তু প্রাণায়াম ইত্যাদিকে 'অসাধু' মনে করিলেও অন্যায় হইবে। আর, সবগুলি না হউক, আসনগুলির কতক-গুলি যে অন্তত উপকারী, তাহা উহাদের বর্ণনা হইতেই প্রতীত হইবে। বাকিগুলির সম্বন্ধে আধুনিক যুগে একটু গবেষণা হইলে মন্দ হইত কি।

অতি-বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর অপব্যবহার ও অ-ব্যবহারের মধ্যে পড়িয়া যাহা হয়তো একটা বিজ্ঞানে পরিণত হইতে পারিত, তাহা অনাদৃত, বিকৃত ও বিলুপ্ত হইতেছে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

৩. বৈশেষিক দর্শন

সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা মল্লিনাথকে জানেন। মল্লিনাথ নিজে কাব্য-নাটক লিখেন নাই, কিন্তু টীকা করিয়াছেন কালিদাস, মাঘ ইত্যাদি অনেক কবির বইয়ের। তিনি এক জায়গায় নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিতে গিয়া লিখিতেছেন— আমি সেই ব্যক্তি, যে অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে 'বাণীং কাণভুজীং অজীগণং'— অর্থাৎ কণভুকের বাণীও পাঠ করিয়াছে। 'কণভুক্' আর 'কণাদ' একই অর্থ বুঝায়; যে 'কণ' খাইয়া থাকে। ইনিই 'বৈশেষিক' দর্শনের প্রবর্তক বা সূত্রকার। ইহার ইতিহাস বিশেষ কিছু আমরা জানি না; কিন্তু ঐতিহ্য বলে, তিনি নাকি রাস্তার ধারে কপোতের মতো চাউলের কণা— কাহারও কাহারও মতে ধানের কণা— খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন আর তপস্যা করিতেন। সেইজন্যই তিনি কণ-ভুক্, কণ-অদ, কণ-ভক্ষ ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিগত নাম 'ঔলূক্য', উলূকের পুত্র; সেইজন্য তাঁহার দর্শনকে 'ঔলূক্য' দর্শনও কহে। কেহ কেহ আবার তাঁহার নিজের নামই 'উলূক' ধরিয়াছেন। 'উলূক' শব্দের অভিধানসম্মত অর্থ 'পেচক'। উহা ভদ্র লোকের সত্য নাম, না, উপহাসে প্রযুক্ত বিশেষণ বলা কঠিন। বিশেষ বলিয়া একটা 'পদার্থ' তিনি স্বীকার করিয়াছেন; সেইজন্য তাঁহার দর্শনের অধিকতর প্রসিদ্ধ নাম 'বৈশেষিক'।

এই দর্শন যে এক সময়ে উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিল এবং পাণ্ডিত্যের অভিমান যে করিত তাহাকে-যে উহা পড়িতে হইত, তাহা মল্লিনাথের

উদ্ধৃত উক্তি হইতেই বুঝা যায়। মল্লিনাথ অবশ্যই সাংখ্য ছাড়া অন্য দর্শনের কথাও বলিয়াছেন, সেই সময়ে দর্শনের একটা মর্যাদা হইয়া গিয়াছিল। বৈশেষিকেরও সে মর্যাদা ছিল, এইটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন; কেননা, বৈশেষিক চিরকাল এই সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই।

ইতিহাস

এই দর্শনের ইতিহাসও দর্শনকারের নামের মতো নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যে সূত্রগুলি আমরা পাই, সেগুলি কণাদের রচিত, ইহাই সর্বসম্মত কিম্বদন্তী। কিন্তু মূল সূত্রের গুচ্ছে আর-কাহারও হস্ত-স্পর্শ লাগে নাই, একথা কোনো দর্শনের বেলায়ই বলিতে পারি না, এখানেও পারিব না। তবে, মূল বক্তব্যগুলি বর্তমান সূত্রের আকারেই হউক কিংবা অন্য আকারেই হউক, অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল, ইহা অনেকে মনে করিয়াছেন। সূত্রগুলির কতকগুলির অন্তত রচনা বুদ্ধেরও আগে হইয়াছিল এমন কথাও শোনা যায়। সুতরাং বৈশেষিক ন্যায় সূত্রের পূর্ববর্তী ইহাই সিদ্ধান্ত হয়।

কিন্তু প্রাচীনত্ব ও স্বাবলম্বিত্ব ইহার যতই থাকুক না কেন, শেষের দিক দিয়া অর্থাৎ একাদশ বা ত্রয়োদশ খ্রীস্টাব্দ হইতে ইহা ক্রমশ ন্যায়ের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে আরম্ভ করে; এবং ক্রমে ইহার পৃথক্ সত্তার বিশেষ আর-কোনো সম্মান থাকে নাই। পরবর্তী লেখকরা উভয় দর্শনকে সমানাত্মক বা 'সমান-তন্ত্র' মনে করিয়া একসঙ্গে বিবৃত করিয়াছেন; যেমন 'তর্ক-সংগ্রহে' অন্নম্ভট্ট, 'ভাষাপরিচ্ছেদে' বিশ্বনাথ ন্যায়-পঞ্চানন ইত্যাদি।

বৈশেষিকের দোটানা

বৈশেষিকের সূত্রগুলি এবং অধ্যায় ও বিষয়-বিভাগগুলি একটু মন দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, যেন ইহার ভিতর পাশাপাশি দুইটি চিন্তার সূত্র পরস্পরকে জড়াইয়া চলিয়াছে। বৈশেষিকের আরম্ভ—'অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ'—ধর্ম ব্যাখ্যা করিব; যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ লাভ হয়, তাহাই ধর্ম। ইহার পর ষষ্ঠ অধ্যায়ে রীতিমত বেদের ধর্মের আলোচনা হইয়াছে; দান, শ্রাদ্ধ, ভোজন, প্রতিগ্রহ ইত্যাদি অনেক শ্রুতি ও স্মৃতির বিষয় বিবেচিত হইয়াছে; ক্রিয়া যে করে সে-ই ফল পায়, না, যাহার জন্য করা হয় সে ফল পায়—পিতার শ্রাদ্ধ করার ফল পুত্র পায়, না পিতা—ইত্যাদি বিচারও হইয়াছে। কর্মের ফল কতক দৃষ্ট আর কতক অদৃষ্ট অর্থাৎ পরলোকে প্রাপ্য, ইহাও বলা হইয়াছে। এই সমস্তই মীমাংসার বিষয়। আবার দশম অধ্যায়ের শেষে বলা হইতেছে—'তদ্বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যং'—ঈশ্বরের রচনা বলিয়া বেদ প্রমাণ—এই বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করা হইয়াছে। আরম্ভ, ষষ্ঠ অধ্যায় এবং দশমের শেষ একত্রে লইলে মনে হইবে বৈশেষিক দর্শন বৈদিক ধর্মের ব্যাখ্যা—মীমাংসাজাতীয় দর্শন।

কিন্তু বাকি অধ্যায়গুলিতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইযাছে পদার্থ; দ্রব্য, গুণ ইত্যাদি। এই দুইটি বিষয়ের সম্বন্ধ তো খুব ঘনিষ্ঠ মনে হয় না। অনেকে ইহার ভিতর বিপরীতের সমন্বয়ের চেষ্টা দেখিয়া উপহাসও করিয়াছেন। একটি শ্লোক আছে—

> ধর্মং ব্যাখ্যাতুকামস্য ষট্-পদার্থোপবর্ণনং
> হিমবদ্-গন্তুকামস্য সাগর-গমনোপমং ॥

অর্থাৎ ধর্ম ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ষট্-পদার্থের বর্ণনা হিমালয়ে যে যাইতে

চায় তাহার সাগরের দিকে যাওয়ার মতো। অথচ বৈশেষিক কিন্তু ঠিক তাহাই করিয়াছে; ধর্ম ব্যাখ্যা করিব বলিয়া ষট্‌-পদার্থের ব্যাখ্যায় বসিয়া গিয়াছে।

মূল বক্তব্য— ১. প্রমাণ

দর্শনগুলির মধ্যে বৈশেষিক একটু সহজ; ইহাতে সূক্ষ্ম বিচার কম এবং উচ্চ কল্পনারও প্রশ্রয় নাই। বিচার প্রায় সব বস্তুরই হইয়াছে, কিন্তু কোনো বিচারই খুব দীর্ঘ কিংবা জটিল নয়। কোনো কোনো লেখক (যেমন বাঙালী সন্ন্যাসী সন্তদাস বাবাজী) বৈশেষিককে বালকদের মনে দার্শনিক জিজ্ঞাসা উদ্রিক্ত করার চেষ্টামাত্র মনে করিয়াছেন; পূর্ণাবয়ব দর্শন মনে করেন নাই। এতটা স্বীকার না করিলেও তর্ক-বিচারে যে ইহার স্থান ন্যায় কিংবা বেদান্তের সমতুল নয়, তাহা মানিতেই হইবে।

বৈশেষিকের প্রমাণ সম্বন্ধে মতটা একটু নূতন ধরনের। 'তদ্বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যং'—ঈশ্বর কর্তৃক উক্ত বলিয়া বেদ প্রমাণ—এই কথা সূত্রকার দুই জায়গায় বলিয়াছেন। সুতরাং শ্রুতি বা শব্দ তাঁহার একটা প্রমাণ হওয়া উচিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি দুইটি মাত্র প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন—প্রত্যক্ষ ও অনুমান; শব্দ প্রভৃতি অন্যান্য যেসব প্রমাণ অন্যেরা স্বীকার করিয়াছেন, সে সমস্তই এই দুইটির অন্তর্ভুক্ত। এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতং (৯।২।৩)— 'ইহাতেই শব্দ-প্রমাণের স্বরূপ বলা হইল'— এই এক সূত্রেই প্রায় বৈশেষিক শব্দ-প্রমাণের বিচার সমাপ্ত করিয়াছে। এইখানে কণাদ বৌদ্ধদের সঙ্গে প্রায় একমত।

কিন্তু শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করিলেও কণাদ

বেদবিরোধী নহেন। বেদ যাহা বলে, তাহা সত্য। তবে, সেই সত্য আমরা জানি শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ হইতে; সুতরাং উহা অনুমান, পৃথক্ প্রমাণ নহে। শব্দের প্রামাণ্য বক্তার বিশ্বাস্যতার উপর নির্ভর করে; যে যাহা বলে তাহাই প্রমাণ নয়; বেদ ঈশ্বরের মুখের কথা বলিয়া প্রমাণ। বেদের শব্দার্থ জ্ঞান হইতে যেমন আমরা সত্য জানিতে পারি, তেমনই লৌকিক পণ্ডিতদের কথা হইতেও আমরা জ্ঞান লাভ করিতে পারি। উভয়ত্রই শব্দের অর্থ জানিয়া পরে আমরা বস্তু জানি; সুতরাং মূলে দুই-ই অনুমান। বৈশেষিকের ভাষ্যকার প্রশস্তপাদও শব্দ 'বক্তৃ-প্রামাণ্যাপেক্ষ'—অর্থাৎ বক্তার বিশ্বাস্যতার উপর শব্দের প্রামাণ্য নির্ভর করে, এই কথা বলিয়াছেন।

২. প্রমেয়—জীব, জগৎ ও ঈশ্বর

লোকে উপহাসই করুক আর যাহাই করুক, বৈশেষিক দর্শন 'ধর্ম ব্যাখ্যা করিব' এই ভণিতা করিয়া জগৎ ব্যাখ্যা করিয়াছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছে যে যে-তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিঃশ্রেয়স্ লাভ করা যায়, তাহা ধর্মবিশেষ হইতে উৎপন্ন হয় (সূত্র ১।১।৪)। তাহা হইলে তো ধর্মের কথাই আগে বলা উচিত ছিল; কিন্তু সূত্রকার তাহা না করিয়া পদার্থের আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহাই শেষ পর্যন্ত তাঁহার দর্শন। একটু পরস্পরবিরোধী কথা ও আচরণ বলিয়া তো আপাতত মনে হয়; তবে, পরে (ষষ্ঠ অধ্যায়ে) ধর্মের আলোচনাও তিনি করিয়াছেন। আপাতদৃশ্য এই বিরোধ তাহাতে সম্পূর্ণ অতিক্রান্ত হইয়াছে কিনা, সে কথা পৃথক্।

যেসব জিনিসের তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, তাহাদের নাম 'পদার্থ'। বৈশেষিকের মতে পদার্থ ছয়টি; যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ

ও সমবায়। কেহ কেহ তর্ক তুলিয়াছেন, 'অভাব'ও একটা পদার্থ; আলোর অভাবকে অন্ধকার বলি; সেটা কি একটা পদার্থ নয়। এই প্রশ্নের পক্ষে বিপক্ষে কী কী যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে তার্কিক মাত্রেই তাহা ধরিতে পারিবেন; সেগুলি এখানে টানিয়া আনা অনাবশ্যক। 'অভাব'কে একটা পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে পদার্থের সংখ্যা হয় সাতটি। সূত্রকার কণাদ ছয়টিরই নাম করিয়াছেন— সাতটির ইঙ্গিতও করেন নাই। কিন্তু কথাটা ভাষ্যে, টীকায় এবং মাধবাচার্যের সংগ্রহে পাওয়া যায়। আমাদের পক্ষে মনে হয় সূত্রকারকে পরিত্যাগ না করাই নিরাপদ পন্থা। তবে এই সঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, সূত্রকার এক স্থানে অভাবের স্বরূপ ও শ্রেণীভেদ বিচার করিয়াছেন। শ্রেণীভেদটি উপভোগ্য। অভাব চারি প্রকারের। ১. প্রাক্-অভাব, যেমন ঘট নির্মিত হওয়ার আগে উহার অভাব; ২. প্রধ্বংস-অভাব, ঘটটি ভাঙিয়া-ফেলিলে উহার যে অভাব হয়, তাহা; ৩. অন্যোন্য-অভাব, মানুষে গোত্বের এবং গরুতে মনুষ্যত্বের যে অভাব, তাহা; ৪. অত্যন্ত-অভাব, যে জিনিস নাই, কোনো দিন ছিল না এবং কখনও থাকিবে না বলিয়া মনে করা যায়— যেমন, নর-শৃঙ্গ।

যে ছয়টি পদার্থ বৈশেষিক স্বীকার করিয়াছে, তাহার মধ্যে দ্রব্য ও গুণের অর্থ স্পষ্ট। এই কলমটি একটি দ্রব্য; আর ইহার রং, আকার ইত্যাদি ইহার গুণ, এইটুকু আমরা সকলেই জানি। কিন্তু ইহাতেই তো সমস্ত বিশ্বের ব্যাখ্যা হইবে না। কাজেই সূত্রকার দ্রব্যের একটা তালিকা দিয়াছেন, যাহার ভিতর সমস্ত বিশ্বই ধরা পড়িবে। যথা—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ; আর, কাল, দিক, আত্মা ও মন। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি প্রসিদ্ধ পঞ্চ-ভূত; বাকি চারিটির অর্থও অস্পষ্ট নয়। মনকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলা হইতেছে; ভারতীয় দর্শন তাহাই করে।

মন ইহাদের মতে একটা ইন্দ্রিয়—একাদশ ইন্দ্রিয়, সুতরাং আত্মা হইতে পৃথক্। আগে, পরে, একসঙ্গে ইত্যাদি জ্ঞান হইতে আমরা 'কাল' জানি; আর, বামে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে ইত্যাদি জ্ঞান হইতে 'দিক' জানি।

এই নয়টি দ্রব্যের মধ্যেই আবার নিত্য ও অনিত্য এই দুই শ্রেণী আছে। কোন্‌টি নিত্য আর কোন্‌টি অনিত্য তাহা বুদ্ধিমান পাঠকের পক্ষে ধরা কঠিন নয়; তথাপি আমাদের বলা উচিত। দিক্ ও কাল নিত্য, আকাশও নিত্য এবং আত্মাও তাহাই। নিত্যদ্রব্যের বিনাশ নাই, পরিবর্তন নাই, উৎপত্তি নাই। বায়ুকেও বৈশেষিক নিত্য বলিয়াছেন; আধুনিকরসায়ন বায়ুর উৎপত্তি ও গঠন জানে; সুতরাং বৈশেষিক মত আধুনিক বিজ্ঞানের সম্মত নয়। পৃথিবী, জল ও তেজ—ইহাদিগকে যেভাবে আমরা দেখি সেভাবে অনিত্য; কিন্তু ইহাদের পরমাণু আছে; সেগুলি নিত্য। বায়ুরও যে পরমাণু আধুনিকবিজ্ঞান বাহির করিয়াছে, তাহা বৈশেষিক জানিতেন না বলিয়াই উহাকে নিত্য বলিয়াছেন। পৃথিবী, জল ও তেজ চোখে দেখা যায়; সুতরাং ইহারা বিশেষভাবে দ্রব্য; পরমাণু সত্য ও নিত্য হইলেও দ্রব্যের তালিকায় পড়ে নাই; ইহাদিগকে 'বিশেষ' বলা হইয়াছে। কিন্তু মন? সূত্রকারের মতে মনও নিত্য; বায়ুর দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব যে-যুক্তিতে সিদ্ধ হয়, মনের নিত্যত্ব ও দ্রব্যত্ব সেই ভাবেই প্রমাণিত হয়। আত্মা ও ইন্দ্রিয় হইতে মন একটি পৃথক্ দ্রব্য। সুতরাং নয়টি দ্রব্যের মধ্যে ছয়টি নিত্য আর তিনটি অনিত্য, ইহাই সিদ্ধান্ত। বায়ু ও মনকে নিত্য বলার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে কিনা সে প্রশ্ন আলাদা। কিন্তু বৈশেষিক তাহাই ভাবিয়াছেন এবং যুক্তিও কিছু দিয়াছেন।

দ্রব্যের পর 'গুণ'। বিশ্বের দ্রব্যগুলি মন দিয়া চিন্তা করিলে কতক-

গুলি গুণ বৈশেষিক না পড়িয়াও আমরা আবিষ্কার করিতে পারি। তথাপি বৈশেষিকের তালিকাটি আমাদের দেখা উচিত। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ অতি প্রসিদ্ধ গুণ; তাহার পর সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন—ইহারাও গুণ; ইহার উপর, শব্দ, গুরুত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম ও অধর্মও গুণ। এই সমস্ত গুণই যে-সব দ্রব্যেতে থাকে না, ইহা সহজবোধ্য। পৃথিবীতে রূপ, রস ইত্যাদি আছে, কিন্তু বুদ্ধি বা ইচ্ছা, দ্বেষ নাই। আত্মার ইচ্ছা দ্বেষ ইত্যাদি আছে কিন্তু গন্ধ নাই। এ সকল অতি সহজ কথা। কিন্তু আমাদের বুঝা উচিত যে, এই গুণের তালিকা অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘ হইলেও সম্পূর্ণ নয়। দ্রব্যের সবগুণের কথা এখানে বলা হয় নাই, এক শ্বাসে বলা সম্ভবও নয়। যথা, আত্মার ইচ্ছা দ্বেষ যেমন আছে, ক্রোধ, লোভ, স্মৃতি, মেধা প্রভৃতিও তেমনই আছে; সেগুলিকে গুণের তালিকায় না ধরায় তালিকা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। টীকাকাররা কেহ কেহ ক্রোধ প্রভৃতি অনেক-কিছু দ্বেষের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সূত্রকারের তালিকা নির্দোষ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; তেমনি 'ইচ্ছা'র অর্থও বৃহৎ করিয়া তাহার ভিতরও আরও কতকগুলি গুণ ঢুকাইয়াছেন। ইহাতে সূত্রকারের সম্মান রক্ষিত হইতে পারে—তাঁহাকে অভ্রান্ত মনে করা যাইতে পারে—কিন্তু শব্দের অর্থ ঠিক থাকে না, অভিধান আহত হয়। গুণগুলির পরিপূর্ণ তালিকা দিতে চেষ্টা না করিয়া কয়েকটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইত। দ্রব্যের সমস্ত গুণ আবিষ্কার করা দার্শনিকের কাজ নয়; দ্রব্য ও গুণের প্রভেদ জানাই দর্শনের পক্ষে যথেষ্ট। তাহা ছাড়া সমস্ত দ্রব্যের সমস্ত গুণ আমরা এখনও জানিয়াছি কিনা সন্দেহ। পদার্থবিদ্যায় এবং অন্যান্য বিজ্ঞানে এখনও কি কোনও নূতন আবিষ্কারের অবকাশ নাই?

আর-একটা লক্ষ্যের বিষয় এই যে, কণাদ সংখ্যাকেও একটা গুণ

বলিয়াছেন। সংখ্যা, সংযোগ ও বিভাগের জ্ঞান একটি মাত্র দ্রব্য দিতে পারে না— একাধিক দ্রব্যের প্রয়োজন হয়; অন্তত দুই না হইলে সংখ্যা গণনা আরম্ভ হয় না, সংযোগ-বিভাগও হইতে পারে না।

গুণের পর কর্ম। কর্মেরও প্রকারভেদ আছে এবং তাহারও একটা তালিকা বৈশেষিক দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যথা—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। এই আলোচনা অত্যন্ত প্রাথমিক ধরনের। পদার্থবিদ্যায় প্রবিষ্ট যে-কোনও ব্যক্তি ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী জানে। প্রকৃতিতে কত রকম ক্রিয়া হয়, কত রকম গতি আছে, তাহার অতি সামান্যই বৈশেষিকের চোখে পড়িয়াছিল। উপরে উঠা, নীচে নামা, সংকুচিত হওয়া, প্রসারিত হওয়া, আর সোজা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন— ইহা ছাড়া কর্ম বা ক্রিয়ার আরও অনেক প্রকার-ভেদ আছে। পৃথিবীর চারিদিকে চন্দ্রের, অথবা সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর গতি, উৎক্ষেপণও নয় অবক্ষেপণও নয় সোজা গমনও নয়। এই সকল কর্ম বৃত্তাকার গতি না উপবৃত্তাকার, তাহা অবশ্যই বৈশেষিক জানিতেন না। তাহা ছাড়া, অণুর মধ্যে মধ্যমণির চারিদিকে বিদ্যুৎ কণারা ঘোরে কী ভাবে। কত জোরে? আকাশে বিদ্যুতের আঁকা-বাঁকা গতি কর্মের তালিকার কোন্‌টির ভিতরে বৈশেষিক ফেলিবেন। সুতরাং বৈশেষিকের কর্ম-তালিকাটি নির্দোষ এবং পরিপূর্ণ নয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়। আর, পূর্বে উক্ত পাঁচটির ভিতর পৃথিবীর জানা-অজানা সমস্ত কর্মকে ঢুকাইতে চেষ্টা করিলে শব্দের অর্থকে অভিধানের বিরুদ্ধে বিস্তৃত করিতে হয়।

বৈশেষিকের ছয়টি পদার্থের মধ্যে তিনটির পরিচয় আমরা পাইলাম। বাকি তিনটি— সামান্য, বিশেষ ও সমবায়— সম্বন্ধেও বৈশেষিক তেমন গভীর কিছুই বলেন নাই। তথাপি এই আলোচনায় বৈশেষিক কয়েকটি

সরল সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। কার্য কারণ ছাড়া হয় না, কারণ না থাকিলে কার্যও থাকিবে না, অথচ কার্যের অভাব কারণের অভাব বুঝায় না, ইত্যাদি আমাদের জানা কথা হইলেও বৈশেষিক অনেক আগে বলিয়াছেন। সামান্য ও বিশেষের মধ্যে পার্থক্যটা আপেক্ষিক। গোত্ব সকল গরুতেই আছে, সুতরাং গরুর বেলায় উহা 'সামান্য'; কিন্তু অন্য প্রাণীর তুলনায় গরুর উহা 'বিশেষ'; কারণ, গোত্ব দ্বারাই অ-গরু হইতে গরুকে বিশিষ্ট বা পৃথক্ করা হয়। তেমনই বৃষত্ব বৃষের বেলায় সামান্য, গোত্বের তুলনায় বিশেষ। কিন্তু সত্তা বা 'ভাব' সর্বদাই সামান্য, কেননা উহাকে উচ্চতর একটা সামান্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না; আর, পরমাণু সব সময়েই বিশেষ, কেননা, উহার নিম্নতর কোনো শ্রেণী নাই। আর সমবায়? দ্রব্যেতে গুণ ও কর্ম আছে, কিন্তু ইহাদের দ্রব্যের বাহিরে স্বতন্ত্র থাকিবার শক্তি নাই, ইহাদের সঙ্গে দ্রব্যের যে সম্বন্ধ তাহাই 'সমবায়'। 'সমবায' আধার ও আধেয— এই উভয়ের সম্বন্ধ। ইহা অন্যান্য পদার্থ হইতে পৃথক্ একটা পদার্থ। ইহা দ্রব্যও নয়, গুণও নয়; দ্রব্য-গুণের সম্বন্ধ। সম্বন্ধ সম্বদ্ধ বস্তু-দ্বয় হইতে পৃথক্ জিনিস। সেইজন্য সমবায়কে পৃথক্ একটি পদার্থ বলা হইয়াছে।

সমবায় সংযোগ হইতে পৃথক্; সংযোগে দুই বা ততোধিক বস্তু সংযুক্ত হয়, যেমন, মালায় গাঁথা ফুল; মালায় ফুলগুলির সংযোগ হইয়াছে কিন্তু ইহারা পৃথকও থাকিতে পারে; ইহাদের সম্বন্ধ আধার আধেয় বা আশ্রয় আশ্রয়ীর সম্বন্ধের মতো নয়।

সমবায়ের স্বরূপ লইয়া ইহাকে পৃথক্ পদার্থ বলা উচিত কি না, তাহা লইয়া তর্ক হইতে পারে, এবং হইয়াছে। বিষয়টি আমাদের সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে। পক্ষে বিপক্ষে যে সব যুক্তি তর্ক প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহা যে-কোনো বুদ্ধিমান্ ও চিন্তাশীল ব্যক্তি বৈশেষিকের সাহায্য

ছাড়াও উপস্থিত করিতে পারিবেন। সুতরাং বৈশেষিককে আর বেশী মন্থন করা নিষ্প্রয়োজন।

পদার্থের জ্ঞান হইলেই মোটামুটি বিশ্বের জ্ঞান হইল। জগতের উপাদান ও গঠনের কথা ইহা হইতেই বুঝা যায়। কিন্তু একটা প্রশ্ন বাকি আছে— জগতের উৎপত্তি হয় কিরূপে? বৈশেষিক পরমাণু স্বীকার করিয়াছে— পৃথিবী, জল ইত্যাদির পরমাণু আছে; পরমাণু বায়ুরও আছে; তবে, টীকাকারেরা যাহাই বলুন না কেন, সূত্রকার তাহা স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যাহা হোক কতগুলি পরমাণু তো আছে। ইহারা নিত্য। ইহাদের দ্বারাই জগৎ উৎপাদিত হয়, তাহা না বলিলেও বুঝা যায়; কিন্তু আপনা-আপনি, না কোনো স্রষ্টা আছে? মাল-মসলা থাকিলেই এমারত হয় না, একজন স্থপতির দরকার হয়। বিশ্বের বেলায় কী হয়। পরমাণু হইতে আপনিই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এই মত দর্শনে অজানা নয়; আবার, একজন স্রষ্টা পরমাণুগুলিকে আকার দিয়া বিশ্ব নির্মাণ করেন, একথাও দর্শন বলিযাছে। বৈশেষিকের মত কোন্‌টি? বৈশেষিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করে নাই; কিন্তু এই অস্তিত্ব— স্পষ্টত না হইলেও প্রকারান্তরে স্বীকার করিযাছে। স্বীকারটা অবশ্যই একটু নূতন ধরনের। ঈশ্বর বা তদ্বাচক কোনো বিশেষ্য পদ বৈশেষিক সূত্রে ব্যবহার করে নাই। তদ্বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যং' (১।১।৩; ১০।২।৯) এই সূত্রটিতে 'প্রসিদ্ধ'-অর্থে 'তৎ' এই সর্বনামটি ব্যবহৃত হইয়াছে, এইমাত্র। এইটি ঈশ্বরকে বুঝাইতেছে, ইহা সকলেই স্বীকার করিযাছেন। কারণ, বেদ আর কাহার বচন হইতে পারে। 'তাঁহার' বচন বলিযা বেদ প্রমাণ, এই কথা বলিলে 'তাঁহার' অর্থ 'ঈশ্বরের', ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব বৈশেষিকের স্বীকৃত, তাহা বুঝিতে হয়। কিন্তু তাঁহার স্রষ্টৃত্ব কোথাও স্পষ্ট বলা হয় নাই;

সুতরাং জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈশেষিকের মত কী তাহা লইয়া তর্ক চলে।

এইখানেই বৈশেষিকের বিশ্ব-আলোচনা সমাপ্ত করা যাইতে পারে। তাহার পর দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি এবং এইরূপ আরও অনেক আলোচনা আছে, যাহা প্রকৃতপক্ষে সাধারণ পদার্থ-বিদ্যার অন্তর্গত।

জীব বা আত্মা

জীব বা আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ অনেক রকমে করা হইয়া থাকে। বৈশেষিক যে-রীতি ধরিয়াছে তাহা আধুনিক জ্ঞানের বিরোধী নহে। প্রথমত, জ্ঞানের আশ্রয় বা জ্ঞাতা রূপেই আমরা আত্মাকে জানি। ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা প্রসিদ্ধ; কিন্তু এই জ্ঞান জ্ঞেয় বস্তুতে কিংবা ইন্দ্রিয়েতে থাকে না, তাহাও আমরা সহজেই উপলব্ধি করি; সুতরাং জ্ঞাতা এক আত্মা আছে। তাহা ছাড়া প্রাণ ও অপানের ক্রিয়া, উন্মেষ, নিমেষ, জীবন, মনের গতি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন— এই সমস্ত হইতেও আত্মার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। আর, 'আমি' এই বোধ হইতেও শরীরাতিরিক্ত আত্মা জানা যায়।

আত্মার সঙ্গে 'মনে'র কথাও ভাবিতে হয়। মন যে আত্মা হইতে পৃথক্ একটা দ্রব্য তাহার প্রমাণ, কোনো বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলেও সেদিকে 'মন' না গেলে আত্মা কিছু জানিতে পারে না। সুতরাং 'মন' ইন্দ্রিয় ও আত্মা এই উভয় হইতে পৃথক্ দ্রব্য। আত্মা এবং মন এই দুই-ই নিত্য দ্রব্য, সেকথা আমরা আগে বলিয়াছি।

প্রত্যেক-দেহে একটি মাত্র জীবাত্মা থাকে। তাহার প্রমাণ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি সমস্ত অনুভূতি ও জ্ঞানের মধ্যে 'আমি জানি' বা 'আমার

দুঃখ' এই জ্ঞান সাধারণ। এই অহংজ্ঞানের কোথাও ছেদ নাই। আর, ভিন্ন ভিন্ন দেহে যে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন এবং আত্মা যে সংখ্যায় বহু, তাহার প্রমাণ জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি সকলের এক সঙ্গে হয় না এবং একই কারণে হয় না। অধিকন্তু, "শাস্ত্র সামর্থ্যচ্চ" (৩।২।২১) —অর্থাৎ শাস্ত্রও বিভিন্ন আত্মার বিভিন্ন গতি, মুক্তি ইত্যাদির কথা বলিয়া আত্মার বহুত্ব বুঝাইয়াছেন। এইখানে বৈশেষিক সাংখ্যের সঙ্গে একমত ; যুক্তিও উভয়ত্র প্রায় একই। বৈশেষিকের এই সব যুক্তি অকাট্য, একথা আমরা বলিব না ; তবে, প্রাথমিক আলোচনার পক্ষে ইহা যথেষ্ট।

আত্মার অদৃষ্ট

আত্মার ব্যক্তিত্ব ও বহুত্ব বৈশেষিকে স্বীকৃত ; তাহার গুণ— ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন ইত্যাদির কথাও ভাবা হইয়াছে। কিন্তু এই সব ছাড়া আরও একটা ব্যাপার আত্মার হয় ; উহাকে গুণ বলিয়া গণনা করা হয় নাই ; তাহার কারণ বোধ হয়, উহা সব সময়ে আত্মাতে থাকে না, অবস্থা-বিশেষে উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইচ্ছা দ্বেষই কি সব সময় আত্মাতে থাকে ; বৈশেষিকের এই সব তালিকা যে একেবারে নির্ভুল নয়, সেকথা আমরা বলিয়াছি। তালিকাভুক্ত গুণ ছাড়া আত্মা আর-একটি যে জিনিস অর্জন করে, তাহার নাম 'অদৃষ্ট'। ইহা কৃতকর্মের সঞ্চিত শক্তি। আত্মার দেহত্যাগ (অপ-সর্পণ) এবং নূতন দেহে প্রবেশ (উপ-সর্পণ) ইত্যাদি এই অদৃষ্ট দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহার বিনাশ হইলেই আত্মার গতি রুদ্ধ হয় এবং সে মুক্ত হয়।

ঈশ্বর

স্রষ্টা বা ঈশ্বরের আলোচনা বৈশেষিক করে নাই। সৃষ্টির কথাই বা আর বিশেষ কী বলিয়াছে। সৃষ্ট, দৃশ্যমান জগতের পদার্থগুলির একটা সাধারণ জ্ঞান— প্রাথমিক জ্ঞান বলিলেও অন্যায় হইবে না— দেওয়াই দেখা যায় বৈশেষিকের প্রধান কাজ। 'ধর্ম' ব্যাখ্যা করিব বলিয়া আরম্ভ করিয়া ধান ভানিতে শিবের গীতের মতো পদার্থের বিচারেই উহা মগ্ন রহিয়া গিয়াছে। ধর্মের কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও অত্যন্ত অসম্পূর্ণ; পূর্ব-মীমাংসার বিচারের তুলনায় কিছুই নয়! আর ঈশ্বর যে আছেন, তাহাও "তদ্বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যং" এই দ্বিরুক্ত সূত্রে গৌণভাবে বুঝানো হইয়াছে মাত্র। এখানেও ঈশ্বর-বাচক বিশেষ্য নাই, শুধু সর্বনাম 'তৎ'। ইহা নিংড়াইয়াই টীকাকারেরা ঈশ্বর বাহির করিয়াছেন। আরও এক জায়গায় (সূত্র ২।১।১৮-১৯), বেদ-বক্তা ঈশ্বর ও দেবতাদের অস্তিত্ব ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই পর্যন্তই বৈশেষিকের ঈশ্বর-সত্তার আলোচনা।

বৈশেষিক ও ন্যায়

একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে, আসল দার্শনিক প্রশ্নের বিচারে বৈশেষিক খুব গভীর কিছুই বলে নাই। বেশীর ভাগই পদার্থ-বিদ্যার কথা। সেইজন্যই দর্শনের আসরে ইহার স্থান খুব উচ্চে নয়; এবং ঠিক সেইজন্যই সে ক্রমে দর্শনান্তরের সঙ্গে মৈত্রীর প্রয়োজন বোধ করিতেছিল। যে নিজে দুর্বল, তাহাকে পরের সাহায্যের অপেক্ষা করিতে হয়। আমরা 'সমানতন্ত্র'— একই কথা ভাবি ও বলি— এই বলিয়া বৈশেষিক ক্রমশ ন্যায়ের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল। ন্যায়ই

বৈশেষিককে গ্রাস করিল, না, বৈশেষিকই ন্যায়ের কোলে আশ্রয় লইল, নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন। এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য কোনো উপাদান ইতিহাস আমাদের নিকট উপস্থিত করে না। কিন্তু দুই-ই হইতে পারে। ছোটো বড়োর আশ্রয় মাগে—আর বড়ো ছোটোকে আপনার ভোগ্য করিয়া লয়, এই দুই-ই তো জগতে দেখা যায়। যেরূপই হউক, আসল কথা এই যে, বৈশেষিক ক্রমশ ন্যায়ের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িতে লাগিল।

উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই, এমন নয়। বৈশেষিকের মতে প্রমাণ দুইটি, ন্যায়ের মতে চার। ন্যায়ের শেষ দুইটি প্রমাণ শব্দ ও উপমান—বৈশেষিক প্রথম দুইটির অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। আর-একটা বড়ো প্রভেদ এই যে, উভয়ের পদার্থ-সংখ্যা এক নয়; পদার্থ-শব্দের অর্থও সেইজন্য ঠিক এক নয়। কিন্তু এই প্রভেদ সত্ত্বেও উভয়ের সমানতা অনেক বেশী। পরমাণু উভয়েই মানে; আত্মা ও ঈশ্বর উভয়ত্রই স্বীকৃত। জগতের সত্যতাও দুই-ই মানে; কার্যকারণের সম্বন্ধেও মতভেদ নাই। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বৈষম্য অপেক্ষা সাম্য অনেক বেশী।

প্রভেদ যাহা আছে তাহা ন্যায়ের গরিষ্ঠতা। প্রমাণ ও প্রমেয়ের আলোচনা বৈশেষিকে অত্যন্ত লঘু ও অপূর্ণ; ন্যায় সেখানে অনেক কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। এই সব দিকে ন্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব যখন স্বীকৃত হইতে লাগিল তখনই বৈশেষিক উহাতে মিশিয়া যাইতে লাগিল। পরবর্তী যুগে উভয়ের আলোচনা একত্রে হইয়াছে, অর্থাৎ ন্যায়েরই আলোচনা হইয়াছে; বৈশেষিকের নামটিও সঙ্গে উঠিয়াছে, সে বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হয় নাই, এই পর্যন্ত।

উভয়ের সমন্বয়ের চেষ্টা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে তর্ক-

সংগ্রহ রচয়িতা 'অন্নম্ভট্ট' খুব প্রসিদ্ধ। ইঁহার বইখানা বিস্তৃত আলোচনা নয়, 'বালানাং সুখ বোধায়'—বালকদের বুঝিবার সুবিধার জন্য সংক্ষিপ্ত সার-সংগ্রহ মাত্র। ইহাতে তিনি বৈশেষিকের পদার্থ, দ্রব্য, কর্ম ও গুণের তালিকা গ্রহণ করিয়াছেন, ন্যায়ের প্রমাণ-চতুষ্টয় স্বীকার করিয়াছেন, এবং অভাবকে পৃথক্ পদার্থ ধরিয়াছেন। এইভাবে "কণাদ-ন্যায়-মতয়োঃ, বাল-ব্যুৎপত্তি সিদ্ধয়ে"— কণাদ ও ন্যায়ের মত বালকদের বুঝিবার জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। অন্নম্ভট্ট খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীতে অন্ধ্র-দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই শতাব্দীতেই আর-একজন বাঙালী পণ্ডিতও এইরূপ সার সংগ্রহ করেন। তাঁহার নাম বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন। তাঁহার 'ভাষাপরিচ্ছেদ' এবং স্বপ্রণীত 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী' নামক টীকা ন্যায়পাঠীদের প্রাথমিক পাঠ্যরূপে এখনও ব্যবহৃত হয়।

৪

ন্যায়-দর্শন

ন্যায়-কর্তা ও ন্যায়-সাহিত্য

ন্যায়ের সূত্রকার গৌতম অক্ষপাদ। অক্ষপাদ ব্যক্তিগত নাম, আর গৌতম গোত্র-নাম ইহা সহজেই বুঝা যায়। এই নামের পশ্চাতে একটা কৌতূহলজনক কিম্বদন্তী আছে। ইনি নাকি তাঁহার মতের দূষক ব্যাসের মুখ চোখে দেখিবেন না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু পরে ব্যাসের ব্যবহারে যেমন করিয়াই হউক তুষ্ট হইয়া ব্যাসের মুখ দেখিতে ইচ্ছুক হন, কিন্তু 'চোখে দেখিবেন না' প্রতিজ্ঞার এই অংশটুকু পালন করিতে গিয়া কোনো রকমে নিজের পায়ে দুইটি চোখ আবির্ভূত করাইয়া লন এবং উহাদের সাহায্যে ব্যাসের মুখ দেখেন। সেইজন্যই এবং সেই অবধি তাঁহার নাম হয় 'অক্ষপাদ' অর্থাৎ পায়ে চোখ (অক্ষি) যাহার। ঈশপের বা বিষ্ণুশর্মার গল্পের মতো শুনিতে মন্দ নয়, কিন্তু গল্প গল্পই, ইতিহাস নয়।

গোত্র নামটি লইয়াও গোল আছে। কখনো ইহাকে 'গোতম'ও বলা হয়, তাহা হইলে নিজেই গোত্র-প্রবর্তক হইয়া দাঁড়ান। তাহা ধরিয়া লইয়া কেহ কেহ 'গোতম গোতম এব'— গোতম একটি প্রথম নম্বরের গরু — এই বলিয়া তাঁহাকে উপহাসও করিয়াছেন। তন্ত্রে ইহা অপেক্ষা খারাপ কথাও গোতমের ন্যায়-শাস্ত্র সম্বন্ধে বলা হইয়াছে— যাহারা ন্যায় পড়ে, তাহারা জন্মান্তরে শিয়াল হয় ইত্যাদি।

ন্যায়ের শাস্ত্র হিসাবে নাম 'আন্বীক্ষিকী'—অর্থাৎ যে শাস্ত্র 'অন্বীক্ষা' বা বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করে। যাহারা কথার মানে কিংবা অনুষ্ঠানের কুহেলিকায় প্রাকৃত জনের চিত্ত মোহিত করিতে চায়, তাহারা অন্বীক্ষা বা বিচার সহ্য করিতে পারিবে না, ইহা সহজেই বুঝা যায়। ন্যায়ের উপর অনেকের ক্রোধের ইহাই প্রধান কারণ।

কেহ পছন্দ করুক বা না করুক, ন্যায় একটা বিস্তৃত এবং পরিপুষ্ট সাহিত্যের মালিক। সূত্রগুলি প্রণীত হইবার আগে বিশেষ কোনো সাহিত্য ছিল বলিয়া জানা যায় না। তবে, বিষয়বস্তুটি আলোচনা দ্বারা পুষ্ট না হইলে সূত্রে গ্রথিত হইতে পারে না। সুতরাং ন্যায়ের সূত্র রচিত হওয়ার আগেও যে একটা আলোচনা —পঠন পাঠন— চলিয়াছিল, তাহা অনুমান করা যায়। তাহার পর সূত্র রচিত হয়; কবে, জোর করিয়া বলা কঠিন। ইহা মনে করা যায় যে, কেন্দ্রস্থানীয় সূত্রগুলি আগে রচিত হয় এবং বাকি ক্রমশ পরে যুক্ত হইয়া বর্তমান সূত্রগ্রন্থ উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু এই সূত্র-রচনার আরম্ভ ও সমাপ্তি কবে হইয়াছিল, তাহা লইয়া মতভেদ আছে; আর, অকাট্য প্রমাণ যখন কিছু নাই এবং পাওয়ার সম্ভাবনাও নাই, তখন এই মতভেদ দূর হইবারও নয়। খ্রীঃ পূঃ ২০০ হইতে খ্রীঃ ৪০০ অব্দের মধ্যে এই সূত্রগুলি সমাপ্ত হইয়াছে ধরিলে কোনো দোষ হয় না।

তাহার পর এই সূত্রের ভাষ্য, ভাষ্যের টীকা বা ব্যাখ্যা, সংগ্রহ-গ্রন্থ, ইত্যাদি নানা জাতীয় গদ্য-পদ্য বই মিলিয়া ন্যায়ের এক বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে। অক্ষপাদ কোন্ দেশের লোক ছিলেন বলা সহজ নহে। কেহ কেহ ইঁহাকে বিহারের লোক মনে করিয়াছেন; হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু ন্যায়-সাহিত্যের দুইটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীতে গঙ্গেশ উপাধ্যায় মিথিলাতে

একটি বিরাট স্থায়-কেন্দ্র সৃষ্টি করেন। পরে, ১৫-১৭শ শতাব্দীতে রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি বহু পণ্ডিত বাংলায় নবদ্বীপে আর-একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। উভয় স্থানেই বহু ছোটো বড়ো গ্রন্থ বচিত হয়; ইহাদের অনেকগুলি এখনও অপ্রকাশিত—হস্তলিখিত পুঁথির আকারে সংরক্ষিত। গ্রন্থকারদের সকলের নামও এখন সকলে মনে করে না।

গঙ্গেশ হইতে ন্যায়ের একটা নূতন ধারা আরম্ভ হয়; ইহাকে সাধারণত নব্য ন্যায় বলা হয়। বাংলাদেশে এই নব্য ন্যায়ের চর্চাই বেশী হইয়া আসিতেছে। বাংলায় যে শুধু নব্য ন্যায় হইয়াছে, তাহা নয়; একটা নব্য স্মৃতিও হইয়াছে। এই নব্য ও প্রাচীনের পার্থক্যটা এখানেই বলিয়া রাখা যাইতে পারে। স্মৃতির প্রাচীনতম গ্রন্থ পারস্কর, আশ্বলায়ন প্রভৃতির সূত্র সকল—বিশেষ করিয়া গৃহ্য সূত্রসকল। তাহার পর মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, পরাশর ইত্যাদি কুড়িজন 'ধর্ম-শাস্ত্র-প্রযোজক' বলিয়া স্বীকৃত ঋষির গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইঁহাদের নাম শ্রাদ্ধাদিতে পাঠ করা হয়।[1] ইহাদের পর যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টীকা 'মিতাক্ষরা' বিহার প্রভৃতি প্রদেশে স্মৃতির প্রামাণিক ব্যাখ্যা বলিয়া গৃহীত হয়। আর, বাংলাদেশে শূলপাণি, জীমূতবাহন, রঘুনন্দন প্রভৃতি নিবন্ধকার প্রামাণিক শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা বলিয়া গৃহীত হন। বাংলাদেশে রঘুনন্দনের স্মৃতিই বিশেষভাবে প্রচলিত. তবে, শূলপাণির 'প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক' ও জীমূতবাহনের 'দায়-ভাগ'ও প্রামাণিক গ্রন্থ। রঘুনন্দন ইত্যাদির বই নব্যস্মৃতি; আর আগের বইগুলি প্রাচীন স্মৃতি। ন্যায়েও

---

১ "মন্বত্রি বিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গরাঃ
যমাপস্তম্ব সম্বর্তাঃ কাত্যায়নো বৃহস্পতিঃ
পরাশরঃ-ব্যাস-শঙ্খ লিখিত দক্ষ গোতমাঃ
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্র প্রয়োজকাঃ।—ইতি।

ঠিক তেমনই গৌতমের সূত্র এবং তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত বাৎস্যায়ন-ভাষ্য ইত্যাদি প্রাচীন ন্যায়, আর গঙ্গেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মিথিলায় ও বাংলায় রচিত ও অধ্যাপিত গ্রন্থ সকল নব্য ন্যায়।

স্মৃতি এবং ন্যায় উভয়ত্রই প্রাচীন এবং নব্যের বক্তব্যের মধ্যে প্রভেদ রহিয়াছে। প্রাচীন স্মৃতির সমস্ত বিধিব্যবস্থা নব্য স্মৃতি গ্রহণ করে নাই, নূতন কথাও আছে, ব্যাখ্যার সাহায্যে প্রাচীনের নূতন অর্থও নিষ্কাশিত করা হইয়াছে, এবং যেখানে দুইটি প্রাচীন বচনের বিরোধ দেখা গিয়াছে সেখানে সমন্বয়ের চেষ্টায় তৃতীয় মতও অনুসৃত হইয়াছে। এই সমস্তের উদাহরণ আমাদের নিষ্প্রয়োজন।

ন্যায়ের প্রাচীন ও নবীনের বড়ো প্রভেদ এই যে, প্রাচীন ন্যায বা গৌতম সূত্র পরিপূর্ণ দর্শন; ইহাতে পদার্থ-জ্ঞান দ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভ হয় বলিয়া পদার্থের বিচার হইয়াছে। এই বিচারে প্রয়োজন বলিয়া প্রমাণের আলোচনাও হইয়াছে; ইহা দ্বারা জগতের ও জ্ঞানের বিচার হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে জীবাত্মা ও ঈশ্বর এবং জীবাত্মার বন্ধ-মোক্ষের কথাও বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু নব্য ন্যায়ে প্রমাণের কথাটাই প্রধান; অন্য আলোচনা আনুষঙ্গিক ভাবে অল্পবিস্তর হইয়াছে, এই মাত্র। প্রাচীন ও নবীনের এজমালি এলাকা যেটুকু সেখানেও যে কলহ না আছে এমন নয়।

ন্যায়-দর্শনের বক্তব্য

পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, ইহা ন্যায় ও বৈশেষিকের সমান মত; এইখানে উভয়ের সমান তন্ত্রতা; আর ভাষাও উভয়ে এই ক্ষেত্রে একই রকম ব্যবহার করিয়াছে। ‘তত্ত্বজ্ঞান’ এবং ‘নিঃশ্রেয়স’ উভয়েরই পরিভাষা। কিন্তু পার্থক্য দেখা দিয়াছে পদার্থের তালিকায়। বৈশেষিকের

পদার্থের কথা আমরা আগে বলিয়াছি। ন্যায়ের তালিকা স্বতন্ত্র। ন্যায়ের মতে পদার্থ ছয়টি নয়, সাতটিও নয়, ষোলটি; তাহার মধ্যে ১. প্রমাণ এবং ২. প্রমেয় প্রধান, তাহার সঙ্গে ৩. সংশয়, ৪. প্রয়োজন, ৫. দৃষ্টান্ত, ৬. সিদ্ধান্ত, ৭. অবয়ব, ৮. তর্ক, ৯. নির্ণয়, ১০. বাদ, ১১. জল্প, ১২. বিতণ্ডা, ১৩. হেত্বাভাস, ১৪. ছল, ১৫. জাতি ও ১৬. নিগ্রহস্থানের কথাও ভাবিতে হইয়াছে। এই ষোলটি পদার্থ। এই সমস্ত পারিভাষিক শব্দের সকল গুলিই সকলের অজানা নয়; অর্থ না বলিয়া দিলেও সাধারণ পাঠকও একটা আন্দাজ করিতে পারিবেন যে, এ সমস্তই তর্ক ও আলোচনার সম্পর্কিত বিষয়।

'সংশয়' (৩) অর্থ আমরা জানি। স্বর্গ আছে কিনা, ঠিক বলিতে না পারিলেই মনে সংশয় আছে বুঝিতে হইবে। যে বিষয় এতদিন বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি তাহাতেও কোনো কারণে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। লোকটাকে সৎ জানিতাম; হঠাৎ কোনো একটা ঘটনা হইতে এই বিশ্বাস বিচলিত হইয়া সংশয় ঘটাইতে পারে।

'প্রযোজন' (৪) কথাটা আমরা এত ব্যবহার করি যে, দর্শনে প্রবেশ করিয়াছি বলিয়াই তাহার অর্থ ভুলিয়া যাইতে পারি না। সংশয় অপনোদন স্বর্গলাভ, অর্থোপার্জন ইত্যাদি কত প্রয়োজনের কথা আমাদের মনে নিত্য উপস্থিত হইতেছে।

দৃষ্টান্ত (৫) ও সিদ্ধান্ত (৬) কথা দুইটিও তেমনই প্রচলিত এবং সকলের জানা। সিদ্ধান্ত আমরা যাহা করি তাহা সকলে গ্রহণ করিতে পারে, এমনও হয়, আবার এমন সিদ্ধান্তও অনেক সময় আমরা করি, যাহা সকলে মানে না।

'অবয়ব' (৭) অর্থ অনুমানের অঙ্গীভূত বাক্য। ইহার কথা পরে হইবে।

'তর্ক' (৮) অর্থও আমরা জানি, কেননা তর্ক করি। ইহার সাধারণ অর্থ পরকে বিবাদে পরাস্ত করার চেষ্টা। দর্শনে ইহার অর্থ অজানা জিনিস জানিবার জন্য হেতু ইত্যাদির অনুসন্ধান করিয়া মীমাংসা করা।

'নির্ণয়' (৯) অর্থ পক্ষ-বিপক্ষের যুক্তি বিচার করিয়া কোন্ পক্ষের যুক্তি গ্রাহ্য তাহা ঠিক করা; অর্থাৎ তর্কের পর যে মীমাংসা হয় তাহা।

'বাদ' (১০) ঠিক ঝগড়া নহে; পক্ষ-প্রতিপক্ষের যুক্তি, প্রমাণ ও তর্ক আলোচনা দ্বারা একাধিক ব্যক্তির সমবেত চেষ্টায় সত্য নির্ধারণের চেষ্টা।

'জল্প' (১১) —যে কোনো উপায়ে প্রতিপক্ষকে তর্কে পরাস্ত করার চেষ্টা। ইহাতে সত্য অনুসন্ধান অপেক্ষা বিচারে জয়ী হওয়ার আকাঙ্খা প্রবল।

'বিতণ্ডা' (১২) —চলিত ভাষায় উদ্দেশ্যহীন ও সীমাহীন তর্ক। নিজস্ব কোনো মত নাই; অথচ প্রতিপক্ষের মতের কেবল দোষ ধরার নাম বিতণ্ডা।

'হেত্বাভাস' (১৩) —যাহা হেতু নয়, অথচ দেখিতে আপাতত হেতুর মতো—হেতুর আভাস মাত্র। যাহা হইতে কিছু অনুমান করা যায় তাহাকে হেতু বলে; যেমন, ধূম অগ্নি অনুমানের হেতু। হেতু নয় অথচ হেতুর মতো যাহা তাহাই হেত্বাভাস। ধূম হইতে আগুন অনুমান করা যায়, কিন্তু আগুন দেখিয়া ধূম অনুমান করা যায় না; তাহা করিলেই হেত্বাভাস আসিয়া পড়িবে।

'ছল' (১৪) শব্দের প্রচলিত অর্থ প্রতারণা। ন্যায়ও ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছে। অন্যের ব্যবহৃত বাক্যের বা শব্দের কদর্থ করা একটা ছল। বলা বাহুল্য, ছল একাধিক প্রকারের হইতে পারে।

'জাতি' (১৫) কথাটা ন্যায় একটু বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিয়াছে। ছলের ন্যায় জাতি ও পরকে তর্কে পরাজিত করিবার অস্ত্র বিশেষ। অনুমানে আমরা যে হেতু ব্যবহার করি, তাহার সঙ্গে অনুমিত পদার্থের একটা সম্বন্ধ থাকে; যেমন ধূম ও অগ্নির মধ্যে সম্বন্ধ; যেখানে ধূম সেখানেই আগুন। এই সম্বন্ধের নাম 'ব্যাপ্তি' বা অবিনাভাব বা অব্যভিচারী সম্বন্ধ। ধূম ও আগুনের মধ্যে এই সম্বন্ধ আমরা জানি রান্নাঘর ইত্যাদিতে যখনই ধূম দেখিয়াছি তখনই আগুন দেখিয়াছি বলিয়া। এই ব্যাপ্তি জ্ঞান হইতে পাহাড়ে ধূম দেখিয়া সেখানেও আগুন আছে ইহা আমরা অনুমান করি। কিন্তু রান্নাঘর ও পাহাড়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে, যেমন, ধূম; আবার বৈসাদৃশ্যও আছে, কেননা, দেখিতে এক রকম নয়। উভয়ের সাধর্ম্য বৈধর্ম্য লইয়া কথা-কাটাকাটি সম্ভব; এবং তাহা দ্বারা অনুমান সত্য কিনা, তর্ক বাধিতে পারে। এইরূপ সাধর্ম্য বৈধর্ম্যের তর্ক তুলিযা প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিবার যে চেষ্টা, তাহার নাম জাতি। একটু নূতন অর্থ, সন্দেহ নাই। জাতি শব্দের আর একটা অর্থও আছে; অনেকের সমবায়--ব্যক্তির বিপরীত; যেমন, গোজাতি, মনুষ্যজাতি, ইত্যাদি। এই অর্থ এখানে গৃহীত হয় নাই।

১৬. 'নিগ্রহস্থান'—পরাজয়ের স্থান; নিগ্রহ অর্থ পরাজয়। যেখানে পরাজয়ের সম্ভাবনা আছে, তাহাই. নিগ্রহস্থান। পরাজয় বাদী ও প্রতিবাদীর যে কোনো জনের হইতে পারে। যে যে-কথা বলে তাহার যদি অর্থ না বুঝা যায়—অর্থাৎ 'অ-প্রতিপত্তি' হয়, কিংবা যে অর্থে যে বলে তাহার বিপরীত অর্থ যদি হয় অর্থাৎ 'বি-প্রতিপত্তি' হয়, তবে তাহার পরাজয় হইবে; ইহাই তাহার নিগ্রহস্থান। এই অপ্রতিপত্তি বা বিপ্রতিপত্তি যে বিপক্ষ ইচ্ছা করিয়া করে না, এমন নয়।

ন্যায়ের এই পদার্থের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, ন্যায়ের প্রধান

উদ্দেশ্য প্রমেয় নির্ণয় করা নয়, প্রমাণ বিচার করা। জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের কথা প্রমেয়ের মধ্যে পড়ে, সন্দেহ নাই ; এবং ন্যায় এইগুলির কথা ভাবিয়াছে, ইহাও সত্য ; কিন্তু এগুলিই তাহার প্রধান বিবেচ্য নয়। কোনো এক বিষয়ে—জীব জগৎ বা ঈশ্বর সম্বন্ধে—সংশয় হইলে প্রমাণের—বিশেষ ভাবে অনুমানের সাহায্যে—দৃষ্টান্ত ও 'অবয়ব' যথারীতিব্যবহার করিয়া 'তর্ক'দ্বারা—'প্রয়োজন' হইলে বিপক্ষের সহিত 'বাদ-বিতণ্ডা' করিয়া—তাহার 'জল্প', 'হেত্বাভাস', ও 'ছল' ধরিয়া ফেলিয়া—'জাতি' ও 'নিগ্রহস্থান' অতিক্রম করিয়া—একটা 'সিদ্ধান্ত' 'নির্ণয়' করাই ন্যায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি 'প্রয়োজন' হয় মোক্ষলাভের জন্য। কেহ বলিবে জগতের কারণ জড়, কেহ বলিবে ঈশ্বর; কোন্‌টি সত্য, 'সংশয়' হইল, মীমাংসা 'প্রয়োজন' ; কোন্ 'প্রমাণে' 'সিদ্ধান্তে' পৌছানো যাইবে ? অনুমানে ; সুতরাং অনুমানের 'অবয়ব'-গুলি জানা দরকার এবং সুষ্ঠু প্রয়োগ করা প্রয়োজন। অনুমানে দৃষ্টান্তের ব্যবহার আছে, দৃষ্টান্তটি আবার কু-দৃষ্টান্ত না হয়। দুইটি পরস্পরবিরোধী মত ; সুতরাং 'তর্ক' তো হইবেই। 'নির্ণয়' করিতে গেলে উভয পক্ষের মধ্যে 'বাদ-বিতণ্ডা' অবশ্যম্ভাবী। উহা যদি জয় পরাজযের প্রশ্নে পরিণত হয়, তবে প্রতিপক্ষ 'হেতু'র বদলে 'হেত্বাভাস' ব্যবহার করিবে, 'জল্প' ও 'ছল' প্রয়োগ করিবে, 'জাতি'র সাহায্যে বিপক্ষকে 'নিগ্রহস্থানে' ফেলিতে চেষ্টা করিবে ; বুদ্ধির যুদ্ধ হইবে। কুস্তির প্যাঁচ বা যুদ্ধের অস্ত্রের মতো এই যুদ্ধেও বুদ্ধির কসরত জানা দরকার। শেষ পর্যন্ত হয়ত মীমাংসা বা নির্ণয় হইবে যে, ঈশ্বরই জগতের কারণ। কিন্তু ন্যায়ের কাছে এই সিদ্ধান্তটাই বড়ো নয়, বুদ্ধির কৌশল, তর্কের প্যাঁচ জানাটা বড়ো। কাজেই দর্শনের প্রশ্ন অপেক্ষা যে কোনো প্রশ্ন বিচার করিবার কৌশলটাকে ন্যায় উচ্চ স্থান দিয়াছে। প্রমেয় অপেক্ষা প্রমাণ ইহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে বেশী।

এই প্রমাণের আলোচনা ন্যায়ে—বিশেষত নব্য ন্যায়ে—ক্রমশ এত ঘোরালো হইয়া ওঠে যে, সাধারণ লোকে ভাবিত, ন্যায় শুধু তর্কই করিতে জানে, মীমাংসা চায় না। ন্যায়ের নামান্তর হয় 'তর্ক'-শাস্ত্র; নৈয়ায়িক আর তার্কিক এক হইয়া যায়; এবং বড়ো নৈয়ায়িকেরা 'তার্কিক-শিরোমণি,' ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করিতে থাকেন। সাধারণে এই তর্ককে ফাঁকা তর্ক মনে করিয়া উপহাসও করিত; তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল—তৈল পাত্রে থাকে না পাত্র তৈলে থাকে—এই ধরনের তর্ক নৈয়ায়িক তর্কের নমুনা বলিয়া মনে করিত। আর নব্য ন্যায়ের 'কচ-কচি'কে 'বাঙালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার' বর্তমান যুগের কোনো বিশিষ্ট বাঙালীও মনে করিয়াছেন। কিন্তু এতটা অশ্রদ্ধা সত্যসত্যই ন্যায়ের প্রাপ্য নয়। শরীরের ব্যায়ামের যদি উপকারিতা থাকে, বুদ্ধির ব্যায়ামের কি কোনোই উপকারিতা নাই?

প্রমাণ

ন্যায়ের মতে প্রমাণ চারটি—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। বৈশেষিকের সঙ্গে এইখানে ন্যায়ের যে প্রভেদ আছে, সে কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বাহ্যবস্তুর সহিত সন্নিকর্ষ হইলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ কখন জ্ঞান হয় আর কখন হয় ভ্রম, তাহা ধরিবার উপায় আছে। রজ্জু দেখিয়া হঠাৎ সর্প দেখিতেছি মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহার সহিত সর্পের মতো ব্যবহার করিলেই দেখা যাইবে, উহা সর্প নয়, উহা নড়ে না, আঘাত করিলেই ফোঁস করে না, ইত্যাদি; সুতরাং উহা দেখিতে যাহাই হউক না, উহা রজ্জু। এইভাবে অন্যান্য প্রত্যক্ষেরও ভুল শোধরাইয়া লওয়া যায়। প্রত্যক্ষ হইতে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা সকল

দর্শনেই স্বীকার করিয়াছে; এবং ইহাতে ভুলের সম্ভাবনা এবং ভুল শোধরাইবার উপায়ও কম বেশী সর্বত্রই আলোচিত হইয়াছে। ন্যায়ের আলোচনা বিস্তৃত, তীক্ষ্ণ এবং গভীর নিশ্চয়ই; তথাপি এই ক্ষেত্রে তাহার বিশিষ্ট দান—নিজস্ব আবিষ্কার--খুব বেশী নয়।

অনুমান

ন্যায় সর্বাপেক্ষা বেশী আলোচনা করিয়াছে অনুমানের; এবং এই ক্ষেত্রে তাহার কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, ন্যায়ের মতে অনুমান তিন প্রকার। বৌদ্ধদের মতে উহা দুই প্রকার— স্বার্থ ও পরার্থ। ন্যায়ের তিন প্রকার অনুমানের নাম— পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতঃ দৃষ্ট। কারণ দেখিয়া কার্যের অনুমান— যেমন মেঘ দেখিয়া ভবিষ্যৎ বৃষ্টির অনুমান 'পূর্ববৎ'। কার্য দেখিয়া অতীত কারণের অনুমান— যেমন ঘরের ছাদ জল-সিক্ত দেখিয়া অতীত বৃষ্টির অনুমান 'শেষবৎ'। আর-একটা সামান্য সত্য হইতে বিশেষ সত্যের অনুমান 'সামান্যতঃ দৃষ্ট', যেমন— যদি জানি যে কারণ ছাড়া কার্য হয় না এবং পরে যদি জানি যে জগৎটা একটা কার্য, তবে জগতের একটা কারণ আছে, ইহা অনুমান করিতে পারিব; ইহার নাম 'সামান্যতঃ দৃষ্ট'। অথবা কর্তা করণ ছাড়া কাজ করিতে পারে না, এই সাধারণ সত্য যদি গ্রহণ করি, এবং ইহাও যদি জানি যে আত্মা জ্ঞান অর্জন রূপ কার্য করে, তাহা হইলে অনুমান হইবে, আত্মার করণ বা ইন্দ্রিয় আছে। ইহাও সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমান।

অনুমান যখন ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তখন উহাতে পাঁচটি বাক্য থাকে; ইহাদিগকে 'অবয়ব' বলে। সেইজন্য অনুমানকে 'পঞ্চাবয়ব' বলা যায়। যথা—১. পর্বতে আগুন আছে; ২. যেহেতু সেখানে

ধূম দেখা যাইতেছে ; ৩. যেখানে ধূম থাকে, সেখানে আগুনও থাকে, যেমন রান্নাঘর ইত্যাদিতে ; ৪. পর্বতে ধূম দেখা যায় ; ৫. অতএব, পর্বতে আগুন আছে, ইহাই সিদ্ধান্ত। এই বাক্য পাঁচটির পারিভাষিক নাম আছে। প্রথমটির নাম প্রতিজ্ঞা ; এখানে যাহা 'সাধ্য' অর্থাৎ যাহা প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ হয় ; 'আগুন' এখানে 'সাধ্য'। যেখানে এই আগুনের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হইবে, সেই পর্বতকে বলা হয় 'পক্ষ' ; ইহাও একটি পারিভাষিক শব্দ। অনুমানের দ্বিতীয় বাক্য বা অবয়বটির নাম 'হেতু' ; ইহার অর্থ স্পষ্ট ; নামান্তর লিঙ্গ, অর্থাৎ চিহ্ন। তৃতীয় বাক্যটিতে যে চিন্তা প্রকাশ পাইতেছে তাহার নাম 'পরামর্শ', উহাতে 'রান্নাঘর' ইত্যাদি উদাহরণও দেওয়া হইয়াছে। চতুর্থ বাক্যটির নাম 'উপনয়' যে হেতু হইতে আগুনের অনুমান হয়, তাহা যে এক অধিকরণ বা পক্ষে বর্তমান আছে, এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলার নাম উপনয় ; ইহাতে 'হেতু' এবং 'পক্ষ' একসঙ্গে উক্ত হয়। পঞ্চম বাক্যটির নাম 'নিগমন' বা নির্ণয়। যাহা প্রমাণ করা হইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, তাহা প্রমাণিত হইল—ইহাই নিগমনের অর্থ। এইজন্য এই বাক্য অতএব দিয়া আরম্ভ হয়।

অগ্নি আর ধূমের মধ্যে যে সম্বন্ধ—অর্থাৎ অগ্নি ছাড়া ধূম থাকিতে পারে না, এই যে সম্বন্ধ,—ইহার নাম 'অবিনাভাব' বা অব্যভিচার সম্বন্ধ ; ইহার সংক্ষিপ্ত নামান্তর 'ব্যাপ্তি'। অগ্নি ব্যাপক—কেননা সব জায়গায় ধূমেই আছে ; আর ধূম 'ব্যাপ্য'। ধূম ব্যাপক নয়, কেননা, অগ্নি যেখানে আছে সেখানেই ধূম থাকে না। সুতরাং আগুন দেখিয়া ধূমের অনুমান ভুল হইবে। ব্যাপ্য দেখিয়া ব্যাপক অনুমান করা যায়, কিন্তু উহার বিপরীতটি অর্থাৎ ব্যাপক দেখিয়া ব্যাপ্যের অনুমান ভ্রান্ত।

ন্যায়ের এই অনুমানের আলোচনায় বহু তর্ক আছে, সূক্ষ্ম বিচার

আছে, মতভেদও আছে—এবং বাদ-বিতণ্ডাও বহু আছে ; একটা ছোটো-খাটো সাহিত্য ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধদের সঙ্গে এইখানে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের পক্ষে এইক্ষেত্রে দিগ্‌দর্শনের বেশী কিছু করিবার উপায় নাই।

উপমান ও শব্দ

'উপমানে'র অর্থ সহজ। কেহ আমায় বলিল, গবয় নামক জন্তু দেখিতে গরুর মতো। ইহার পর আমি যদি একটা জন্তু দেখি যাহা গরুর মতো দেখিতে, অথচ গরু ঠিক নয়, তাহা হইলে কি তৎক্ষণাৎ আমার জ্ঞান হইবে না যে, উহা গবয়? ইহারই নাম উপমান। সাদৃশ্য জ্ঞান হইতে একটা অজ্ঞাত-পূর্ব বস্তুর জ্ঞান। তর্ক হইয়াছে, উপমানকে পৃথক-প্রমাণ মনে করিব কেন? ন্যায় মানিয়াছে এবং এই তর্কের উত্তরও দিয়াছে। যাহারা সে উত্তরে সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহাদের মতে উপমান স্বতন্ত্র প্রমাণ নয়।

ন্যায়ের চতুর্থ প্রমাণ 'শব্দ'। 'আপ্ত' অর্থাৎ যে যে-বিষয় বিশেষজ্ঞ তাঁহার উপদেশ হইতে যে জ্ঞান হয় তাহারই নাম 'শব্দ'। আপ্ত বলিতে যে বৈশিষ্ট্য বুঝায় তাহা যে কোনো ব্যক্তির থাকে না ; আর, সকলে সকল বিষয়ে আপ্ত নন, ইহাও আমরা সাধারণ জ্ঞান হইতেই বুঝি। বেদ যাঁহাদের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তাঁহারা সকল আপ্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; অতএব বেদ একটা বড়ো প্রমাণ। লোকে মুনি ঋষি প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জ্ঞানদৃষ্টিও সংশয়ের অতীত ; সুতরাং তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাও প্রমাণ। তেমনই পদার্থবিদ্ বা জ্যোতির্বিদ্ অণুর শক্তির কথা অথবা নক্ষত্রের দূরত্বের কথা যাহা বলেন তাহাও আমাদিগকে

প্রমাণ বলিয়া শিরোধার্য করিতে হয়। নিজেদের শাস্ত্রে তাঁহারাও আপ্ত, সুতরাং তাঁহাদের উপদেশও শব্দ প্রমাণ।

'শব্দ' দুইপ্রকার; দৃষ্টার্থ আর অদৃষ্টার্থ। যেখানে শব্দ হইতে যে জ্ঞান হয় তাহা লৌকিক অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায়, সেখানে শব্দ দৃষ্টার্থ। যেমন কাহারও নিকট শুনিয়া যদি জানি পায়েস খাইতে ভালো, এবং তাহার পর যদি উহা অভিজ্ঞতায়ও জানিতে পারি—খাইয়া দেখিয়া—তাহা হইলে পূর্বের শাব্দ-জ্ঞান দৃষ্টার্থ হইল। কিন্তু জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞ করিয়া স্বর্গে যাওয়া যায়, ইহা বেদ বলিয়াছে, সুতরাং ইহা প্রমাণ, আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু এ জীবনের অভিজ্ঞতায় তো উহা আর জানা যাইবে না; সুতরাং এই ক্ষেত্রে শব্দ অদৃষ্টার্থই রহিয়া যাইবে।

শব্দের অর্থ বুঝাইবার যে শক্তি তাহা ঈশ্বর দিয়াছেন। 'স্বর্গ' বলিলে যে শহরের বস্তি না বুঝাইয়া আর কিছু বুঝায়, সেই শক্তিটি স্বর্গ-শব্দ ঈশ্বরের নিকট পাইয়াছে; মানুষের কাছে নয়।

এইখানেই ন্যায়ের প্রমাণ আলোচনা সমাপ্ত করিতে হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া যে-বৃক্ষ কাণ্ড শাখায় বিস্তৃত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস আমরা দিতে পারিলাম না, ফলটি মাত্র উপস্থিত করিয়াছি। অনুমানের ও তাহার পঞ্চ অবয়বের বিচার ন্যায়ের একটি বিশেষ কৃতিত্ব। কিন্তু সেখানে জৈন ও বৌদ্ধ দার্শনিকেরাও কম কৃতিত্ব দেখান নাই। সকলের সমবেত চেষ্টায়ই হয়ত এই জিনিসটি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই পঞ্চাবয়ব অনুমান পাশ্চাত্ত্য অনুমানের অনুরূপ। পশ্চিমে ইহার আবিষ্কারক আরিস্ততল্‌কেই ধরা হয়। তাঁহার আবির্ভাব-কাল খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী। আরিস্ততলের পূর্বে প্ল্যাতো ও সক্রেতিসের চিন্তারও ইহার পূর্বাভাস দেখা যায়। কিন্তু ভারতে মনে হয় ইহারও পূর্ব হইতে অনুমানের আলোচনা আরম্ভ হইয়া থাকিবে। এখানে উত্তমর্ণ-

অধমর্ণের প্রশ্ন তোলা বৃথা; কেননা, তাহার সর্ব-সম্মত মীমাংসা অসম্ভব।

প্রমেয়—আত্মা ও জগৎ

ন্যায়ে প্রমেয়ের তালিকাটি এইরূপ—১. আত্মা, ২. শরীর, ৩. ইন্দ্রিয়, ৪. অর্থ বা ইন্দ্রিয়ের বিষয়, ৫. বুদ্ধি, ৬. মন, ৭. প্রবৃত্তি, ৮. দোষ, ৯. প্রেত্যভাব, ১০. ফল, ১১. দুঃখ, ১২. অপবর্গ (সূত্র, ১।১।৯)। ইহাদের প্রত্যেকটির অস্তিত্বের প্রমাণ ন্যায়-সূত্র দিয়াছে। আত্মা রহিয়াছে এবং তাহার গুণও আছে। ইন্দ্রিয়ের বিষয় হিসাবে পঞ্চভূত এবং জগৎ পাওয়া যায়। শরীর এবং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে লোকের এমন কোনো সংশয় হয় না যে, বিশেষ করিয়া ইহাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করা দরকার। চার্বাকপন্থী প্রভৃতি অনেকে দেহাতিরিক্ত আত্মা অস্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করা দরকার; কিন্তু দুঃখও কি সেইরূপ? প্রেত্যভাব বা জন্মান্তর-ভাবিবার মতো প্রশ্ন স্বীকার করি; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই তালিকায় ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ন্যায় স্বীকার করিয়াছে এবং প্রমাণও করিয়াছে। কিন্তু প্রমেয়ের তালিকায় তাঁহার অনুল্লেখের পক্ষে কোনো যুক্তি দেয় নাই। তবে আমাদের জানা দরকার যে, অন্যান্য দর্শনের মত খণ্ডন করিয়া ন্যায় এই প্রমেয়সকল প্রতিপন্ন করিয়াছে।

আত্মা অনুমিত হয় তাহার গুণ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ, ও জ্ঞান হইতে। ইহা বৈশেষিকের অনুরূপ সিদ্ধান্ত। অথচ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, দুঃখও (সুখ নয়) একটি পৃথক্ প্রমেয় পদার্থ।

শরীরকে জানি কিরূপে? চেষ্টা এবং ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়রূপে।

কথাটা তেমন গভীর কিছু নয়, তবে অসত্যও নয়। একটু গোলমাল এই যে, আত্মার বেলায় যেমন সুখ-দুঃখকে তাহার গুণ বলা হইয়াছে এবং তাহা হইতে আত্মার জ্ঞান হয় বলা হইয়াছে, অথচ সুখ বাদ দিয়া দুঃখকে একটা পৃথক্ প্রমেয়ও বলা হইয়াছে, এখানেও তেমনই শরীরও প্রমেয় এবং ইন্দ্রিয়ও তাহাই, অথচ ইন্দ্রিয় হইতে শরীরের অস্তিত্ব জানি, বলা হইতেছে। একটি প্রমেয় হইতে আর-একটি প্রমেয় জানার কোনো বাধা নাই; কিন্তু যে সমস্ত হইতে আত্মা বা শরীর জানা হয়, তাহাদেব সবগুলি প্রমেয় নয় কেন। দুঃখ প্রমেয় হইলে সুখ প্রমেয় নয় কেন। সুখ কি স্বতঃসিদ্ধ। ইন্দ্রিয় প্রমেয় হইলে চেষ্টা প্রমেয় নয় কেন।

ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব জানি কিরূপে? পঞ্চভূত হইতে? পঞ্চভূত জানি কিরূপে? উত্তরে ন্যায় ভূত সকলের তালিকা ও তাহাদের গুণের বর্ণনা দিয়াছে। এই সকল গুণ—রূপ, রস ইত্যাদি—আবার ইন্দ্রিয়ের বিষয় বা অর্থ। সুতরাং ভূত ও তাহার গুণও প্রমেয়। অর্থাৎ এক প্রমেয় ইন্দ্রিয দ্বারা কতকগুলি গুণ জানি; তাহা হইতে জানি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, অর্থাৎ আর এক প্রমেয়। আবার পঞ্চভূতের জ্ঞান হইতে জানি যে ইন্দ্রিয় আছে। আগের কথা ইহার সঙ্গে যোগ দিলে বলিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয় হইতে জানি আত্মা। একটু বৃত্তাকারে ঘোরা হইতেছে না কি? জ্ঞানের যৌগপদ্য স্বীকার করিলে ন্যায়ের উত্তরটা হয়ত সহজ ও স্পষ্ট হইত।

বুদ্ধি আর উপলব্ধি আর জ্ঞান একই জিনিস। সুতরাং প্রমেয় হইলেও ইহার জন্য আর প্রমাণ উপস্থিত করা সূত্রকার প্রয়োজন মনে করেন নাই।

মন সম্বন্ধে বৈশেষিকের সঙ্গে ন্যায়ের কোনো প্রভেদ নাই ; প্রমাণও উভয়ের এক।

'প্রবৃত্তি' যে আছে তাহার কি কোনো প্রমাণ দেওয়া দরকার? ইহা হইতে বাক্, বুদ্ধি ও শরীরের আরম্ভ হয় বলা হইয়াছে। উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে, এই সব ফল বা কার্য হইতেই তো প্রবৃত্তি অনুমিত হইবে। আত্মার 'প্রবৃত্তি' তাহার দেহ লাভের কারণ বলিলে হইত না কি? বুদ্ধি ও বাক্ তো আত্মার গুণ! এই বিভাগ ও আলোচনা খুব বিজ্ঞান-সম্মত নয় বলিলে নৈয়ায়িক অসন্তুষ্ট হইবেন, বুঝিতে পারি ; কিন্তু বলা চলে।

যাহা হইতে প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়, তাহার নাম 'দোষ'; রাগ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি দোষ। রাগ কি প্রবৃত্তি হইতে খুব পৃথক? 'দ্বেষ' তো আত্মার গুণ। নৈয়ায়িকেরা তর্ক করিয়াছেন প্রচুর ; কিন্তু সিদ্ধান্তের বেলায় সব সময় দোষ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। 'প্রেত্যভাব' অর্থ দেহান্তর-প্রাপ্তি। নূতন পরিভাষা, অর্থ নূতন নয় এবং অন্য দর্শনের অজ্ঞাতও নয়।

প্রবৃত্তি ও দোষ মিলিয়া মানুষের সুখ-দুঃখ উৎপাদন করে ; উহাই 'ফল'। দোষ হইতে প্রবৃত্তি হয় ; আবার উভয়ে মিলিয়া 'ফল' উৎপাদন করে ; সেই ফল আবার আত্মার গুণ।

'দুঃখ' কথার অর্থ মোটেই অস্পষ্ট নয় ; কিন্তু যাহা অস্পষ্ট তাহা হইতেছে এই যে, ইহাকে একাধারে পৃথক্ প্রমেয়, আত্মার গুণ, এবং আর-একটি প্রমেয় 'ফলের' অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে কেন। 'দুঃখ'কে প্রাধান্য দেওয়াই মনে হয় অব্যক্ত উদ্দেশ্য ; তাহা হইলে সরল ভাবে সাংখ্য ও বৌদ্ধ মতটা ধরিয়া লইলেই তো হইত!

'অপবর্গ' বা মুক্তিও বহু ব্যবহৃত শব্দ, অর্থও অস্পষ্ট নয়; স্বরূপ লইয়া যে তর্ক আছে, তাহা এখানে না উঠাইলেও চলে।

এই সমস্ত প্রমেয়। তালিকাটি একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহার ক্রটিও চোখে পড়িবে আর বৌদ্ধাদি দর্শনের যে ছায়াপাত হইয়াছে তাহাও ধরা পড়িবে। প্রবৃত্তি বা বাসনা, প্রেত্যভাব বা জন্মান্তর, এবং দুঃখ ইত্যাদি বিষয়ে ন্যায় এবং সাংখ্য, বৌদ্ধাদি দর্শনের মধ্যে প্রভেদ বাস্তবের অপেক্ষা ভাষারই বেশী।

প্রমেয়ের এই আলোচনায় আত্মা এবং জগৎ পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ ভাবেই বিবেচিত হইয়াছে। পঞ্চভূতাত্মক জগৎ ন্যায় স্বীকার করে; ইহা মায়া নয়, স্বপ্ন নয়। আর, পৃথিব্যাদি ভূতের পরমাণুও বৈশেষিকের মত ন্যায় মানে। সুতরাং জগৎ সম্বন্ধে ন্যায়ের সিদ্ধান্তে কোনো কুহেলিকাও নাই, খুব গভীরতাও নাই। আত্মার পূর্বজন্ম ও পরজন্ম ন্যায় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রেত্যভাব অর্থই দেহান্তর প্রাপ্তি; পূর্ব জন্মের একটা প্রমাণ, শিশুর সংস্কার; জাত-মাত্রই শিশু স্তন্য পান করিতে পারে; কেহ তো শিখায় নাই; পূর্বজন্মের অভিজ্ঞতা হইতে সঞ্জাত এই সংস্কার রহিয়া গিয়াছে। তেমনই কর্মফল প্রাপ্তির জন্য আর-একটা জীবন মানিতে হয়; সুতরাং মৃত্যুর পর দেহান্তর প্রাপ্তিও ঘটে। এই সমস্তই ভারতীয় দর্শনের সাধারণ স্বীকার্য; ন্যায় এই ক্ষেত্রে নূতন কথা কিছু বলে নাই।

ঈশ্বর

ন্যায় ঈশ্বরের কথা তুলিয়াছে জগতের কর্তা রূপে (৪।১৯)। বৈশেষিক ঈশ্বর অবিশ্বাস করে নাই, কিন্তু নামটি লয় নাই, 'তিনি' বলিয়াই শেষ করিয়াছে; প্রমাণ দিয়া অস্তিত্বও প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা

করে নাই। ন্যায় নামটিও লইয়াছে, অস্তিত্বের প্রমাণও দিতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রথম প্রমাণ, জগৎ কার্য, একজন কর্তা তাহার থাকা যুক্তিসংগত; উপযুক্ত কর্তা ঈশ্বর ছাড়া আর কেহ হইতে পারে না; অতএব ঈশ্বর আছেন। কর্তা উপকরণ ছাড়া কাজ করিতে পারেন না; ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টির উপকরণ পরমাণুসকল। হয়ত, মানুষ যে কর্ম করে তাহার ভালো-মন্দ ফল তাহাকে পাইতে হইবে; এই কর্মফলদাতা ঈশ্বর ছাড়া আর কে হইতে পারে? মানুষে মানুষে যে প্রভেদ—কেহ বড়ো কেহ ছোটো, ইত্যাদি—এ সমস্ত মানুষের কর্মফল বা অদৃষ্ট। একজন বিধাতা না থাকিলে এই অদৃষ্ট ফল দিতে পারিত না; অতএব বিধাতা বা ঈশ্বর আছে। ন্যায়ের মতে কর্ম নিজের ফল নিজেই দিতে পারে না; সুতরাং কর্মফল দেওয়ার জন্য ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়। কর্ম আপন ফল আপনি দেয় যাঁহারা বলেন, যেমন পূর্বমীমাংসা, তাঁহাদের কর্মফলের জন্য ঈশ্বর প্রয়োজন হয় না। ন্যায়ের এই সব যুক্তিতে সংশয় হইতে পারে; পূর্বপক্ষ, উত্তর-পক্ষ, আপত্তি ও প্রতিপত্তি আছে; ইহাই তো দর্শন। ন্যায়ের এই আলোচনা যাহা দান করিয়াছে তাহা নগণ্য নয়; বরং অনেক স্থলে উহা শ্রেষ্ঠ চিন্তার পরিচায়ক।

ন্যায়ের পরিভাষা ও ভাষা

ন্যায়ের পরিভাষার কিছু নমুনা আমরা দিয়াছি। পরিভাষার জন্য ন্যায় প্রসিদ্ধ—বিশেষত নব্যন্যায়। যথেচ্ছভাবে পরিভাষা ব্যবহার করিলে সেই ভাষা সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন হইবেই। প্রাচীন ন্যায়ের তত না হইলেও নব্য ন্যায়ের ভাষা বাস্তবিকই কঠিন। তিন হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ ছয় অক্ষরে রচিত শব্দের আট দশটি দ্বন্দ্ব,

কর্মধারয়, বহুব্রীহি প্রভৃতি সমাসে একত্র করিয়া একটি পদ রচনা করিলে উহা যে দুষ্পাচ্য হইবে তাহা সহজেই কল্পনা করা যায়। নব্য ন্যায় সেইরূপ পদ অত্যন্ত পারিপাট্যের সহিত সৃষ্টি করিয়াছে।

যে সব পরিভাষা আমরা দিয়াছি তাহা ছাড়া আরও কয়েকটি দুষ্পাচ্য পারিভাষিক শব্দ ন্যায় অতি নিপুণভাবে প্রায় যেখানে সেখানে ব্যবহার করিয়াছে। অবচ্ছেদ, অবচ্ছেদক, প্রতিযোগী ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ না হইলে ন্যায়ের—বিশেষত নব্যন্যায়ের—ভাষাই হয় না। ন্যায়ের শিশুপাঠ্য বই হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের 'ভাষা পরিচ্ছেদ' ও তাঁহার নিজের টীকা 'সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী' ন্যায়ের প্রাথমিক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই মুক্তাবলী হইতে যদৃচ্ছাক্রমে এক ছত্র তুলিতেছি—

"সংসর্গাভাবত্বং অন্যোন্যাভাবভিন্নাভাবত্বং অন্যোন্যাভাবত্বং
তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাবত্বং"—ইত্যাদি (৯)।

এখানে 'অবচ্ছিন্ন' ও 'প্রতিযোগিতা' এই কথা দুইটি আছে; ব্যস্তভাবে ইহাদেব অর্থ তেমন কঠিন নয়; কিন্তু সমস্তভাবে যে পঙ্‌ক্তিটি রচিত হইয়াছে, সংস্কৃতজ্ঞ যে কোনো ব্যক্তি পড়িবামাত্রই তাহার অর্থ বলিতে পারিবেন না। সারাংশ এই; ঘটে পট নাই;—ঘটে পটত্বের অভাব আর পটে ঘটত্বের অভাব, অন্যোন্য অভাব; দুইটিই ভাব-বস্তু, কিন্তু পরস্পরে অভাব। এই অন্যোন্য অভাব সংসর্গ-অভাব হইতে ভিন্ন। কথাটা কি আর একটু সহজ ভাষায় প্রকাশ করা যাইত না? অথচ ইহাই কিন্তু প্রাথমিক পাঠ্য বইয়ের ভাষা। আর দৃষ্টান্ত দিব না, অনেকে সহ্য করিতে পারিবেন না।

ভাষা বেশী কঠিন হইলে সাধারণ লোকে উহাকে অর্থহীন মনে করে। চার্বাক যে "জর্ভরী তুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতং" বলিয়া

বেদের মন্ত্রকে উপহাস করিয়াছিলেন তাহাও উহার দুর্বোধ্যতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই। তাঁহার বক্তব্যের অর্থ এই যে তথাকথিত পণ্ডিতেরা অর্থহীন বাক্যদ্বারা লোক ঠকান। বেশী কঠিন ভাষা ব্যবহারে এই বিপত্তি তো আছেই। কাব্যের ভাষা কঠিন হইলে লোকে বলে হেঁয়ালি। বক্তব্য সরল ভাষায় প্রকাশ করা একটা প্রশংসনীয় কৃতিত্ব। যীশু হিব্রু ভাষায় নয়, হিব্রুর একটা অপভ্রংশে নিজের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বুদ্ধ সংস্কৃত জানিতেন, কিন্তু উপদেশ দিয়াছিলেন সাধারণের বোধ্য পালিতে। মহাবীরও সংস্কৃতের আশ্রয় লন নাই, ধর্ম-প্রচার করিয়াছিলেন প্রাকৃতে। ন্যায় সেই পথ ধরে নাই। ইহার ভাষা সংস্কৃত ছিল, তাহাতে কিছু বলিবার নাই, কেননা, সংস্কৃতই তখন পণ্ডিতদের ভাষা ছিল। কিন্তু ন্যায় এমন সংস্কৃত ব্যবহার করিযাছিল যে, মাঘ ভারবি শ্রীহর্ষের ভাষা আয়ত্ত করিযাও ন্যায়ের দশ ছত্রের অর্থ করিতে গলদঘর্ম হইতে হয়।

গভীর তত্ত্ব সব সময় অত্যধিক সরল ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, স্বীকার করি; আইন্‌স্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ 'ক' 'খ' র সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না। দার্শনিকেরাও সেইজন্য কঠিন ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। জার্মান দার্শনিক কাণ্ট্ ও হেগেলের ভাষা এত কঠিন যে অনুবাদেও তাহাকে সরল করা কষ্টকর। ন্যায়ের পক্ষেও কতকটা এই যুক্তি প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু কাণ্ট্ হেগেল নিজেরা যতই কঠিন ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকুন না কেন, তাঁহাদের বক্তব্য অন্যে ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় সহজে প্রকাশ করিয়াছেন। কাণ্ট্ হেগেল্ যে এত কঠিন ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহার কারণ, কাহারও কাহারও মতে, তাঁহাদের সাহিত্যচর্চার অভাব; সাহিত্যের মোলায়েম ভাষার সঙ্গে নিকট পরিচয় থাকিলে তাঁহাদের ভাষা হয়ত এত রুক্ষ হইত না।

ন্যায়ের বেলায়ও কতকটা সেই যুক্তি প্রযোজ্য। নৈয়ায়িকেরা ভাষায় ও ব্যাকরণে কাঁচা, ইহা বাংলাদেশে প্রসিদ্ধ। শাব্দিক আর তার্কিক কদাচিৎ এক ব্যক্তিতে দেখা যায়। একটা উদ্ভট শ্লোক আছে—'যত্র শাব্দিকস্তত্র তার্কিকঃ' ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই যে পণ্ডিতম্মন্য মূর্খ যেখানে শাব্দিক বা বৈযাকরণ দেখে, সেখানে নিজেকে তার্কিক বলিয়া জাহির করে, আর যেখানে তার্কিক দেখে সেখানে শাব্দিক সাজিয়া বসে, কারণ, ইহাদের একজন আর-একজনের বিদ্যায় এত অপটু যে, তাহার অজ্ঞতা ধরিতে পারিবে না। বাংলাদেশের একজন বড়ো নৈযায়িককে জানিতাম, তিনি নিজের নাম 'রাসমোহন' বানান করিতেন 'হ্রাস-মোহন', অথচ ন্যায়ে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ।

নৈয়ায়িকেরা সাহিত্যে ও ব্যাকরণে অপটু ইহা বলিলেও ব্যাকরণের উপর তাঁহাদের তর্কের প্রভাব প্রচুর হইয়াছিল, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। শব্দের অর্থ বুঝাইবার যে শক্তি তাহার সূক্ষ্ম বিচার ন্যায় করিয়াছে। যাইতেছে (গচ্ছতি) আর খাইতেছে (ভক্ষতি) এই দুই শব্দ যে ভিন্ন ক্রিয়া বুঝায়, তাহা আমরা জানি। ইহা শব্দের শক্তি। ক্রিয়াপদ কাল বুঝায়, কর্তা কোন্ পুরুষ এবং কত জন তাহাও বুঝায়। পদটি ধাতু এবং বিভক্তির যোগে উৎপন্ন হয়; ধাতুর কতটুকু শক্তি আর বিভক্তির শক্তি কতটুকু, তাহা লইয়া তুমুল বিচার হইয়াছে। তাহার পর ধোপাকে কাপড় দিলে সম্প্রদান হয় না, ব্রাহ্মণকে গরু দান করিলে সম্প্রদান হয় কেন, তাহাও একটা বিচার্য প্রশ্ন। এই রকম বহু তর্ক ব্যাকরণ তুলিয়াছে এবং ন্যায়ের প্রভাবেই এই সব গবেষণায় মাতিয়াছে; সুতরাং নৈয়ায়িক বৈয়াকরণ না হইলেও ব্যাকরণকে নৈয়ায়িক করিয়া তুলিয়াছে। এই কারণে একটা ব্যাকরণ-বিভীষিকা অনেকের মনে আছে। এই বিভীষিকা সৃষ্টিতে মীমাংসার দানও কম নয়; সে কথা পরে হইবে।

নৈয়ায়িক ব্যাকরণকে ন্যায়-সিক্ত করিলেও ভাষায় তাঁহার দখল কম, ইহা বোধ হয় নিঃসংকোচে বলা যায়। ন্যায়ের ভাষা যে এত কঠিন, ইহাই বোধ হয় তাহার একটা কারণ। কাব্য-সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকিলে ন্যায়ও কি সরল ও সরস ভাষা ব্যবহার করিতে পারিত না? পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিয়া ও সমাস কম করিয়া বিভক্তি বেশী ব্যবহার করিলে ভাষা খুব কঠিন হয় না। সমাসের সংবাদ যাঁহারা জানেন তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, দুইটি ভিন্ন সমাসে সংযুক্ত একাধিক শব্দ দুইটি ভিন্ন অর্থ বুঝাইতে পারে। এইরূপে সমস্ত পদের উচ্চারণও বেদে ভিন্ন ছিল। সে উচ্চারণ-পার্থক্য স্বরের উদাত্ত, অনুদাত্ত, প্রভৃতি প্রভেদের মতো এখন লুপ্ত; কিন্তু বেদে উহা ছিল। যেমন, ইন্দ্র-শত্রু এই শব্দটি 'ইন্দ্র যাহাকে মারিবে' এবং 'ইন্দ্রকে যে মারিবে' এই দুই অর্থই বুঝাইতে পারে; একটি বহুব্রীহি সমাস, 'ইন্দ্র শত্রু যাহার'—এই ব্যাসবাক্য; আর-একটি তৎপুরুষ, ইন্দ্রের শত্রু—এই ব্যাসবাক্য; ভিন্ন সমাসে উচ্চারণের পার্থক্য বেদে আছে। এই পার্থক্য বৃত্রাসুরের পিতা রক্ষা করিতে না পারিয়া 'ইন্দ্রের শত্রু বা ঘাতক' পুত্র আকাংক্ষা করিয়া 'ইন্দ্র যাহার শত্রু বা ঘাতক' এইরূপ পুত্র লাভ করিয়াছিল! পুত্রেষ্টি যজ্ঞের কালে এই ভুলটি সে করিয়াছিল। বৈদিক সাহিত্যেই এই কিংবদন্তিটি রহিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় সংস্কৃতে সমাস-বদ্ধ পদ অর্থ কখনও সুগম করিয়া দেয় না। ন্যায় এই সত্যটি বিস্মৃত হইয়া অত্যধিক সমাস ব্যবহার করিয়া ভাষা অনাবশ্যক রূপে কঠিন করিয়া দিয়াছে। সহজ ভাষায়ও যে দার্শনিক তথ্য প্রকাশ করা যায় সংস্কৃতে তাহার বড়ো দৃষ্টান্ত শংকর। ভাষার দুর্বোধ্যতা একদিকে ন্যায়ের গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে হয়ত, কিন্তু অপর দিকে তেমনই উহার লোকপ্রিয়তাও কমাইয়াছে।

পদার্থ জ্ঞান ও মুক্তি

ন্যায়ের পদার্থের তালিকা দীর্ঘ। এই তালিকায় প্রমাণ রহিয়াছে এবং প্রমাণের বাধা ছল, হেত্বাভাস ইত্যাদিও রহিয়াছে। এই সমস্তই ঠিক দর্শনের বিচার্য বস্তু নয়— প্রমাণ-শাস্ত্রের বা তর্ক-শাস্ত্রের আলোচ্য। আর-একটা কথা; প্রমাণ-আলোচনা করিতে গেলে অ-প্রমাণের বা প্রমাণের অপ-প্রযোগের কথা আপনি আসিত; সুতরাং হেত্বাভাস ইত্যাদির পৃথক্ উল্লেখ অত্যুক্তি নয় কি? প্রমেয়ের মধ্যে আত্মাও আছে শরীরও আছে, অথচ ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর কি স্বতঃসিদ্ধ না অপ্রমেয়? সুতরাং ন্যায়ের পদার্থ ইত্যাদির তালিকাকে একেবারে নির্দোষ বা পূর্ণাঙ্গ বলা কঠিন। কেহ যদি তাহার বক্তব্যের আরম্ভে বলে, "আমাদের আলোচ্য মঙ্গলগ্রহ, মুর্শিদাবাদের রেশম, কয়লার খনি এবং ইউরেনিয়মের পরমাণু," তাহা হইলে বক্তার বিদ্যাবত্তার আভাস পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু বিষয়ের তালিকাটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর বলা যাইবে না। ন্যায়ও গভীর জ্ঞানের এবং তত্ত্বকথার মালিক হইতে পারে, কিন্তু আলোচ্য বিষয়ের তালিকা রচনায় সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারে নাই।

তাহার পর এই পদার্থসকলের জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, ইহা নূতন কথা নয়; জৈন, বৌদ্ধ ও বৈশেষিক দর্শনও তাহা বলিয়াছে। কিন্তু শুনায় কেমন? কেহ যদি বলে, 'আপনারা সকলে পদার্থ-বিদ্যা অধ্যয়ন করুন; দারিদ্র্য দূর হইবে, দেহ নীরোগ হইবে,' তাহা হইলেও কি একই রূপ প্রতিক্রিয়া মানুষের মনে হইবে না? জ্ঞানের জন্যও তো মানুষ জ্ঞান খুঁজে; একটা লাভের লোভ দেখাইয়া জ্ঞানে প্রবৃত্ত করা শিশুর বেলায় শোভন হইলেও বৃদ্ধের বেলায় বে-মানান।

ন্যায়ের আর-একটি ত্রুটি এই যে, ইহা জীবের বন্ধ, বন্ধের কারণ ইত্যাদি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা তেমন বেশী কিছু না বলিয়া একটা প্রকাণ্ড তর্কের সমুদ্র সৃষ্টি করিয়াছে; বৈশেষিকও তাহা করিয়াছে: কিন্তু ন্যায়ের কৃতিত্ব বেশী। ন্যায় সমাধির কথা বলিয়াছে (৪।২।৩৭) এবং অরণ্য গুহা পুলিন ইত্যাদিতে বসিয়া যোগ অভ্যাসের কথাও তুলিযাছে (সূত্র, ৪।২।৪১) ইহা সত্য; কিন্তু যোগে বসিয়া যোগী কি ধ্যান করিবে? ছল, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস ইত্যাদি; কারণ ইহাদের তত্ত্ব জানিলেই তো মুক্তি! স্বীকার করা অনিবার্য যে, যোগের উল্লেখ ন্যায়ের পক্ষে অনেকটা অবান্তর এবং আলোচনা যাহা করিয়াছে তাহাও যোগ-দর্শনের তুলনায় কিছুই নয়। সুতরাং মোক্ষশাস্ত্র হিসাবে ন্যায়ের দাবি উপেক্ষা করা চলে।

তার্কিক যাহারা তর্কে জয়ই তাহাদের বড়ো লক্ষ্য, সত্যপ্রতিষ্ঠা তত নয়। তর্কশাস্ত্র হিসাবে ন্যায়েও এই দোষ রহিযাছে। বাদবিতণ্ডায় প্রতিপক্ষকে কী করিয়া হেত্বাভাস ইত্যাদির সাহায্যে ছলনা করিয়া নিগৃহীত করা যায়, ন্যায় তাহারই কথা ভাবিয়াছে বেশী; এবং নিজে বিপক্ষের ছলনায় যাহাতে নিগৃহীত না হয়, সেকথাও ভাবিয়াছে। কিন্তু এই সব বিতণ্ডা ছল ইত্যাদি তো সত্যসত্যই মোক্ষশাস্ত্র নয়। রাজ-জ্যোতিষীরা তান্ত্রিক কবচের বিজ্ঞাপনে যেরূপ ভাষা ব্যবহার করে— 'ইহা ব্যবহারে সর্বরোগ শান্তি হয়, সকল বিপদ দূর হয়, ভালো চাকরী হয়' ইত্যাদি, সত্যের প্রচারে সেরূপ ভাষা ব্যবহার করিলে কেমন শুনাইবে? ন্যায়-সূত্রের আরম্ভের দিকে কিন্তু অনেকটা সেই রকম ভাষাই ব্যবহার করা হইয়াছে; বাদ-বিতণ্ডা, ছল, নিগ্রহ-স্থান ইত্যাদির তত্ত্ব জানিলেই নিঃশ্রেয়স, না জানিলে নয়; এ সব কথা শুনায় কেমন? মোক্ষশাস্ত্রের মতো?

এই সব মন্তব্য শুনিলে নৈয়ায়িকেরা অসন্তুষ্ট হইবেন, বুঝিতে পারি। কিন্তু তাঁহাদের কার্যের প্রশংসার যোগ্যও একটা দিক আছে, একথাও আমরা বলিব। কূটতর্কের জাল বুনিয়াই তাঁহারা ভারতে—বিশেষত বাংলা দেশে—বৌদ্ধদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এইটি কম কথা নয়; দর্শনের জয়পরাজয়ের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। খৃস্টীয় দশম হইতে একাদশ শতাব্দীতে উদয়ন আচার্য নামক একজন বড় নৈয়ায়িক ছিলেন; তাঁহার সম্বন্ধে একটা কিংবদন্তী আছে যাহাতে নৈয়ায়িকেরা হিন্দু ধর্মকে কতখানি সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা বুঝা যায়। তিনি নাকি একবার পুরীতে জগন্নাথ দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনিও মন্দিরে প্রবেশ করিতে যাইবেন, ঠিক এমন সময় মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। চটিয়া গিয়া আচার্য বলিয়া উঠিলেন 'পুনর্বৌদ্ধে সমায়াতে মদধীনা তব স্থিতি'—আবার যদি বৌদ্ধেরা আসে তবে তোমার স্থিতি আমার অধীন, আমার সাহায্য না হইলে আর লোকের পূজা পাইতে হইবে না। ইহার অর্থ, নৈয়ায়িকদের সাহায্যেই—তাহাদের স্বীকৃতিতেই হিন্দুদেবতারা বৌদ্ধদের হাতে ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এই কিংবদন্তীর ভিতর ইতিহাস কতটুকু আছে জানিবার চেষ্টা না করিয়াও ইহা বলা চলে যে, নৈয়ায়িকদের তর্কজালে আটক পড়িয়া নিগৃহীত না হইলে বৌদ্ধধর্মই হয়ত বাংলার ধর্ম থাকিয়া যাইত, বেদ-অনুগৃহীত হিন্দু-ধর্ম আসন পাইত না হয়ত। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে এইখানেই ন্যায়ের দানের মূল্য প্রকাশ পাইতেছে।

৪

আস্তিক দর্শন—২

বেদ ও বেদের ধর্ম

মহাবীর ও বুদ্ধের আবির্ভাবের সময় হইতে বেদের ধর্মের উপর যে আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল, সে কথা আমরা বলিয়াছি। নাস্তিকেরা আগে নূতন ধর্মের সাহায্যে, পরে দর্শনের বিচারের সাহায্যে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, বেদের ধর্ম নিষ্ফল এবং অন্তঃসারশূন্য। ইহাতে বেদবিশ্বাসীর সংখ্যা হিন্দুসমাজে কিছুকালের জন্য কমিয়া গিযাছিল, কিন্তু বেদে বিশ্বাস একেবারে নির্মূল হয় নাই। আস্তিকেরাও দর্শনের দুর্গ নির্মাণ করিয়া আস্তিক্য রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে চারিটি আস্তিক দর্শনের আলোচনা আমরা এ পর্যন্ত করিয়াছি, তাহারা যে সত্য সত্যই বেদের ধর্ম রক্ষার জন্য প্রচুর চেষ্টা করিয়াছিল, এমন বলা যায় না। তাহারা বেদ অস্বীকার করে নাই—ভণ্ডের ভণ্ডামি কিংবা নৃশংসের জীবহত্যা বলিয়া উহাকে একেবারে বাতিল করিয়া দিতে চাহে নাই, এই পর্যন্ত। তাহারা যথাসম্ভব স্বাধীন ও স্বতন্ত্র দর্শন; তবে, বেদ মানিয়াছে, উহাকে আঘাত করার মতো কিছু করে নাই। ন্যায় তর্কের কূট-জালে বৌদ্ধদিগকে—বাংলাদেশে বিশেষত—জব্দ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বৌদ্ধদের মধ্যেও বড়ো বড়ো তার্কিক আবির্ভূত হইয়াছিল; তাহাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হইয়াছিল বিশেষভাবে ন্যায়কেই। কিন্তু তাহা

হইলেও ন্যায় বেদের পক্ষের কথা বিশেষ কিছুই বলে নাই · বৈশেষিক ধর্মের—বেদের ধর্মের—কথা তুলিয়াছে ; কিন্তু বেদের নিত্যত্ব অপৌরুষেয়ত্ব ইত্যাদির সম্বন্ধে বিচারকেই প্রাধান্য দেয় নাই, এবং সে বিচারে খুব বেশী দূর অগ্রসরও হয় নাই। সাংখ্য-যোগ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। অথচ অবস্থা এমন দাঁড়াইযাছিল যে, বেদের রক্ষকের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। এই রক্ষাকার্যকেই ব্রত বলিযা গ্রহণ করিয়াছিল পূর্ব-মীমাংসা, যাহাকে আমরা সংক্ষেপে শুধু মীমাংসাও বলিয়া থাকি।

১. মীমাংসা—বেদব্যাখ্যা

মীমাংসা খাঁটি দর্শন নয় ; ইহার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ধর্মের ব্যাখ্যা করা। এই ধর্ম মীমাংসার মতে বেদবিহিত কর্ম। বেদে অনেক কর্মের উপদেশ রহিযাছে ; অগ্নিহোত্র হইতে আরম্ভ করিয় রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতি ছোটো বড়ো, সহজ এবং আয়াস-সাধ্য, অল্প ব্যয়সাধ্য এবং ব্যয়বহুল, সংক্ষিপ্ত এবং দ্রব্য-বহুল, নানাবিধ কর্মের উপদেশ বেদ দিয়াছে ; এবং ইহাদের ফলও বর্ণনা করিয়াছে। এই সকলের প্রকার বিধি উদ্দেশ্য ফল ইত্যাদি বিচার করাই মীমাংসার প্রধান কার্য। বিশ্বের ব্যাখ্যা, দর্শনের কথা, আত্মা, জগৎ ও পরমেশ্বরের কথা ইহার নিকট অবান্তর ; কিন্তু অবান্তর হইলেও আলোচনাট মীমাংসা করিয়াছে ; এবং সেই যুক্তিতেই উহা দর্শনের পর্যায়ে গৃহীত হয়।

মীমাংসার মতে বেদ বলিতে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বুঝায়। উপনিষদ্ বলিয় বেদের যে অংশ প্রসিদ্ধ তাহা এই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। মন্ত্র কাহাকে বলে এবং ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে তাহা লইয়া তর্ক হইয়াছে ; তবে সাধারণ

ভাবে বেদের সহিত পরিচিত যিনি তিনি সহজেই একটিকে আর-একটি হইতে পৃথক্ করিতে পারেন। সংজ্ঞা না দিয়া সাধারণভাবে ইহাও বলা হইয়া থাকে যে, যাহা মন্ত্র নয় তাহাই ব্রাহ্মণ, আর যাহা ব্রাহ্মণ নয়, তাহাই মন্ত্র। অবশ্যই এই ভাবে চিনিতে গেলে কোন্‌টি মন্ত্র কোন্‌টি ব্রাহ্মণ তাহা কাহারও নিকট শিখিয়া লইতে হয়। অন্য উপায়েও মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের পার্থক্য করা যায়। মন্ত্রগুলি সাধারণত পদ্যে রচিত এবং তাহাতে দেবতাদের স্তব, গুণগান ইত্যাদি থাকে; যেমন, 'অগ্নিমীলে পুরোহিতং' ইত্যাদি কিংবা 'তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদং' ইত্যাদি মন্ত্র। মন্ত্রের বহু ছন্দ আছে—গায়ত্রী, জগতী, উষ্ণিক, অনুষ্টুভ ইত্যাদি। গদ্য মন্ত্রও যে না আছে, তাহা নয়, তবে কম। সেগুলিকে সাধারণত 'যজুঃ' বলা হয়। প্রকৃত এবং মৌলিক মন্ত্র যেগুলি সেগুলি ছন্দে রচিত এবং তাহাদেব সাধারণ নাম 'ঋক্'। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার গান করা হইত; তাহাদের নাম 'সাম'। ঋক্, সাম ও যজু এই তিন মিলিয়াই 'ত্রয়ী' বা বেদ হইয়াছে। যজুর দুইটি ভাগ আছে—শুক্ল ও কৃষ্ণ; শুক্ল যজু পদ্যে রচিত, কৃষ্ণ গদ্যে। বেদগুলির উৎপত্তি ও পরম্পরা সম্বন্ধে বৈদিকদের মত যাহা তাহা প্রকাশ পাইয়াছে একটি ঋক্ মন্ত্রে। যথা—"তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে; ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুঃ তস্মাৎ অজায়ত—" (পুরুষ-সূক্ত)। অর্থাৎ ঋক্, সাম, যজু—বেদত্রয়ের ইহাই ক্রম। এখানে কিন্তু অথর্ব বেদের উল্লেখ নাই। অথর্ব চতুর্থ বেদ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে পরে।

ব্রাহ্মণভাগ গদ্যে রচিত। ইহার আর-একটা বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে দেবগণের স্তুতি ইত্যাদির বদলে ক্রিয়ার প্রণালী ও বিধি বিবেচিত হইয়াছে; কোন্ ক্রিয়া কোন্ সময়ে কী প্রণালীতে এবং

কোন্ কোন্ মন্ত্র কখন্ এবং কে উচ্চারণ করিবে, ইত্যাদি বিষয় বিচার করা হইয়াছে। যেখানে 'বিধিলিঙ্' বিভক্তির সাহায্যে বিধি ও নিষেধ দেওয়া হইয়াছে—'ইহা করিতে হইবে,' কিংবা 'করিতে হইবে না'—এইরূপ ভাষায়। যেমন 'অগ্নিহোত্রেণ জুয়ুযাৎ'— অগ্নিহোত্র হোম করিবে, এইটি বিধি; আর 'ন হিংস্যাৎ'—পশুবধ করিবে না, এই ধরনের নিষেধ। তাহা ছাড়া, কর্তব্য ক্রিয়ার প্রশংসাও রহিয়াছে: যেমন, জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ হয়, ইত্যাদি। এ সকলের নাম 'অর্থবাদ'। আর এইসব ফল যে হয়, বিধিহীন ক্রিয়ায় যে ফল হয় না, তাহা বুঝাইবার জন্য আবার নানা প্রকার আখ্যায়িকাও ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। একটি প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা বৃত্র নামক অসুর সম্বন্ধে। বৃত্রের নাম প্রসিদ্ধ; তাহার সংহার লইয়া বাংলায়ও কাব্য হইয়াছে। বৃত্রের বাবা ইন্দ্রকে মারিবে এই রকম পুত্র আকাঙ্ক্ষা করিয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিবার সময় 'ইন্দ্র-শত্রু' এই শব্দটি ব্যবহার করেন। এই সমাস-বদ্ধ শব্দটির যে দুইটি অর্থ হয় তাহা আমরা ন্যায়ের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে বলিযাছি। বৃত্রের বাবা উচ্চারণে ভুল করেন; ফলে, যে ছেলে ইন্দ্রকে হত্যা করিবে আশা করা হইয়াছিল, সে ইন্দ্রকর্তৃক হত হইয়াছিল। এই কাহিনীর ইঙ্গিত পাণিনির 'শিক্ষায়'ও রহিয়াছে; যথা—

"মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা, মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ;
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি, যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।"

ইহার অর্থ, মন্ত্র উচ্চারণে যদি স্বরে অর্থাৎ উদাত্তাদি উচ্চারণে কিংবা বর্ণে কোনো ত্রুটি থাকে, তবে সেই মন্ত্র মিথ্যাপ্রযুক্ত হয় এবং যে অর্থ বুঝাইবার কথা, তাহা বুঝায় না; সেই বাক্য বজ্রের ন্যায় যজমানের অনিষ্ট করে, যেমন 'ইন্দ্রশত্রু' এই শব্দটির উচ্চারণে স্বরে ভুল হওয়ার জন্য বৃত্রা-

সুরের বাবার যজ্ঞে হইয়াছিল। এই একটি আখ্যায়িকা দ্বারা ক্রিয়ার ফল এবং মন্ত্রের শক্তি বুঝানো হইতেছে।

এখন যখন বেদ ছাপা হইয়াছে, তখন মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ পৃথক্ করা আর কঠিন নয়; পৃথক্ নাম দিয়াই ছাপা হয়। প্রত্যেক বেদেরই একাধিক ব্রাহ্মণ আছে; সেগুলিও এখন পৃথক্ পৃথক্ ছাপা হইতেছে। এখন আমরা ঋক্ মন্ত্রগুলিকে ঋক্ বেদ বলি, আর ঐতরেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণকে ঋগ্‌বেদের ব্রাহ্মণ বলিয়া জানি। অন্য তিন বেদের বেলাযও ঐ একই নিয়ম। প্রত্যেক বেদের আবার ভিন্ন ভিন্ন শাখা আছে; এবং শাখা অনুসারে ব্রাহ্মণও পৃথক্ হয়। বর্তমানে সব শাখার অস্তিত্ব নাই এবং সব শাখার সব সাহিত্যও পাওযা যায না। বৈদিক সাহিত্যের প্রতি খুব যত্ন দেখানো হইয়াছে সত্য, তথাপি কিছু লোপ পাইয়াছে।

এই ব্রাহ্মণগুলির মধ্যেই বৈদিক ক্রিয়ার বিধিনিষেধ সকল রহিয়াছে। মীমাংসার কাজ সেইগুলির অস্পষ্ট অর্থ স্পষ্ট করা এবং বিরোধের সামঞ্জস্য করা। এই আলোচনায় এক বিরাট সাহিত্য সৃষ্ট হইযাছে। এই সাহিত্যের কেন্দ্র জৈমিনীর মীমাংসা-সূত্র। কিন্তু ইহাই আদিম গ্রন্থ, এরূপ মনে করার কোনো কারণ নাই। বেদ অনুসরণ করিযাছে এই রূপ আরও তিন শ্রেণীর সূত্রগ্রন্থ আমরা পাই; শ্রৌত, গৃহ্য এবং ধর্ম -সূত্র। ইহাদের প্রত্যেকটির নামের সঙ্গে গ্রন্থকর্তার নামও যোজিত দেখা যায়; যেমন, আশ্বলায়ন, সাংখ্যাযন, বৌধায়ন ইত্যাদি। এসব গ্রন্থ শ্রুতি নয়, স্মৃতি। শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই ধর্ম-সম্বন্ধে প্রমাণ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোথাও বিরোধ দৃষ্ট হইলে 'শ্রুতিরেব গরীয়সী'— শ্রুতিই মানিতে হইবে। এই সকল সূত্র-গ্রন্থ শ্রুতি না হইলেও খুব মান্য। ইহা-দিগকেও মীমাংসা-সাহিত্যের মধ্যে ধরা যায়; কারণ, ইহারাও বেদের কর্মের বিধিগুলিকে সুশৃঙ্খল এবং সুস্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

সকলগুলি না হইলেও অনেকগুলি সূত্র-গ্রন্থ যে মীমাংসা-সূত্রের পূর্ববর্তী তাহা মনে করা চলে। সূত্রকারদের নামগুলির প্রসিদ্ধিই এরূপ মনে করিবার পক্ষে একটা বড়ো যুক্তি।

এই সূত্রগুলি ও মীমাংসা-সূত্র এই উভয়ের মধ্যে যে কালের ব্যবধান ছিল, সে কাল একেবারে শূন্যগর্ভ নিশ্চয়ই ছিল না; সেইসময়েও এইসকল আলোচ্য বিষয়ে অনেকে চিন্তা করিয়া থাকিবেন। সেই সময়ের সাহিত্য তেমন কিছু না পাওয়া গেলেও অনেকের নাম পাওয়া যায়; কাহারো কাহারো নাম মীমাংসা-সূত্রেও ধৃত হইয়াছে; যথা, বাদরি, বাদরায়ণ, কার্ষ্ণাজিনি, আত্রেয় ইত্যাদি। ইহাদের অনেকের নাম আবার বেদান্তসূত্রেও পাওয়া যায়। ইহার পর আবির্ভূত হয় জৈমিনির মীমাংসা-সূত্র। ইহা একটি বিশাল গ্রন্থ, বারটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং বহু সূত্রদ্বারা ইহার কলেবর গঠিত। শবরস্বামী ইহার ভাষ্য লিখিয়াছেন। আরও দুইজন ইহার ব্যাখ্যা করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন—কুমারিল ও প্রভাকর। কেহ কেহ ইহাদিগকে সমসাময়িক মনে করিয়াছেন; আবার একজন আর-একজনের পূর্বে—এরূপ মতও আছে। কে কাহার পূর্বে তাহা লইয়া আবার মতভেদ রহিয়াছে। বেশি প্রসিদ্ধ কিম্বদন্তী এই যে, প্রভাকর কুমারিলের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু প্রভাকরের প্রতিভার জন্য তাঁহার গুরু তাঁহাকেই 'গুরু' বলিতেন; কোনো একটা বাক্যের অর্থ করিতে কুমারিল পারেন নাই, প্রভাকর পারিয়াছিলেন ইহাই এই কিম্বদন্তীর ভিত্তি। গুরু তাঁহাকে 'গুরু' বলিতেন বলিয়া প্রভাকরের মতকে 'গুরু-মত' বলা হয়। কুমারিলের পুরা নাম কুমারিল ভট্ট বা ভট্ট কুমারিল; সেইজন্য তাঁহার মতের নাম 'ভট্ট-মত'। এই গুরুশিষ্য দুইজন দুইটি প্রসিদ্ধ মীমাংসাসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। একজন তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন মুরারি মিশ্র; ইনি এই উভয় সম্প্রদায় হইতে

কোনো কোনো বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করিতেন। চল্‌তি কথায় আমরা যখন-তখন বলি 'মুরারে স্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ'—মুরারির তৃতীয় পথ; ইহা এই মুরারি মিশ্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হয়। তাঁহার উপাধি 'মিশ্র' হইতে তাঁহার মতকে 'মিশ্র-মত'ও বলা হয়। এইসব সম্প্রদায়ের মত-পার্থক্য আমরা এখানে দেখাইতে পারিব না। যাঁহারা বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুর ক্রিয়া-কর্ম ও আচারের প্রভেদ এবং সেই সকলের পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি কমবেশী জানেন, তাঁহারা এই মীমাংসকদের প্রভেদও কল্পনা করিতে পারিবেন।

ইঁহাদের পরে— কতকটা ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়া কতকটা স্বতন্ত্রভাবে— আরও অনেক মীমাংসা-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, এবং তাহাতেই মীমাংসা-সাহিত্য বেদান্তের—এবং হয়তো ন্যায়েরও—পরেই আকারে বড়ো এবং পরিধিতে বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সমগ্র সাহিত্যের কেন্দ্র জৈমিনির মীমাংসা-সূত্র; সবগুলি জৈমিনি না-ও লিখিয়া থাকিতে পারেন; অন্যত্র যেমন এখানেও তেমনই কিছু কিছু পরেও যোজিত হইয়া থাকিবে। এই জৈমিনি কে ছিলেন? কোন্ প্রদেশের লোক? জানিতে কৌতূহল হইতে পারে। কিন্তু তাহা চরিতার্থ করিবার মতো উপকরণ ইতিহাস রক্ষা করে নাই। প্রসিদ্ধি আছে তিনি বেদব্যাসের শিষ্য ছিলেন। ইহাকে ইতিহাস বলিয়া ধরা কঠিন। বেদব্যাস বেদান্তসূত্রের রচয়িতা; তাঁহার নামান্তর বাদরায়ণ। ইঁহার উল্লেখ মীমাংসা-সূত্রে আছে। আবার বেদান্তসূত্রেও জৈমিনির উল্লেখ আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরস্পরের উল্লেখ মতভেদের দৃষ্টান্তস্বরূপও হইয়াছে। ইহা কি ঠিক গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের মতো? সুতরাং কোনো কষ্টকল্পনার সাহায্য না লইয়া আমরা সহজ এবং স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত এই করিতে পারি যে, জৈমিনি বলিয়া একজন

প্রতিভাবান্ ও প্রভাববান্ পণ্ডিত লেখক ছিলেন ; কবে এবং কোথায়, শপথ করিয়া বলা যায় না। ব্যাসের সমসাময়িক হওয়া অসম্ভব নয়। আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে খৃ-পূ ২০০ হইতে খৃ-অ ২০০, এই ৪০০ বৎসরের মধ্যে কোনো এক সময়ে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

২. মীমাংসা—বিশ্ব-ব্যাখ্যা

মীমাংসা-সাহিত্যের বেদ-ব্যাখ্যার সঙ্গে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সম্পর্ক কম। কথাটা প্রসঙ্গক্রমে তুলিতে হইল ; কেননা, উহাকে আশ্রয় করিয়া কতকটা দর্শনও আবির্ভূত হইয়াছে। প্রমাণ, জ্ঞানের উৎপত্তি ও প্রামাণ্য, জীবের স্বরূপ, কর্তৃত্ব ও ভবিষ্যৎ, জগতের সত্যতা, কার্যকারণ-সম্বন্ধ, কর্ম ও তাহার ফল, ঈশ্বর, ইত্যাদি দার্শনিক প্রশ্ন বেদের কর্ম বিচার করিতে গিয়া মীমাংসা তুলিয়াছে। এইসব বিষয়ে মীমাংসার সাধারণ অভিমত অতঃপর আমাদিগকে ভাবিতে হয়।

প্রমাণ

অন্য চারিটি আস্তিক-দর্শনে সবশুদ্ধ চারিটি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। মীমাংসাও তাহা মানিয়াছে ; অধিকন্তু মীমাংসা আরও দুইটি প্রমাণ স্বীকার করিযাছে— অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। ইহাদের কথা আগেও বলা হইয়াছে। মীমাংসার মতে এই ছয়টি প্রমাণ। বেদান্তও এইখানে মীমাংসার সহিত সম্পূর্ণ একমত। প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা ন্যায় যেমন করিয়াছে তেমন আর কোনো দর্শনই করে নাই, সুতরাং প্রমাণ সম্বন্ধে সাধারণভাবে মীমাংসার বিশেষ কোনো অবদান নাই। বেদান্ত সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। কিন্তু মীমাংসা শব্দ প্রমাণ সম্বন্ধে এমন

দুই-একটি কথা বলিয়াছে যাহা অন্য সকল দর্শন স্বীকার না করিলেও উপেক্ষার যোগ্য নয়।

১. শব্দ নিত্য। শব্দ বর্ণসমষ্টি হইতে উৎপন্ন হয়, যেমন গ্‌, অ, র্‌, উ এই কয়টি বর্ণের সংযোগে 'গরু' শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে। এইপ্রকার কয়েকটি শব্দের যোগে বাক্য নির্মিত হয়; যেমন, 'গরু ঘাস খায়'। নিত্যত্ব বর্ণেতেও আছে, শব্দেতেও আছে, ক্‌, খ্‌, গ্‌, ইত্যাদি বর্ণ নিত্য; আর তাহাদের সংযোগে উৎপন্ন 'গরু' ইত্যাদি শব্দও নিত্য। নিত্যবস্তুর উৎপত্তি থাকে না, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে শব্দেরও উৎপত্তি নাই; কোনো-একটি শব্দে বিভিন্ন বর্ণগুলিকে আমরা পৃথক্ ভাবে ভাবিতে পারি এই মাত্র। আমরা অবশ্যই সব সময় কোনো শব্দ উচ্চারণ করি না; মনে হইতে পারে, যখন উচ্চারণ করি, তখন যেন উহাকে সৃষ্টি করি; কিন্তু তাহা ঠিক নয়; উচ্চারণকালে নিত্য শব্দটি স্মরণ করি মাত্র। শব্দ যদি নিত্য না হইত তবে দ্বিতীয়বার উচ্চারণের সময় তাহাকে আবার পাই কোথায়? বলা বাহুল্য, এখানে অনেক তর্ক হইতে পারে এবং হইয়াছেও। মীমাংসা এই তর্কে পশ্চাৎপদ হয় নাই; জিতিয়াছে কি না, সে বিচার করিবে অন্যে। তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, শব্দ নিত্য।

একটি শব্দ দ্বারা অর্থ প্রকাশ হয় না। কেহ 'গরু' শব্দটি উচ্চারণ করিলে আমরা শুনিয়া আশায় থাকিব, তারপর কী। বক্তা যদি ঐখানেই থামিয়া যায়, তবে আমাদের স্পষ্ট অর্থবোধ কিছু হইবে না এবং উদ্রিক্ত আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকিয়া যাইবে। কিন্তু আরও কয়েকটি শব্দ লইয়া যদি একটি বাক্য রচিত হয়, যেমন 'গরু ঘাস খায়', তাহা হইলে আমরা একটা সম্পূর্ণ অর্থ অবগত হই। এখন প্রশ্ন এই, এই বাক্যটিও কি নিত্য? কোনো শব্দই কোনো একটা বাক্যে চিরকাল আবদ্ধ থাকে

না ; 'গরু' এই শব্দটি একাধিক বাক্যে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং হয়। শব্দ যেমন বর্ণে বিভাজ্য, বাক্য তেমনই শব্দে বিভাজ্য। যে যুক্তিতে বর্ণ এবং তাহাদ্বারা রচিত শব্দ এই উভয়কেই নিত্য বলি, সেই যুক্তিতে সমস্ত বাক্যকেও নিত্য বলিতে আপত্তি কী ? লৌকিক বাক্য সম্বন্ধে আপত্তি সম্ভব হইলেও বেদের বাক্য সম্বন্ধে কোনোই আপত্তি নাই, বরং ইহাই মীমাংসার সিদ্ধান্ত। বেদে যে সকল বর্ণ ও শব্দ প্রযুক্ত আছে, সেগুলি সাধারণ লোকেও ব্যবহার করিতে পারে. সেই সব শব্দ দ্বারা অন্য বাক্যও রচিত হইতে পারে ; সে সব নিত্য হউক বা না হউক, বেদের বাক্যসকল শব্দ এবং বর্ণের মতো চিরন্তন ; অনাদি কাল হইতে তাহারা রহিয়াছে ; অনন্ত কাল থাকিবে।

যে কয়েকটি বর্ণের যোগে কোনো একটি শব্দ রচিত হয়, তাহাদের কোনোটিরই পৃথক্‌ভাবে অর্থ বুঝাইবার শক্তি নাই ; সকলের সমষ্টি শব্দটিই অর্থ বুঝায়। 'গরু' শব্দ যাহা বুঝায়, গ কিংবা র তাহা বুঝাইতে পারে না। ব্যস্ত-ভাবে বর্ণসকলের যে শক্তি নাই, সমস্ত-ভাবে তাহারা সেই শক্তি পায়। কেহ কেহ ইহাকে একটা নূতন জিনিস মনে করিয়াছেন এবং নাম দিয়াছেন 'স্ফোট'। স্ফোট স্বীকারের পক্ষে একটা যুক্তি এই যে, একই বর্ণসমষ্টি ভিন্ন ক্রমে প্রযুক্ত হইলে ভিন্ন অর্থ দ্যোতনা করে ; যেমন নদী ও দীন, মরা ও রাম, ইত্যাদি শব্দ-যুগ্মে বর্ণ একই, কিন্তু অর্থ এক নয়। এই প্রভেদ আসে বর্ণাতিরিক্ত একটা পৃথক শক্তি হইতে ; বর্ণ-সন্নিকর্ষ হইতে এই শক্তি উৎপাদিত হয়, ইহারই নাম 'স্ফোট'। স্ফোট সকল মীমাংসকের স্বীকৃত নহে। পাণিনি-দর্শনে ইহার বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে। তবে পাণিনি-দর্শনকে মাধবাচার্য দর্শন বলিলেও আমাদের পক্ষে দর্শন বলা একটু কষ্টকল্পনা।

২. শব্দ যেমন নিত্য, শব্দের সঙ্গে অর্থের যে সম্বন্ধ, তাহাও নিত্য। গরু বলিলে যে মানুষ কিংবা বৃক্ষ বুঝায় না, ইহা নিত্য সত্য। কোনো-একসময়ে গরুর সঙ্গে তাহার অর্থ কেহ সংযোজিত করিয়া দেয় নাই। ন্যায়ের মতে এই সম্বন্ধ ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট। মীমাংসায় ঈশ্বর নাই, সুতরাং ন্যায়ের মত সে গ্রহণ করিতে পারে না। তাহার মতে শব্দ এবং শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ উভয়ই অ-সৃষ্ট, নিত্য।

শব্দের অর্থ ব্যক্তি না জাতি, ইহাও একটা প্রশ্ন। গরু বলিলে আমরা গো-জাতিকে বুঝিব না কোনো-একটা গরু বুঝিব? তর্কটা প্রাচীন। পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও প্ল্যাতো হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত নানা ভাবে এই প্রশ্নটা দেখা দিয়াছে। মীমাংসা-সাহিত্যেও এসম্বন্ধে অনেক তর্ক দেখা যায়। তবে, মীমাংসার সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, শব্দ প্রথমত জাতিকেই বুঝায়; তাহা হইতে পরে ব্যক্তির বোধ হয়। ব্যক্তির বোধও প্রয়োজন; তাহা না হইলে বিহিত ক্রিয়া হয় না। 'গাম্ আলভেত'—গরু হত্যা করিবে—এই বিধি কার্যে পরিণত করিতে হইলে কোনো একটি গরুই ধরিতে হয়, গোটা জাতিটাকে তো আর বধ করা যায় না!

৩. সহজ বোধের জন্য আমরা একটি লৌকিক বাক্যের দৃষ্টান্ত লইয়াছি। বেদও শব্দ এবং বাক্যের সমষ্টি; এবং সেখানে নিত্যতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। বেদ যখন বলে, 'স্বর্গকামো যজেত'—স্বর্গ যে কামনা করে তাহার যজ্ঞ করা উচিত—তখন সেই কথাটা সর্বত্র এবং সর্বদা সত্য; পঞ্চালে সত্য মিথিলায় অসত্য, কিংবা রামের সময়ে সত্য বুদ্ধের সময়ে অসত্য, এমন নয়। শব্দ লৌকিক ও বৈদিক দুই প্রকারই আছে। বৈদিক শব্দের প্রামাণ্য সম্বন্ধে মীমাংসায় কোনো তর্ক নাই; অমীমাংসকদের আপত্তি খণ্ডন করা হইয়াছে মাত্র। লৌকিক শব্দের

প্রামাণ্যও সকলে না হইলেও কোনো-কোনো মীমাংসক স্বীকার করিয়াছেন।

৪. বেদ বিশেষভাবে প্রামাণ্য; তাহার কারণ উহা অপৌরুষেয়। কোনো মানুষ ইহা রচনা করিয়াছে ইহার প্রমাণ নাই; বেদের কোনো কর্তা বা রচয়িতার নাম কেহ করিতে পারে না। সুতরাং ইহা অপৌরুষেয়। মীমাংসার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বেদবিরোধীরা অনেক যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছে; মীমাংসাও সেইসকল যুক্তি খণ্ডন করিয়া পক্ষে যুক্তি স্থাপনের চেষ্টা করিযাছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেব নিকট এই দীর্ঘ আলোচনা চিত্তাকর্ষক হইবে হযতো; কিন্তু আধুনিক চিন্তায় ইহাকে খুব সারবান্ গবেষণা বলিয়া উপস্থিত করা যায় না।

মনে রাখা ভালো যে, মীমাংসা বেদকে অপৌরুষেয় অর্থাৎ অনাদি ও নিত্য বলে, ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী মনে করে না; কারণ, মীমাংসায় ঈশ্বরই নাই। কিন্তু বেদ সম্বন্ধে মীমাংসার যাহা বিশ্বাস, তাহার অনুরূপ বিশ্বাস অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধেও আছে। মুসলমানদের মতে কোরাণ আল্লার বাণী; খৃস্টানদের বাইবেলেও ঈশ্বরের বাণী এবং আত্মপ্রকাশের কথা আছে। আধুনিক চিন্তার অসুবিধা এই যে গ্রহণ করিতে হইলে কোনো দিকে পক্ষপাত না দেখাইয়া এই প্রকার বিশ্বাস সমস্তগুলিই মানিয়া লইতে হয়; অথচ, এরূপ উদারতায় কোনো ধর্মের লোকই হয়তো সম্মত ও সন্তুষ্ট হইবেন না; আবার, বর্জন করিতে হইলে এই প্রকার অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাস সমস্তই বর্জন করিতে হয়। মানুষের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন চিন্তায় যাঁহারা আস্থা রাখেন, তাঁহারা এক্ষেত্রে কী করিবেন, দর্শনের সঙ্গে পরিচিত কাহারওই তাহা অবিদিত নহে।

আস্তিক দর্শন

স্বতঃ প্রমাণ

মীমাংসার মতে সমস্ত জ্ঞান স্বতঃপ্রমাণ; কোনো জ্ঞানই জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা করে না, আপনা হইতেই সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহায্যে আমরা যাহা জানি, তাহা ঠিকই জানি; সেই জানার ভিতর সন্দেহ কিংবা অবিশ্বাসের অবকাশ নাই। আমি যখন রজত দেখিতেছি মনে হয় তখন সত্যসত্যই রজতই দেখি; ইহাতে সন্দেহের কী কারণ থাকিতে পারে? অনুমান এবং শব্দাদি প্রমাণের বেলায়ও তাহাই সত্য। বেদবাক্যের অর্থ হইতে যখন আমি জানি যে, স্বর্গকামীর যজ্ঞ করা উচিত, তখন সেই জ্ঞান আপনি প্রমাণ; ইহার পক্ষে আর অন্য প্রমাণ কিংবা যুক্তির অবতারণা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু ভুলের কী কৈফিয়ত? শুক্তিতেও তো রজত দেখি; সেটা যে রজত নয় ইহা যখন পরে জানি, তখন কি আগের রজত-জ্ঞান ভুল মনে হয় না? হয়, কিন্তু শুক্তিতেও যখন দেখিয়াছিলাম, তখন রজতই দেখিয়াছিলাম, শুক্তি তো আর দেখি নাই; তবে রজত সেখানে ছিল না, এই মাত্র। আমার রজত দেখাটা ঠিকই; তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ নাই; তবে, যেটাকে রজত মনে করিয়াছিলাম সেটা রজত নয়। এইরূপ ভুল সব প্রকার জ্ঞানেই হইতে পারে; বেদ-বাক্যের অর্থ বুঝিতেও ভুল হইতে পারে; কিন্তু ভুলের সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া কি জ্ঞান জ্ঞান নয়? আর, প্রত্যেক জ্ঞানকেই যদি জ্ঞানান্তর দ্বারা সমর্থিত করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে তো একটা বিরাট 'অনবস্থা' হইয়া দাঁড়াইবে। ১ম জ্ঞান ২য় জ্ঞানের, সেটি আবার ৩য় জ্ঞানের অপেক্ষা করিবে; এই ভাবে একটা সীমাহীন শ্রেণীতে গিয়া পৌঁছাইতে হইবে, এবং নিশ্চিত জ্ঞান কখনই হইবে না। সুতরাং

আমাদের যখন যে জ্ঞান হয়, তাহা নিজেই নিজের প্রমাণ, ইহাই স্বীকার করিতে হয় ; প্রত্যেক জ্ঞানই স্বতঃপ্রমাণ।

ইহারই নাম স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ। মীমাংসার পক্ষে ইহা মানা বিশেষ প্রয়োজন, শব্দ-প্রমাণের প্রামাণ্যের জন্য। শব্দ-প্রমাণকে অন্য প্রমাণের নিরপেক্ষ না করিলে বেদকে যে অতুলনীয় স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহা রক্ষা করা যায় না। 'স্বতঃপ্রামাণ্য'বাদের পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথা হইয়াছে। অনেক আলোচনা হইয়াছে, এবং অনেক সমালোচনাও হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগকে এইখানেই ক্ষান্ত হইতে হয়।

মীমাংসা ও ব্যাকরণ

বেদের আলোচনায় বেদাঙ্গের কথাও আসিয়া পড়ে। বেদাঙ্গ ছয়টি—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। সংক্ষেপে, শিক্ষায় উচ্চারণ, কল্পে ক্রিয়াপদ্ধতি, নিরুক্তে শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ এবং ছন্দে বিশেষভাবে বৈদিক মন্ত্রের ছন্দ আলোচিত হয় ; জ্যোতিষ ও ব্যাকরণের অর্থ স্পষ্ট। জ্যোতিষে কখন্ অমাবস্যা আরম্ভ কখন্ পূর্ণিমা শেষ ইত্যাদি জানিতে হইত, দর্শ-পৌর্ণমাস্য ইত্যাদি ক্রিয়ার প্রয়োজনে। ব্যাকরণও একটি বেদাঙ্গ ; সুতরাং ইহার সঙ্গে বেদ-পাঠের সম্পর্ক নিকট। কিন্তু সম্পর্কটা ঠিক কী ধরনের তাহা লইয়া তর্ক রহিয়াছে।

বেদাঙ্গ সমস্তই স্মৃতি, শ্রুতি নয় ; এই এক" কথায়ই তাহাদের প্রামাণ্য যে দ্বিতীয় স্তরের তাহা বুঝানো হয়। তথাপি তাহাদের একটা মূল্য আছে। মুখ্যভাবে ব্যাকরণ মীমাংসার আলোচ্য না হইলেও গৌণভাবে অনেক সূক্ষ্ম কথা মীমাংসার আলোচনার ফলে ব্যাকরণে প্রবেশ করিয়াছে। শব্দের নিত্যতা, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ প্রকৃতি ও

প্রত্যয়, স্ফোট প্রভৃতি বিষয় কতক অভিধানের বা নিরুক্তের আর কতক ব্যাকরণের বিচার্য। ব্যাকরণের সব সূক্ষ্ম তত্ত্বের আবিষ্কারের সম্মান দর্শনের মধ্যে ন্যায় ও মীমাংসারই বিশেষভাবে প্রাপ্য। ন্যায়ের আলোচনায় আমরা ইহার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিয়াছি। মীমাংসা ও সেইসব তর্কবিচারে যোগ দিয়াছিল, ইহা স্মরণ না রাখিলে মীমাংসার প্রতি অবিচার করা হয়।

প্রমেয়

দর্শন হিসাবে মীমাংসার স্থান খুব উচ্চে নহে, একথা আমরা আগেই বলিয়াছি। অনেক সূক্ষ্ম বিচার মীমাংসা করিযাছে; এবং সেইজন্যে সমস্ত মীমাংসকদিগকে—জৈমিনি, শবর, কুমারিল, প্রভাকর, মুরারি প্রভৃতি লেখককে তাহাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য প্রশংসা করিতে আমরা বাধ্য। কিন্তু সে সব বিচার যে ঠিক দার্শনিক বিচার নয়, তাহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে।

ভারতীয় চিন্তায় মীমাংসার স্থানের অনুরূপ স্থান ইউরোপে গ্রহণ করিয়াছিল মধ্যযুগের তথাকথিত দর্শন। সে-দর্শনের চতুঃসীমা বাঁধিয়া দিয়াছিল তখনকার খৃস্টান ইউরোপের শ্রুতি— অর্থাৎ বাইবেল। বাইবেলের এবং বাইবেলের গৃহীত ব্যাখ্যার বাহিরে চিন্তার গতি তখন নিষিদ্ধ ছিল। জগৎসৃষ্টির ও ঈশ্বরের কথা বাইবেল যাহা বলিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধ কথা, তখন অকল্পনীয় ছিল। সুতরাং এসব সত্যকার দার্শনিক প্রশ্ন সম্বন্ধে মধ্যযুগের দর্শন নির্বাক। এক ও বহু, ব্যক্তি ও জাতি ইত্যাদি সাধারণ পৌরাণিক প্রশ্নের বিচার বেশী হইত; আর বিবেচিত হইত, পিতা-ঈশ্বর, পুত্র-ঈশ্বর ও পবিত্র প্রেতাত্মা এক না বহু, অভিন্ন না ভিন্ন ইত্যাদি প্রশ্ন। ধর্মের গণ্ডির মধ্যে ধর্মের অনুমোদিত

প্রথায় ধর্মসম্বন্ধীয় প্রশ্নের আলোচনাই ছিল তথন দর্শন। তাহার পর, বিস্মৃত ও অবহেলিত গ্রীক-দর্শনের কিছু-কিছু আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল; বিশেষ করিয়া প্ল্যাতো ও আরিস্ততল্ অধীত ও অধ্যাপিত হইতে লাগিল। আরিস্ততলের তর্কশাস্ত্র সংযুক্ত হইয়া ক্রমশ খৃস্টান দর্শনকে একটা নূতনরূপ দিতে লাগিল। পরে খৃঃ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে গ্রীক সাহিত্যের পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাজগতে যে পুনরুজ্জীবন দেখা দিয়াছিল তাহা চিন্তাশীল সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু সে আলোচনা আমাদের সীমার বাহিরে। আমাদের শুধু এইটুকু জানা দরকার যে, মীমাংসাজাতীয় দর্শন এক ভারতেই আবির্ভূত হয় নাই; বৃহত্তর দার্শনিক জগতেও তাহার দোসর রহিয়াছে।

ইউরোপের মধ্যযুগীয় দর্শন যেমন ঠিক দর্শন না হইলেও দার্শনিক প্রশ্ন তুলিয়াছিল এবং ভাবিযাছিল, মীমাংসাও তেমনই প্রসঙ্গক্রমে দর্শনের আসল প্রশ্নের কথা তুলিয়াছে। কিন্তু তাহার উত্তর সহজ ও সংক্ষিপ্ত।

১. ঈশ্বর মীমাংসায় স্বীকৃত হন নাই। জগৎ অনাদি—সুতরাং স্রষ্টার অপেক্ষা রাখে না। আর, কর্ম আপনার ফল আপনি দিতে পারে, সুতরাং কর্মফলদাতা-রূপেও ঈশ্বর নিষ্প্রয়োজন। ইউরোপের চিন্তায় এবং খৃস্টান ও মুসলমান ধর্মে পাপ-পুণ্যের বিচার ঈশ্বর করেন—শাস্তি ও পুরস্কার—নরক ও স্বর্গ—তাঁহার আদেশে লোকে ভোগ করে। মীমাংসায় পুণ্যপাপের ফল স্বীকৃত— কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তি যেমন আপনি কাজ করিয়া যায়—কাহারও হস্তস্পর্শের অপেক্ষা করে না— উপরদিকে ঢিল ছুঁড়িলে যেমন আপনি নামিয়া আসে, কাহাকেও নামাইয়া দিতে হয় না, তেমনই কর্ম আপন ফল আপনি দেয়, অতিরিক্ত কোনো পুরুষ বা শক্তির প্রতীক্ষা করে না।

আর-একটা কথা এখানে বলা দরকার। মীমাংসা স্বর্গের কথা যত বলিয়াছে, নরকের তত নয়। উন্নততর ভবিষ্যতের আশায় উদ্বুদ্ধ করিয়া কর্মে প্রবর্তিত করাই বৈদিক বিধির প্রধান উদ্দেশ্য। উন্নততর অস্তিত্ব সম্ভব হইলে নিম্নতর অস্তিত্বও অকল্পনীয় নয। কোনো কোনো কর্ম যে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা হইতেই নিম্নগতির আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তথাপি নরকের কল্পনাটা বৈদিক চিন্তায় প্রবল নয়, সুতরাং মীমাংসায় উহা স্ফুট হইয়া উঠে নাই। ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলমান—পশ্চিম এসিয়ার এই ধর্মত্রয়ে নরকের কল্পনাটা যত প্রবল ও পরিস্ফুট, বেদের এবং বেদাশ্রিত মীমাংসার চিন্তায় তাহা তেমন প্রখর নহে। 'নরক' শব্দটিও অবৈদিক। বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে বোধ হয় সর্বপ্রথম উহা তৈত্তিরীয় আরণ্যকেই ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী পুরাণাদিতে ইহার ধারণা পরিস্ফুট হইয়াছে। পশ্চিম এসিয়ার ধর্মের সহিত সংস্পর্শের ফলে কি না, কে বলিবে? কিন্তু আদিম আর্যভারতের চিন্তায স্বর্গের কথা যেমন বলা হইয়াছে, নরকের কথা তেমন নয়।

আরও একটা কথা। বেদের এবং মীমাংসার স্বর্গ ঠিক একটা নির্দিষ্ট বাসস্থান নহে। ইহা একটা অবস্থা; অনাবিল আনন্দ—দুঃখের একান্ত অভাবই স্বর্গ।

২. ঈশ্বর নাই, কিন্তু বৈদিক দেবতারা? তাঁহাদের কথা বিশেষভাবে বেদান্ত ভাবিয়াছে, এবং যে সিদ্ধান্ত করিয়াছে তাহা পরে বলা হইবে। মীমাংসা ঠিক বিচার্য হিসাবে তাঁহাদের কথা তুলে নাই; কিন্তু বেদ যখন সম্পূর্ণ স্বীকৃত, স্বতঃপ্রমাণ, তখন তথায় বর্ণিত যজ্ঞাদির অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদিগকে অস্বীকার করিবার কী উপায়? যজ্ঞে তাঁহাদিগকে আহ্বান করা হয়, তাঁহাদের নামে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। অগ্নি নিজেও দেবতা। আর, দেব ও অসুরের কথা এবং দেব

ও মনুষ্যের কথা বেদ ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বহুস্থানে আলোচিত হইয়াছে। মীমাংসা তাঁহাদিগকে কাল্পনিক বা অবাস্তব কিংবা সৃষ্ট জীব মনে করিতে পারে নাই। কারণ, তাঁহাদিগের স্রষ্টা হইবার মতো উচ্চতর সত্তা মীমাংসা স্বীকার করে নাই। যজ্ঞে অধিকারের প্রশ্ন যখন উঠিয়াছে তখন মীমাংসা সিদ্ধান্ত করিযাছে, দেবগণের যজ্ঞে অধিকার নাই, কেননা, তাঁহাদের প্রযোজন নাই এবং তাঁহাদের উপরে এমন কেহ নাই যাঁহাকে বা যাঁহাদিগকে তুষ্ট করা তাঁহাদের দরকার। কোনো কোনো মীমাংসক (যেমন পার্থসারথি) এই মতের বিরোধী। দেবতারাও তাহাদের মতে যজ্ঞ করিতে পারেন।

কিন্তু বেদান্তসূত্র মোক্ষশাস্ত্রে দেবগণের অধিকার স্বীকার করিয়াছে। দেবতারাও জীব, মোক্ষের প্রযোজন আছে, সুতরাং মোক্ষশাস্ত্র বা বেদান্ত চর্চা করিতে অধিকারী। উভয় মীমাংসার মধ্যে অন্যান্য প্রভেদের সঙ্গে ইহাও একটি বড়ো প্রভেদ।

৩. জগৎ বিচিত্র ও বিবিধ বস্তুতে পরিপূর্ণ হইয়া অনাদিকাল বর্তমান রহিয়াছে। ইহার ভিতর পরিবর্তন হয়, দেখাই যায়; কিন্তু ইহা অনাদি এবং এক হিসাবে অনন্ত বা বিনাশহীন। কল্পান্তে তাহার প্রলয় হয় ঠিক, কিন্তু গুটানো পটের মতো যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকিযা যায়, এবং পট খুলিলে যেমন সেই ছবি আবার দেখা যায়, প্রলয়ান্তে জগৎও আবার তেমনটিই ফিরিয়া আসে।

৪. আত্মা বহু এবং অসৃষ্ট ও অমর। কর্ম অনুসারে দেহ লাভ করে। সুকর্মের ফলে স্বর্গাদি ভোগ করে। আত্মা কর্তা। ক্রিয়া করিবার এবং ফল ভোগ করিবার শক্তি তাহার আছে। মীমাংসা সাংখ্যের মতো পুরুষবহুত্ব স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য দর্শনের মতো আত্মার মোক্ষ সেখানে মুখ্য আলোচ্য নহে। স্বর্গের কথা বলা হইয়াছে

—কিন্তু স্বর্গই মোক্ষ নয়; সে-কথা বেদান্তে অত্যন্ত স্পষ্টভারে বলা হইয়াছে, উপনিষদেও তাহার আভাস রহিয়াছে। মীমাংসা স্বর্গের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। দর্শনের মধ্যে মীমাংসার স্থান ইহা হইতেই বুঝা যাইবে। সূত্রে এবং ভাষ্যে মুক্তিব কথা উঠে নাই। পরবর্তী মীমাংসকেরা কেহ কেহ হয়তো অন্য দর্শনের চাপে পড়িয়া, এক-আধটুকু মুক্তির কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা যেন অনেকটা ভদ্রতার খাতিরে। আসল কথা এই যে, স্বর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু তো কর্ম দ্বারা লভ্য নয়; যদি তেমন-কিছু মানুষ চায়, তবে কর্মের মূল্য কমিয়া যায়। কর্মকে পরিপূর্ণ প্রাধান্য দিয়া কর্মলভ্য স্বর্গ অপেক্ষা বড়ো-কিছু স্বীকার করা মীমাংসার পক্ষে স্বমতবিরোধী সুতরাং বর্জনায়।

৫. কর্ম ও তাহার ফল সম্বন্ধে মীমাংসা একটা নূতন পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছে, তাহার নাম 'অপূর্ব'। কর্মের ফল সব সময়ই অব্যবহিত পরেই হয় না। এখন যজ্ঞাদি করিয়া যাইতেছি, ফল আসিবে মৃত্যুর পরে—স্বর্গে। কিন্তু যজ্ঞ তো শেষ হইয়া গিয়াছে; কর্মটি তো আর নাই; 'কারণ' তিরোহিত হইলে কার্য আসিবে কোথা হইতে? মীমাংসার মতে যজ্ঞাদি ক্রিয়া একটা শক্তি সৃষ্টি করে—তাহার নাম 'অপূর্ব'; ইহা যজ্ঞাদির কর্তা আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে অথবা জগতে কোথাও থাকে এবং যথা সময়ে ফল দান করে।

প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা অপূর্ব হয়। কর্তা একাধিক যজ্ঞ করিলে একাধিক অপূর্বের অধিকারী হয়। জড়-জগতে বিবিধ শক্তির এক-কালিক ক্রিয়ায় যেমন একটা সমবেত ফল উৎপন্ন হয়, তেমনই আত্মার বেলায়ও বিবিধ অপূর্ব মিলিয়া একটা সর্বসমেত ফল দেয়। সৎকর্মের যে অপূর্ব তাহার নামান্তর পুণ্য। এই পুণ্য সঞ্চিত হইতে পারে এবং যথাকালে ফল দেয়; ইহা এখনও সাধারণ হিন্দুর বিশ্বাস।

গ্রহণাদিতে গঙ্গাস্নান, যজ্ঞ ও দান, তীর্থ-পর্যটন, ইত্যাদি এখনও গৃহীত বিশ্বাস অনুসারে পুণ্য; ইহাদের ফল পর-পর সঞ্চিত হইতে থাকে, এই বিশ্বাস না থাকিলে কেহই কষ্ট স্বীকার করিয়া এই সব কাজ করিত না। বৈদিক যজ্ঞাদি ক্রিয়া বর্তমান হিন্দুধর্মে বিবাহ প্রভৃতি দশ সংস্কারের বাহিরে খুব সামান্যই রহিয়াছে। সে সকলের জায়গায় তান্ত্রিক হোম, পৌরাণিক পূজা ইত্যাদি অনেক প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু মীমাংসা-কল্পিত অপূর্বে বিশ্বাস এই সব ক্রিয়ার বেলায়ও আছে। এই সব ক্রিয়া দ্বারা অর্জিত পুণ্যও সঞ্চিত থাকে—ক্রিয়া সম্পাদনের পর-মুহূর্তেই ফল দেয় না; সুতরাং অপূর্ব শব্দটি সকলে না জানিলেও ইহাতে বিশ্বাস এখনও পূর্ববৎ বর্তমান রহিয়াছে।

পুরাণে সঞ্চিত পুণ্য দানের কথাও শুনা যায়; অর্থ যেমন একজন আর-একজনকে দিতে পারে, তেমনই পুণ্যেরও সম্প্রদান সম্ভব, এরূপ বিশ্বাস পুরাণে পাওয়া যায়। নিজের যৌবন ও আয়ুও দানযোগ্য সামগ্রী, ইহাও পুরাণ বলিযাছে; এবং এইরূপ দানের কাহিনীও পাওয়া যায়। এখন সত্য-সত্যই পুণ্য, আয়ু, যৌবন ইত্যাদি দানযোগ্য সামগ্রী বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে, এমন মনে হয় না। হস্তান্তর করা সম্ভব মনে না হইলেও পুণ্য বা অপূর্ব যে সঞ্চিত হইতে পারে, এ বিশ্বাস এখনও আছে। পুণ্য যাহারা করে তাহারা উহার সঞ্চয়ের সম্ভাবনায় সন্দেহ করে না।

এইরূপ পুণ্য-সঞ্চয়ের ধারণা অন্যান্য ধর্মেও অবর্তমান নহে। ঈশ্বরের দফ্‌তরে মানুষের কৃতকর্মের একটা হিসাব থাকে, ইহা সাধারণ খ্রীস্টান ও মুসলমানও মানে। শেষ বিচারের দিন এই সব হিসাব দেখিয়াই ভগবান্ মৃত মানুষের আত্মার নরক কিংবা স্বর্গ বাসের আদেশ দিবেন, এই বিশ্বাস আমাদের অপরিচিত নয়। এই বিশ্বাস আর মীমাংসার অপূর্বের মধ্যে প্রভেদ এই যে, এখানে ঈশ্বর মানুষের কৃতকর্মের হিসাব রাখেন

আর মীমাংসার মতে কর্ম জাগতিক শক্তির মতো আপন কাজ আপনিই করে, ঈশ্বর কিংবা এইরূপ আর-কাহারও প্রতীক্ষা করে না।

এই যে পুণ্য সঞ্চয় ইহা, আর চরিত্র-নীতির নিয়ম অনুসারে মানুষের সৎ হওয়া, কি একই বস্তু? উভয়ের মূল্যও কি এক? কাম, ক্রোধ ইত্যাদি রিপু জয় কবিয়া দয়া, দাক্ষিণ্য ইত্যাদি গুণ অর্জন করিয়া মানুষ সৎ, মহত্তর হয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করে; এই ধারণা আর অপূর্ব-সঞ্চয়ের ধারণা ঠিক এক নয়। ঔষধ ব্যবহারে রোগ দূর হয়, ব্যায়াম করিলে শরীর উন্নত হয়, এসব তো সঞ্চিত হইয়া ফল দেয় না; পর-পর ফল দিয়া যাইতে থাকে; নীতি ও ধর্মের অনুশীলনেব ফলে মানবাত্মা ক্রমশ উন্নত হইতে থাকে; কালান্তরের অপেক্ষা করে না। অপূর্বের যে কল্পনা মীমাংসা করিয়াছে এবং পুণ্যসঞ্চয়ের যে ধারণা এখনও অনেকের মনে আছে তাহাতে চরিত্রের নৈতিক উন্নতির ধারণা স্পষ্ট তো নয়ই, আদৌ বর্তমান আছে কি না, জিজ্ঞাসা করা চলে। এখানে ধর্ম ও চারিত্র নীতির সম্বন্ধের কথা আসিয়া পড়ে। সকল ধর্মেই কৃত-কার্য দ্বারা পুণ্য সঞ্চয়ের অথবা তাহারই রূপান্তর ঈশ্বরের তুষ্টি-বিধানের ধারণা রহিয়াছে। তাহা আর চরিত্র-নীতি অনুসারে চরিত্রের উন্নতি যে এক বস্তু নয় উগ দার্শনিকদের অজ্ঞাত নয়। ভারতে জৈন ও বৌদ্ধেরা ধর্মকে হীন করিগা ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করিয়া চরিত্রকে বড়ো করিয়া এই প্রভেদটা অত্যন্ত প্রকট করিয়া তুলিয়াছে।

মীমাংসা ও আধুনিক চিন্তা

দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলির প্রতি মীমাংসা অতি অল্পই দৃষ্টি দিয়াছে। সুতরাং আধুনিক চিন্তার ভাণ্ডারে রক্ষিত হওয়ার মতো সামগ্রী উহার কাছে আমরা বেশী পাই নাই। বেদের বিধিবাক্যের অর্থ-উদ্‌ঘাটন

করা তাহার প্রধান কাজ; অনেক সূক্ষ্ম বিচার সেখানে হইয়াছে। তাহার ফলে বিধির অর্থ আবিষ্কারের কতকগুলি নির্দিষ্ট পথ সে বাঁধিয়া দিয়াছে। হিন্দু-আইনের ব্যাখ্যায় সে সকল আধুনিক আদালতেও অনেক সময় প্রযুক্ত হইয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। একমাত্র পুত্র দত্তক দেওয়া যায় কি না, এক সময় বিচার্য হইয়া পড়িয়াছিল। স্মৃতিতে উহা নিষিদ্ধ; কিন্তু এক স্থানে এই নিষেধের সঙ্গে একটা কারণও দেখানো হইয়াছে—'স হি সন্তানায পূর্বেষাং'—সেই একমাত্র পুত্র পূর্ব-পুরুষদের বংশ বিস্তৃত করিবে, সুতরাং তাহাকে বংশান্তরে দান করা যায় না। প্রশ্ন উঠিল, একমাত্র পুত্র দত্তক দেওয়ার যে নিষেধ, উহা কি আদেশ না, শুধু উপদেশ? আদেশে কারণ দেখানো হয় না,—'ইহা করিয়ো কিংবা করিয়ো না'—এইরূপ ভাষা ব্যবহার করা হয়, উপদেশে যুক্তি দেখানো হয়, ইহা করিলে এইরূপ হইতে পারে—এই ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়। সুতরাং একমাত্র পুত্র দত্তক দেওয়া সম্বন্ধে যে বিধি তাহা পরামর্শ, উপদেশ মাত্র, আদেশ নয়; দিলে দেওয়াও যায়। প্রিভি কাউন্সিল্ এই অর্থ গ্রহণ করিয়া দত্তক দেওয়ার পক্ষে রায় দিয়াছেন। এখন ইহাই হিন্দুদের আইন। মীমাংসকেরা কেহ কেহ (যথা, গঙ্গানাথ ঝা) বলেন যে, প্রিভি কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। ভ্রান্ত কি না সে-মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের শুধু জানা দরকার যে এইরূপ ব্যাখ্যায় মীমাংসার সাহায্য লওয়া হয়। আরও অনেক ক্ষেত্রে এরূপ সাহায্য লওয়া হইয়াছে। মীমাংসার মত কী তাহাও একজন ভুল বুঝিতে পারে। যেমন পূর্ব-উক্ত স্থলে মীমাংসার অর্থ প্রিভি কাউন্সিল বুঝেন নাই, এরূপ দাবি করা হইয়াছে। কিন্তু কেহ ভুল বুঝুক কিংবা না বুঝুক, মীমাংসার সাহায্যে যে আইন বুঝিবার চেষ্টা হইয়াছে, ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

হিন্দু-আইনের ব্যাখ্যা এখন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রিভি কাউন্সিল ভুল রায় দিয়া থাকিলেও তাহাই এখন আইন। আধুনিক আইন সভায়ও এখন প্রচলিত হিন্দু-আইন সংস্কার করার চেষ্টা হইতেছে। কতকগুলি নূতন আইন ইতিমধ্যে হইয়া গিয়াছে। বিবাহ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে আরও নূতন আইনের প্রস্তাব চলিতেছে। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে মীমাংসার শাসন অত্যন্ত শিথিল হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠান ও আচার এখনও হিন্দু সমাজে অনেক রহিয়া গিয়াছে। একসময়ে এগুলিতে মীমাংসার পূর্ণ শাসন ছিল। কিন্তু সংস্কারে উন্মুখ আধুনিক সমাজ প্রাচীনের অনুসরণ আর কতটুকু করিতে চাহে? স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি, কর্তব্য-জ্ঞান এবং অন্য উচ্চতর সমাজের দৃষ্টান্ত দ্বারাই আমরা এখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে চালিত হইতে চাই। সুতরাং প্রত্নতত্ত্বের ভাণ্ডারে স্থান পাইলেও হিন্দুর বাস্তব জীবনে মীমাংসা এখন ক্রমশই শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। প্রাচীনকে সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে চাহিলে সংস্কার হয় না—ইহা অতি সহজ কথা। উদ্বুদ্ধ হিন্দু-সমাজ এখন অস্পৃশ্যতা বর্জন, অসবর্ণ বিবাহ গ্রহণ, ইত্যাদি নানা দিকেই মীমাংসার শাসন অতিক্রম করিয়া মীমাংসার অননুমোদিত আচার গ্রহণ করিতে চাহিতেছে। মীমাংসার দানের চিরস্থায়ী সমাদর আর থাকিতেছে কোথায়?

মীমাংসা—পূর্ব ও উত্তর

একসময়ে উভয় মীমাংসাকে যে মিলিত ভাবে এক শাস্ত্র মনে করা হইত তাহার প্রমাণ আছে। উভয়েই প্রকাশ্যে বেদার্থের দ্যোতয়িতা; সুতরাং বেদ এক হইলে তাহারাও এক, এই সিদ্ধান্ত সহজ ছিল। উপবর্ষ প্রভৃতি দুই-এক জন লেখকের বই আবিষ্কৃত না হইলেও মত জানা

যায়; তাঁহারা মীমাংসার আদিম সূত্র 'অথাতো ধর্ম-জিজ্ঞাসা' হইতে আরম্ভ করিয়া বেদান্তের অন্তিম সূত্র 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' এই পর্যন্ত এক গ্রন্থ ধরিয়া লইয়া বিচার করিয়াছেন এবং তাহার উপর ভাষ্যাদিও লিখিয়াছেন। একটা ঐতিহাসিক কথা এখানে আবার মনে করা ভালো। বেদের উপর অবিশ্বাসীদের আক্রমণ চলিতেছিল। খ্রীস্টের জন্মের অন্যূন ৬০০।৭০০ বৎসর আগে হইতেই এই আক্রমণ চলিতেছিল। তাহার পর জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই আক্রমণ তীব্রতর হইয়াছিল,—ইহারও প্রমাণের অভাব নাই। তর্ক-সভায়, প্রচারে, দর্শনে, নানা দিক দিয়া বেদ ও বৈদিক ধর্মের নিন্দা হইতেছিল। ধর্মের রক্ষক রাজারা কেহ কেহ (যেমন সম্রাট অশোক) এই সব বেদ-বিরোধী মতের পৃষ্ঠপোষণ করিতেছিলেন। সুতরাং একটা সময় আসিযাছিল যখন বেদের আত্মরক্ষার প্রযোজন হইযাছিল।

অন্য চারিটি আস্তিক দর্শন মুখে বেদ মানিত; কিন্তু বেদ রক্ষায় বিশেষ সহায়তা করে নাই, একথা আমরা আগেই বলিয়াছি। বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করাও এক প্রকার সম্মান দেখানো, ইহা ঠিক; কিন্তু তাহাতে বেদের শিক্ষার প্রচারের খুব বেশী সহায়তা হয় না। সেই ক্ষেত্রে উভয় মীমাংসাই সম্মিলিত ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধ চলে কিছুদিন। মীমাংসক কুমারিল ৭ম শতাব্দীর লোক; আর, বৈদান্তিক শঙ্কর ৮ম-৯ম শতাব্দীর লোক। ইঁহারা দুইজনেই প্রচারকের কার্য অনেক করিয়াছিলেন। কুমারিল বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্মকীর্তির সঙ্গে তর্ক ও বিচার করিয়াছিলেন, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। শঙ্করের দিগ্বিজযেরও বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে। বিরুদ্ধ মতগুলিকে তর্কে—প্রয়োজন হইলে এবং সুবিধা পাইলে অন্য উপায়েও—পরাজিত করিয়া বেদের প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা বৃদ্ধি যে ইঁহারা করিয়াছিলেন তাহা স্বীকৃত। অন্য অনেকেও

এই কার্যে যোগ দিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মীমাংসক এবং প্রত্যেক বৈদান্তিকই কোনো না কোনো প্রকারে বেদের মর্যাদা-বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন; প্রসিদ্ধি সকলের সমান হয় নাই, ইহা তো সহজেই বুঝা যায়। উভয় মীমাংসাই এই ক্ষেত্রে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে পূর্ণ ঐক্য রক্ষা করিয়াছে।

কিন্তু বেদ মান্য, বেদ শাস্ত্র এবং প্রমাণ, ইহা স্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেদ ও বেদান্তের প্রভেদ স্ফুট হইয়া পড়িতে থাকে। সাধারণ ভাবে বেদকে সম্মান দেখানো এক কথা; আর, বেদের কর্ম-উপদেশ আর বেদান্তের জ্ঞান-উপদেশ—কর্ম-কাণ্ড এবং জ্ঞান-কাণ্ড উভয়কে এক মনে করা, পৃথক্ কথা। বৈদিক সাহিত্যেই উপনিষদে এই উভয়ের প্রভেদ প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং মীমাংসাদ্বয়ের ঐক্য দীর্ঘ কাল রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। উভয় দর্শনের সূত্রের মধ্যেই এই অনৈক্য দেখা দেয়; পরবর্তী ভাষ্যকার প্রভৃতির লেখায় উহা আরো পরিস্ফুট হয়।

বেদের অধীন বলিয়া সাধারণ ভাবে কতকগুলি বিষয়ে উভয় মীমাংসার মধ্যে সাম্য আছে। বেদ সত্য, ইহা উভয়েরই স্বীকৃত। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকৃত যে বর্ণ-ভেদও সত্য। আধুনিকদের চোখে দর্শনের পক্ষে এরূপ কথা বলা একটু বিসদৃশ ঠেকিবে; কিন্তু উভয় দর্শনই শূদ্রের শাস্ত্রে অনধিকারের কথা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, বেদান্ত এই অনধিকার প্রতিপন্ন করার জন্য একটু বুদ্ধির কসরতও দেখাইয়াছে। উপনিষদের এক জায়গায় উপদেশ্য ব্যক্তিকে উপদেষ্টা 'শূদ্র' বলিয়া সম্বোধন করিয়াও পরে তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিয়াছেন (ছান্দোগ্য—৪র্থ অধ্যায়)। পাছে ইহা হইতে কেহ মনে করে, শূদ্রেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অতএব বেদে অধিকার আছে, সেই ভয়ে বেদান্তের সূত্রকার

শূদ্র শব্দের অন্য একটা অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন; উপনিষদের সেই 'শূদ্র' শব্দের অর্থ নাকি 'শোকার্ত'। এই অর্থ নিষ্কাশিত করিবার জন্য ব্যাকরণের উপর একটু দৌরাত্ম্যও তিনি করিয়াছেন; শোক-বোধক 'শুচ' শব্দ বাহির করিয়া তাহা হইতে 'শূদ্র' শব্দ ব্যুৎপাদিত করিয়াছেন। অথচ এই অর্থে ব্যবহৃত শূদ্র শব্দের দ্বিতীয় একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারেন নাই। তথাপি বেদান্ত শূদ্রের অধিকার স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন নাই। (বেদান্ত-সূত্র ১।৩।৩৪)। যাহাকে 'শূদ্র' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল, তিনি আসলে ক্ষত্রিয় ছিলেন, ইহাও বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে। এমন কি সত্যকাম জাবালও যে অ-ব্রাহ্মণ ছিল না তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে; এইরূপ নানাভাবে বেদাশ্রিত মোক্ষশাস্ত্রে শূদ্রের অনধিকার সাব্যস্ত করার চেষ্টা হইয়াছে।

কিন্তু এই সব সাম্য সত্বেও উভয় মীমাংসার মধ্যে কতকগুলি গুরুতর বৈষম্যও রহিয়াছে; সেইজন্য আধুনিক জগতের রাষ্ট্রনীতির ধরনে বেদবিরোধীদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় যাহারা মিত্র ছিল, তাহারাই যুদ্ধোত্তর কালে অমিত্র হইয়া দাঁড়ায়।

১. শূদ্র ছাড়া শাস্ত্রে অধিকারীর বিচারেও উভয়ের মত এক নয়। যজ্ঞাদি কর্মে দেবগণের অধিকার নাই, কেননা, ঐ সবের যাহা ফল তাহার কোনো প্রয়োজন তাঁহাদের নাই, ইহা জৈমিনির সিদ্ধান্ত। মোক্ষশাস্ত্রে বা বেদান্তেও দেবগণের প্রয়োজন নাই, ইহাও জৈমিনি বলিয়াছেন (বেদান্ত-সূত্র ১।৩।৩১,৩০)। কিন্তু বাদরায়ণ তাহা মানেন নাই (সূত্র ১।৩।২৬ ইত্যাদি)। সুতরাং দেবগণের অধিকার সম্বন্ধে উভয়ের মত এক নয়; দেবগণ সম্বন্ধে ধারণাও উভয়ের এক নয়।

২. জৈমিনি বা পূর্বমীমাংসার মতে দেবগণই সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের অপেক্ষা বড়ো কোনো সত্তা নাই। কিন্তু বেদান্তের মতে দেবতারাও জীব,

কাজেই বিগ্রহবান, সুতরাং মুক্তির প্রয়োজন তাঁহাদেরও আছে। শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্ম সকলের উপরে; দেবগণের অস্তিত্ব ও শক্তি সেখান হইতেই আসে। জৈমিনির ঈশ্বরও নাই, ব্রহ্মও নাই। দেবতা আছে; কিন্তু তাঁহাদের শক্তি ও ব্যক্তিত্ব খুব বেশী নয়; কর্ম নিজের ফল নিজেই দেয়—দেবতাদের সাহায্য দরকার হয় না। দেবতারা যজ্ঞে আহুত হন, স্তুতি শুনেন, তাহার বেশী কিছু করেন না। তাঁহাদের নামে দ্রব্যাদি দেওয়া হয়; প্রত্যক্ষ ভোগ তাঁহারা করেন না; এই দানের ফল যজমান পায়; দেবতারা দেন না; কর্ম সুসম্পন্ন হইলে ফল আপনিই আসে।

৩. জৈমিনির মতে কর্মই শ্রেষ্ঠ এবং তাহার ফল স্বর্গই পরম পুরুষার্থ; বেদান্ত জ্ঞানকে বড়ো মনে করিয়াছে এবং স্বর্গ অপেক্ষাও বড়ো বস্তু মুক্তির কথা তুলিয়াছে। মীমাংসা সমগ্র বেদকে কর্মের বিধি-নিষেধ রূপে ভাবিতে চায়; বেদান্ত কর্ম অপেক্ষা বড়ো জ্ঞানের উপদেশ বেদে ও বেদান্তে দেখিতে চায়; আর বেদান্ত বাক্যের সাহায্যেই প্রমাণ করিতে চায় যে কর্মদ্বারা উপার্জিত লোক ভঙ্গুর ও অদৃঢ়; মুক্তি না হইলে স্বর্গবাসের পরও আবার জন্ম লইতে হইবে (মুণ্ডক উপনিষদ্ ১।৭,৪০)।

৪. মীমাংসার জগৎ দ্রব্যময় ও দেবময়; বহু আত্মা ইহাতে বহুধা বিচরণ করে, এবং বহুবিধ কর্মফল ভোগ করে। বেদান্তের সাধারণ সিদ্ধান্ত ব্রহ্মই একমাত্র সত্য; জীবাত্মা ও জগৎ সকল বৈদান্তিকের মতে মায়া কিংবা সম্পূর্ণ অসত্য না হইলেও আপেক্ষিক সত্য -- ব্রহ্মাধীন সত্য।

মীমাংসা-দ্বয়ের মধ্যে এই সব প্রভেদের কারণ এই যে পূর্ব মীমাংসা ঠিক দর্শন নয়, কর্মের উপদেশ ও বিচার; উত্তর মীমাংসা দর্শনের চিন্তায় অনেক দূর অগ্রসর; সুতরাং পূর্ব মীমাংসার অনেক সিদ্ধান্ত ব্যবহারে সত্য হইলেও পরিণামে অসত্য বলিয়া তাহাকে বর্জন করিতে হইয়াছে।

৩. বেদান্ত

গৃহ ও অরণ্য

পূর্ব মীমাংসায় বিবেচিত ধর্ম গৃহীর ধর্ম। নির্ধনের যজ্ঞাদি কর্মে অধিকার আছে কি না তাহাও প্রশ্ন হিসাবে আলোচিত হইয়াছে—(মীঃ সূঃ ৬।১।৩৯-৪০)। মীমাংসা হইয়াছে, যজ্ঞ দ্রব্যময়—সুতরাং দ্রব্যসম্পদ যাহার আছে সে-ই যজ্ঞে অধিকারী। নির্ধন যজ্ঞে চিরকালের জন্য অনধিকারী নয়; কারণ, সে ধনী হইতে পারে এবং যখন ধন পাইবে, তখন যজ্ঞ করিবে। আবার, শুধু গৃহী হইলেই চলিবে না—বিত্ত এবং গৃহিণী উভয়ই যজ্ঞাদিতে প্রয়োজন। 'পতি' শব্দের স্ত্রী-লিঙ্গে 'পত্নী' হয়, যজ্ঞ সংযোগে (পাণিনি সূত্র ৪।১।৩৩)। যজ্ঞে পত্নীর উপস্থিতি সর্বত্র না হইলেও অনেক স্থানে প্রয়োজন। রামচন্দ্র সীতা পরিত্যাগের পর আর বিবাহ করেন নাই; কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেখানে সীতার প্রতিকৃতি উপস্থিত রাখিযাছিলেন। তাহার পর, যজ্ঞে অনেক দ্রব্য লাগে—অনেক ক্ষেত্রে সোনাও লাগে; সুতরাং একেবারে নির্ধনের সেই সব করা দুঃসাধ্য এবং অনেক ক্ষেত্রে অসাধ্য। এই সমস্ত হইতে সহজেই বুঝা যায়, মীমাংসার ধর্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে; কামিনী ও কাঞ্চন যাহাদের আছে, তাহাদের ধর্ম।

আজ হইতে আড়াই হাজার, পৌনে তিন হাজার বৎসর আগের ভারতের সামাজিক অবস্থাটা আর-একবার আমাদের মনে করা দরকার। তখন জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; আর্য ও অনার্যের সম্মিলনে সৃষ্ট বৃহত্তর সমাজে যজ্ঞাদি আচার-অনুষ্ঠানের একটা বিরুদ্ধ মতও ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। যাহারা প্রকাশ্যে

বেদের বিরোধী—যেমন চার্বাক, মহাবীর ও বুদ্ধ—তাহারা ছাড়া আরো এক শ্রেণীর চিন্তাশীল লোকের আবির্ভাব বৈদিক মণ্ডলীর ভিতরেই হইতেছিল—যাহারা বেদ বিহিত যজ্ঞাদিতে যোগ দিতেন অথচ ইহাদের মূল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিতেছিলেন। বুঝিবার সুবিধার জন্য ইহাদিগকে আমরা ব্রহ্মবাদী বা ব্রহ্মবিদ্ বলিতে পারি। এই শ্রেণীর চিন্তাশীলদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ই ছিলেন, প্রমাণ পাওয়া যায়; তৃতীয় দ্বি-জাতির অর্থাৎ বৈশ্যদের কোনো উল্লেখ দেখা যায় না। বেদে ঠিক নয়, কিন্তু বেদান্তে—উপনিষদে—এই শ্রেণীর ভূরি ভূরি উল্লেখ রহিয়াছে এবং 'ব্রহ্মবিদ' এই শব্দটিও শ্রেণীবাচক অর্থে প্রযুক্ত দেখা যায়। যথা, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের আরম্ভে—ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—ইত্যাদি।

এই শ্রেণীর ভাবুকদের মধ্যে মীমাংসার প্রশংসিত কর্মাদির প্রতি অশ্রদ্ধা ক্রমশ জাগিয়া উঠিতেছিল; আর বিত্ত ও গৃহের প্রতিও অনাস্থা প্রকাশ পাইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যবাসের এবং অরণ্যে তপস্যার প্রশংসাও প্রকাশ পাইতে থাকে। আমাদের পক্ষে দুই-একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। যথা মুণ্ডকে—'প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা' (১।৭) 'পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়াৎ' (১।১২), ইত্যাদি। এই সব ক্ষেত্রে কর্মফলের অস্থিরত্ব ঘোষণা করা হইতেছে। তারপর ছান্দোগ্য উপনিষদ (৫।১০) বৃঃ আঃ (৬।২) ইত্যাদি স্থলে অরণ্যে শ্রদ্ধা তপ যাহারা করে তাহাদের শ্রেষ্ঠ গতির কথা বলা হইয়াছে। তাহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না। কিন্তু যাহারা গ্রামে থাকিয়া যজ্ঞ, দান ইত্যাদি করে তাহাদিগকে কর্মোচিত লোক ভোগ করিবার পর আবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এইভাবে গৃহের উপরে অরণ্যের স্থান, যজ্ঞের উপরে তপস্যার স্থান দেওয়া হইতেছিল।

যে সময়ের কথা আমরা ভাবিতেছি সে সময়ে বর্ণ ও আশ্রমের প্রভেদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। 'গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ'—(জাবাল-উপনিষদ)—গৃহী হইয়া বনে যাইবে, তাহার পর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে—এই বিধি তখন সকলে না হইলেও বিশ্বাসী অনেকেই গ্রহণ করিত। কালিদাস রঘুবংশের রাজাদের প্রশংসাচ্ছলে তাঁহারা বার্ধক্যে বানপ্রস্থী হইতেন একথা বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা বড়ো কথা এই ছিল যে, জৈন ও বৌদ্ধদের মধ্যে সন্ন্যাসী তখন বহু হইতেছিল। সংঘ ও বিহার ও আশ্রমে দেশ ভরিয়া উঠিতেছিল। সুতরাং যজ্ঞের ঋক্ ও সাম গানেরও উপরে মুক্তির বাণীতে দেশের আকাশ বাতাস ছাইয়া ফেলিতেছিল। এই প্রবল মুমুক্ষাকে আস্তিকদের জন্য রূপ দেয় বেদান্ত দর্শন।

বেদান্ত, বেদান্তসূত্র ও বেদান্তসাহিত্য

ছয়টি আস্তিক দর্শনের মধ্যে বেদান্তই প্রকৃত মোক্ষশাস্ত্র। উহাই সত্য সত্য মুক্তির কথা ভাবিয়াছে; মুক্তির কথা বলিতে গিয়া ষট্ পদার্থের বিবরণ দিয়া চুপ করিয়া যায় নাই। জীব ও জগতের কথা সে ভাবিয়াছে বন্ধ ও মুক্তির প্রসঙ্গে।

এই দর্শনের আরম্ভ উপনিষদে—বেদের অন্ত্যভাগে, এইজন্যই ইহার নাম বেদান্ত। ইহার নামান্তর ব্রহ্মবিদ্যা। 'ব্রহ্মই ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয়।' উপনিষদগুলি সব একই দেশে একই কালে রচিত হয় নাই; দুই-চারখানা সমসাময়িক হইতে পারে; বাকি ক্রমশ পরপর রচিত হইয়াছে; ইহার প্রমাণ দেওয়া যায়। তাহার পর অনেক কাল ইহাদের আলোচনা—পঠন পাঠন অথবা মৌখিক বিচার হইয়াছিল। ইহাও সহজেই ঐ সাহিত্যের অভ্যন্তরের প্রমাণ

হইতেই অনুমান করা যায়। দার্শনিক আলোচনায় অন্যত্র যেমন বেদান্তেও তেমনই মতভেদও দেখা দিযাছিল; উপনিষদের বাক্যগুলির অর্থ লইয়াই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মতভেদ হইয়াছিল। তাহার প্রমাণও বিভিন্ন উপনিষদে এবং বেদান্তসূত্রে দেখা যায়। কত কাল এইরূপ চলিয়াছিল, জোর করিয়া বলা কঠিন, তবে তিন-চার শতাব্দী তো বটেই।

অতঃপর বেদান্ত-সূত্র আসে। সমস্ত সূত্রগুলিব রচনা একই ব্যক্তি কর্তৃক একই দেশে একই কালে হয় নাই, এরূপ মনে করিবার পক্ষে যুক্তি আছে। রচনা-কাল লইয়াও মতভেদ আছে। অকাট্য যুক্তি দিয়া কাল নির্ণয় করা কঠিন; তবে, খ্রীঃ ৪র্থ শতাব্দীর পরে নয়, ইহাই সাধারণত গৃহীত অভিমত। দুই-চারটা সূত্র পরে যোজিত হইয়া থাকিতে পারে, তবে, মূল এবং প্রধান সূত্রগুলি এই সময়ের মধ্যে রচিত হইয়া গিয়াছিল।

সূত্রগুলির রচনার পর আর স্বতন্ত্রভাবে উপনিষদের দর্শন আলোচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সূত্রগুলিই তখন সমস্ত বেদান্ত-আলোচনার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। উপনিষদগুলি অধীত হইত —হয়তো, গ্রন্থ হিসাবে ব্যাখ্যাতও হইত; কিন্তু উহাদের মূলীভূত দর্শনের ব্যাখ্যা করিতে কেহই সূত্রকে অগ্রাহ্য করিয়া আর অগ্রসর হয় নাই। ৮ম শতাব্দীতে শঙ্কর, এবং আগে পরে আরও কেহ কেহ কোনো কোনো উপনিষদের ভাষ্য লিখিয়াছেন। কিন্তু বেদান্ত-দর্শনের বিবরণ সূত্রকে আশ্রয় করিয়াই সকলেই লিখিযাছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে—ডয়সেন (Deussen) প্রভৃতি কেহ কেহ এবং আধুনিক কালে ভারতেরও কেহ কেহ উপনিষদের দার্শনিক শিক্ষাকে বাদরায়ণের বেদান্তসূত্রের দর্শন হইতে পৃথক করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন।

কিন্তু হাজার হইলেও বেদান্তসূত্রকে একেবারে পরিহার করা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং সূত্ররচনার পর হইতে বেদান্তের পরিচয় বেদান্ত-সূত্রেতেই কেন্দ্রীকৃত হইয়াছিল।

এই সূত্রগ্রন্থের রচয়িতা বাদরায়ণ বা ব্যাস। ইঁহার ব্যক্তিগত ইতিহাস জানিবার চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ না হইলেও কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে। ইঁহাকেই একাধারে মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ ইত্যাদিরও প্রণেতা মনে করা যায়। তিনি একটি ব্যক্তি হইলেও সম্প্রদায়ের সমান; একই ব্যক্তি, না এক-নামধারী একাধিক ব্যক্তি, নিশ্চিত করা দুঃসাধ্য। এক্ষেত্রে যথাসম্ভব এবং যথাযুক্ত কিম্বদন্তী বিশ্বাস করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। গ্রন্থকারকে না জানিতে পারিলে একটা কৌতূহল আমাদের অচরিতার্থ থাকিয়া যায়, কিন্তু তাহার বেশী ক্ষতি আর কিছু হয় না।

সূত্র রচনার পর বেদান্ত সাহিত্য অন্য আকার ধারণ করে। আগে যে সব গ্রন্থ রচিত হয়, তাহাদের আশ্রয় হয় সূত্রগুলিই এবং নাম হয় বৃত্তি, ভাষ্য, টীকা ইত্যাদি। এই সব গ্রন্থ গদ্যে কমবেশী বিস্তৃতভাবে রচিত হয়। পরে এই সব ভাষ্যের মধ্যে যেগুলি প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহাদের আবার 'টীকা' হয়। এইভাবে অনেক ছোটো বড়ো গ্রন্থ রচিত হয়। পরে আবার ইহাদের সংক্ষেপও হয়, গদ্যে এবং পদ্যে।

প্রাচীনতম বৃত্তিকার বোধায়নের নাম আমরা পাই; গ্রন্থ পাই না। ভাষ্যকার উপবর্ষের নাম পাওয়া যায়, গ্রন্থ এখনও অনাবিষ্কৃত। খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার শঙ্কর। শঙ্করের পরে একাধিক ভাষ্যকার কতকটা নিজেদের সাম্প্রদায়িক মত আশ্রয় করিয়া বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য লেখেন; যেমন, রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধব, বল্লভ, শ্রীকণ্ঠ

ইত্যাদি। ইঁহাদের ভাষ্য আশ্রয় করিয়া বেদান্তের বিভিন্ন সম্প্রদায় উৎপন্ন হয়; এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটা ছোটো বড়ো সাহিত্য সৃষ্ট হয়। এইভাবে বেদান্তের শাখা-উপশাখা চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

বেদান্ত ও বেদান্তী

কথাটা আমরা আগেও একবার তুলিয়াছি। ভারতের দার্শনিকদের সকলেই গৃহহীন সন্ন্যাসী ছিলেন, এমন নয়। বেদান্তের বেলায়ও আদিম বৈদান্তিক যাঁহারা—যেমন উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি—তাঁহারাও গৃহী ছিলেন এবং যজ্ঞাদিতে উপস্থিত থাকার দরুন দক্ষিণা ইত্যাদিতে বহু অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয় করিতেন। কিন্তু জৈন বৌদ্ধের প্রভাবেই হউক কিংবা অন্য যে কারণেই হউক—৮ম শতাব্দী অর্থাৎ শঙ্করের সময় হইতে বেদান্তকে আমরা সন্ন্যাসীদের আশ্রয়েই দেখিতে পাই। জৈন বৌদ্ধের প্রভাবই ইহার একমাত্র কারণ নয় হয়তো; কারণ, উপনিষদ্ নিজেও আসলে আরণ্যক শাস্ত্র - অরণ্যবাসীর অধ্যেতব্য এবং অরণ্যবাস ও অরণ্যে তপস্যার প্রশংসাও সে করিয়াছে। তথাপি জৈনদের ও বৌদ্ধদের সন্ন্যাসীরা যে একটা প্রচুর শক্তিশালী সম্প্রদায় হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাও মানিতে হইবে। ইঁহাদের ত্যাগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল এবং ইঁহাদের আদর্শকে উপেক্ষা করিবার উপায় ছিল না। তার উপর বেদান্ত নিজেও বিশেষভাবে মোক্ষশাস্ত্র—মুমুক্ষুর অধ্যেতব্য। এই সমস্ত কারণে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীরা ইহাকে নিজস্ব করিয়া লন, আর, ইহাও সন্ন্যাসীদের আশ্রমেই নিজের সংগত ও উপযুক্ত আশ্রয় লাভ করে। শঙ্কর নিজে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। অন্যান্য যাঁহারা বেদান্তকে অনুসর্তব্য শাস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেন, তাঁহারাও বেশীর ভাগই ছিলেন সন্ন্যাসী।

বেদান্ত-সামান্য

সমস্ত সূত্রগ্রন্থের মধ্যে বেদান্ত-সূত্রই বেশী সুসম্বদ্ধ এবং সুসমঞ্জস। ইহার অধ্যায় বিভাগ, অধিকরণ বিভাগ এবং সূত্রগুলির পারম্পর্যের মধ্যে একটা স্পষ্ট শৃঙ্খলা লক্ষিত হয়। পূর্ব পক্ষ ও সিদ্ধান্ত, বিরুদ্ধ মতের উল্লেখ ও খণ্ডন, পরপর হইয়া যাইতেছে; হঠাৎ একটা অবান্তর বিষয়ের আবির্ভাব কদাচিৎ দেখা যায়। অন্য সকল দর্শনের সূত্রগুলির সম্বন্ধে এতটা প্রশংসা করা যায় কিনা সন্দেহ। এই বিষয়ের প্রমাণ দিতে যে তুলনা-মূলক সমালোচনা আবশ্যক, তাহা আমাদের সীমার বাহিরে। তবে যে-কোনো পাঠক কোনো-একটি টীকা বা অনুবাদের সাহায্যে বেদান্ত-সূত্র পড়িতে গেলেই আমাদের উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বেদান্তের সূত্রগুলির ভাষাও একাধিক দর্শনের ভাষা হইতে সহজ।

বেদান্তের যাহা প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় তাহা উহার প্রথম চারি সূত্রেই প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা হওয়া উচিত; এই জগতের জন্মাদি যাহা হইতে হয় তিনিই ব্রহ্ম; শাস্ত্রই তাঁহার প্রমাণ অথবা শাস্ত্র (বেদাদি) তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে; সমস্ত শাস্ত্র সমন্বয় করিয়া দেখিলে ব্রহ্মের কথাই পাওয়া যায়। ব্রহ্মই সত্য বস্তু; তাহা হইতেই জগতের ও বেদাদি শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে; ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিতে গিয়া বেদান্ত-বিরোধী সমস্ত দর্শনের সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত তাহা বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে। সাংখ্যের প্রকৃতি-বাদ, ন্যায় বৈশেষিকের পরমাণু-বাদ, বৌদ্ধদের ক্ষণিকত্ব-বাদ ও শূন্য-বাদ, ইত্যাদি সমস্ত মতান্তর খণ্ডনের চেষ্টা বেদান্ত করিয়াছে; এমন কি, পূর্ব মীমাংসার কোনো কোনো সিদ্ধান্তের উপরও কটাক্ষপাত করা হইয়াছে।

আস্তিক দর্শন

জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়—মানুষের ইন্দ্রিয়াদির পর পর আবির্ভাব, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পঞ্চভূতের উৎপত্তি, ইত্যাদিও বেদান্ত বিচার করিয়া দেখাইয়াছে যে ব্রহ্মই মূল কারণ। প্রলয়ান্তে জগৎ যে আবার ব্রহ্মেই লীন হয়, ইহাও বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়।

আত্মার দেহে আবির্ভাব, মৃত্যুর পর দেহান্তর প্রাপ্তি এবং মুক্তি তো বেদান্তের বড়ো কথা। এই মুক্তির দিকে ধাপে ধাপে কিভাবে আত্মা অগ্রসর হয়, পথ-ভ্রষ্ট হইয়া কিভাবে আবার দেহান্তর গ্রহণ করে, ইত্যাদিও বেদান্তকে ভাবিতে হইয়াছে। এই সমস্তই বেদান্তের সাধারণ কথা। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য ছোটো বড়ো যে সব প্রশ্ন উঠিয়াছে, যেমন বেদান্তে অধিকারী কে—সে সকলের বিচারও বেদান্ত করিয়াছে।

কিন্তু এই সকল বিবিধ প্রশ্ন ও উত্তরের উপরে রহিয়াছে ব্রহ্ম-বাদ। এই ব্রহ্ম আমরা জানি সমস্ত শাস্ত্র সমন্বিত করিয়া। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো বৈদান্তিকই শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদি সমস্তের সমন্বয়ের চেষ্টা করেন নাই। অনেকে—যেমন শঙ্কর—শুধু বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদেই দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন; কেহ কেহ—যেমন রামানুজ—পুরাণাদির সাহায্যও প্রয়োজনমতো গ্রহণ করিয়াছেন। এইখানে দুইটি কথঞ্চিৎ পরস্পর-বিরোধী মতের উল্লেখ প্রয়োজন। এক শ্রেণীর দার্শনিক ও শাস্ত্রবিদ্ মনে করিতেন যে, শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ দেখা গেলে শ্রুতিকেই গ্রহণ করিতে হইবে, স্মৃতিকে প্রয়োজন হইলে অগ্রাহ্যও করা চলিবে। আর-একটা মত এই যে, 'ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ'—ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদকে পুষ্ট করিয়া লইবে—শুধু বেদের সাহায্যে বেদের অর্থ প্রতীতি হয় না, 'বিভেত্যল্প-শ্রুতাৎ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি'—শুধু অল্প মাত্র শ্রুতি যে পড়িয়াছে, বেদ তাহাকে ভয় পায় এবং বলে 'এই ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে'—অর্থাৎ অর্থ বিকৃত করিয়া

ফেলিবে। রামানুজ প্রভৃতি কোনো কোনো ভাষ্যকার এই উক্তি অনুসারে বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি হইতে বেদান্ত ব্যাখ্যার যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। আরও পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞান-ভিক্ষু প্রভৃতিও পুরাণ ইত্যাদি হইতে সাহায্য লইয়াছেন। বাংলার চৈতন্য-মতাবলম্বী বৈদান্তিক জীব-গোস্বামী, রাধাদামোদর, বলদেব প্রভৃতি প্রায় একনিষ্ঠ ভাবে ভাগবতের উপর নির্ভর করিয়াছেন। অন্য পুরাণকে তাঁহারা আমল দেন নাই।

কিন্তু সূত্রকারের অনতি-গূঢ় অভিপ্রায় উপনিষদের সমন্বয় হইতেই ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা করা। 'তৎতু সমন্বযাৎ' এই সূত্রে সমন্বয়ের কথা তুলিয়া তিনি সত্যসত্যই বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, গণেশপুরাণ, মহানির্বাণ-তন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত গৃহীত শাস্ত্র-গ্রন্থের কথা ভাবেন নাই। সরলভাবে স্বীকার করা ভালো, এরূপ সমন্বয অসম্ভব। তান্ত্রিকের তন্ত্র আব বৈষ্ণবের ভাগবত আর মুণ্ডক বা কেন উপনিষদ—এসকলের সত্যসত্যই সমন্বয় হয় না। যদি সকল শাস্ত্রের এবং সকল মতের সমন্বয় সম্ভব হইত, তাহা হইলে সাংখ্য, ন্যায় প্রভৃতির সঙ্গে বেদান্তের বিরোধ কেন? এই বিরোধ তো মোটেই অস্পষ্ট নয়। সুতরাং সূত্রকারের অভীপ্সিত সমন্বগ শুধু উপনিষদ-গুলির সমন্বয়, এই অর্থ যাঁহারা করিযাছেন (যথা শঙ্কর), তাঁহারা ভুল করিয়াছেন, এমন মনে করার পক্ষে কোনো যুক্তি নাই।

উপনিষদের এই সমন্বয় করা হইয়াছে সাধারণত দুই প্রকারে; প্রথমত, আপাতত-পরস্পর-বিরোধী বাক্যসকলের একার্থতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। যেমন কোথাও আছে, 'অসৎ-ই আদিতে ছিল, তাহা হইতে সতের উদ্ভব হইয়াছে'—(তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২।৭; ছান্দোগ্য ৩।১৯); আবার, কোথাও আছে, সৎই আদিতে ছিল, কারণ অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইতে পারে না (ছান্দোগ্য, ৬।২)। এই দুইটি উক্তি আপাতত

এক নয়। সমন্বয় করা হইয়াছে; অসৎ অর্থ সতের অভাব নয়, নাম ও রূপ দ্বারা অব্যাকৃত সৎ—অসমাপ্ত সৎ এইরূপ অর্থ করিয়া। দ্বিতীয়ত, অনেক স্থলে এমন সব শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহাদের একাধিক অর্থ হয়; সেই সকল ক্ষেত্রে যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, তাহারা এক অর্থই বুঝায় এবং সে অর্থ ব্রহ্ম। যেমন অনেক জায়গায় 'আকাশ' 'প্রাণ, 'জ্যোতিঃ' প্রভৃতি শব্দ উপনিষদে আছে কিন্তু সেখানে উহারা তাহাদের প্রসিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছে; এই সিদ্ধান্ত সূত্রকার করিয়াছেন (সূত্র—১।১।২৩-২৫, প্রভৃতি)। কোন্ উপনিষদের কোন্ জায়গার প্রতি লক্ষ্য করা হইতেছে তাহা সূত্রকার বলেন নাই; কিন্তু ভাষ্যকারেরা একমত হইয়া সেই সকল আকর নির্দেশ করিয়াছেন। সূত্ররচনার পর হইতে পঠন পাঠনের পরম্পরা রক্ষিত হওয়ায় এই সব আকর গ্রন্থের নির্দেশ করা ভাষ্যকারদের পক্ষে কঠিন হয় নাই এবং কোনো মতানৈক্যও দেখা দেয় নাই। এইভাবে উপনিষদ বাক্য সকলের সমন্বয় দ্বারা ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হইয়াছিল।

সব জায়গায়-ই এই প্রকার সমন্বয় সম্ভব হইয়াছে, এমন নয়। আর, প্রয়োজন হইলে সূত্রকার সাহস করিয়া দুই-এক স্থানে অতি মৃদুভাবে উপনিষদ হইতে ভিন্ন মতও আশ্রয় করিয়াছেন। যেমন উপনিষদে (ছান্দোগ্য ৫।১০, বৃহদারণ্যক ৬।২) আত্মার 'দেবযান ও 'পিতৃযান' নামক দুইটি পৃথক্ গতি স্বীকৃত হইয়াছে। গীতাতেও (৮।২৩ ইত্যাদি) উহাদের স্বীকৃতি রহিয়াছে। গীতা এই গতি দুইটির যথাক্রমে 'শুক্ল' ও কৃষ্ণ' নামও দিয়াছেন। উপনিষদের বাক্যগুলির অর্থ যে খুব স্পষ্ট তাহা নয়; তবে, সাধারণভাবে এই অর্থ হয় যে, দিনে, শুক্লপক্ষে এবং উত্তরায়ণে মরিলে আত্মার শুক্ল গতি লাভ হয়; আর, রাত্রে, কৃষ্ণপক্ষে, ও দক্ষিণায়নে মরিলে আত্মা পিতৃযান বা কৃষ্ণ গতিতে প্রয়াণ করিয়া

আবার আসিয়া এই পৃথিবীতে জন্ম লয়। কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মদেব উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় শর-শয্যায় শুইয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ। উপনিষদ্ অধিকন্তু বলিয়াছেন যে, অরণ্যে তপস্যা করিলে দেবযানের পথিক আর গ্রামে থাকিয়া ইষ্টাপূর্ত ইত্যাদি সৎকার্য করিলে পিতৃযানের পথিক হইতে হয়। কিন্তু দক্ষিণায়নেও দিনে এবং শুক্লপক্ষে মরা যায, আর, উত্তরায়ণেও রাত্রি এবং কৃষ্ণপক্ষ আছে। দিন, শুক্লপক্ষ, এবং উত্তরায়ণ ইত্যাদি সব মিলাইযা মরা একটু কঠিন নয় কি? উত্তরাযণে কৃষ্ণপক্ষে কিংবা শুক্লপক্ষে রাত্রে মরিলে কী হইবে? ব্রহ্ম জানিয়াও কি কেহ রাত্রে কিংবা কৃষ্ণপক্ষে মরিতে পারে না? তাহার গতি কী হইবে? সূত্রকার এই গেরো না খুলিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছেন; তাঁহার উত্তর, এই গতি-দ্বযের জ্ঞান থাকা ভালো। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীর দেহ-পাত হইযা গেলে আর এই সকল পথের বাধা থাকে না; তিনি রাত্রে কিংবা দক্ষিণায়নে মরিলেও ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবেন (বেদান্তসূত্র, ৪।২।১৮ ইত্যাদি)। উত্তরাযণ ইত্যাদির এই আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এই সব চিন্তিত হইয়াছিল উত্তরভারতে এবং পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে; দক্ষিণ গোলার্ধের সংবাদ বেদান্তকার ও বৈদান্তিকদের অজ্ঞাত ছিল; তাহা না হইলে সিদ্ধান্ত হয়তো অন্যরূপ হইত। দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তরায়ণে সূর্য কাছে আসে মনে হয় না, দূরে মনে হয়।

দেবযান ইত্যাদি সম্বন্ধে সূত্রকারের মত উপনিষদের অর্থ হইতে ভিন্ন না বলিযা শেষ পর্যন্ত উহাকে ব্যাখ্যাও বলা চলে; এবং তাহা হইলে সমন্বিত উপনিষদগুলির নির্গলিত অর্থই সূত্রে প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, উপনিষদগুলির সকলগুলিই সমন্বিত করা কি সম্ভব?

আমরা এখন অনেক উপনিষদের নাম পাই এবং এক শতের উপর

উপনিষদ্ ছাপাও হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সকলেই ব্রহ্মের কথা বলে নাই। কোথাও যোগ, কোথাও রুদ্রাক্ষ, কোথাও বা সূর্য-উপাসনা, ইত্যাদি এত বিবিধ ও বিচিত্র বিষয় উপনিষদ্-নামধারী বইগুলির মধ্যে ঢুকিয়া রহিয়াছে, যে, ইহাদের সকলের সমন্বয়ের কথা চিন্তা করাও কষ্টকর। সুতরাং কোন্ কোন্ উপনিষদ্‌কে আশ্রয় করিয়া বেদান্ত-সূত্র রচিত হইয়াছে, এই প্রশ্ন উঠে। কিন্তু প্রশ্ন যত সহজ, উত্তর তত সহজ নয়। সূত্রকার নিজে উপনিষদ্‌গুলির নাম কোথাও করেন নাই, ভাষ্য-কারেরাও কেহই কোন্ কোন্ উপনিষদ্ বেদান্তের ভিত্তি, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। এইক্ষেত্রে মীমাংসার একমাত্র উপায়, ভাষ্যকারেরা প্রয়োজনমতো উপনিষদ্ হইতে যে-সব বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলি কোন্ কোন্ উপনিষদ্ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা নিরূপণ করা। বিশেষ করিয়া এই বিষয়ে শঙ্করের ভাষ্যকেই প্রাধান্য দিয়া বেদান্তের আশ্রয় উপনিষদ্‌গুলির একটা তালিকা অনেকে চিন্তা করিয়াছেন। শঙ্কর প্রাচীনতম উপনিষদ্‌গুলি হইতেই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন; যথা, ঈশ, কেন, মুণ্ডক, কঠ, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয় ইত্যাদি। ইহাদের প্রামাণ্য কেহ অস্বীকার করে নাই। পক্ষান্তরে, রুদ্রাক্ষ-জাবাল, কিংবা সূর্য কিংবা কৃষ্ণ উপনিষদ্‌কে প্রমাণ বলিয়াও কোনো বৈদান্তিক কখনও উদ্ধৃত করেন নাই। অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, কয়েকখানা প্রাচীন উপনিষদ্ই বেদান্তের মূল; তাহাদের সমন্বয়ের কথাই বেদান্তে চিন্তিত হইয়াছে।

কিন্তু বেদান্ত-চিন্তায় স্মৃতির কি কোনোই স্থান নাই? শ্রুতির উপরে কিংবা শ্রুতির বিরুদ্ধে স্মৃতির স্থান নাই, ইহা নিশ্চিত। তবে, সূত্রকার নিজে একাধিক সূত্রে (যথা, ১।২।৫, ১।৩।২৩, ইত্যাদি) স্মৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকারেরা সেই সব স্থানে গীতাকেই বুঝিয়াছেন। অন্য

কোনো স্মৃতি সূত্রকারের অভীপ্সিত ছিল, এরূপ মনে হয় না। পুরাণ তাঁহার মনঃপূত ছিল কিনা সন্দেহ; আর, পুরাণগুলি সূত্রের আগে না পরে রচিত, তাহাও তো একটা প্রশ্ন। কাজেই বিষ্ণুপুরাণ বা ভাগবত যে বেদান্ত ব্যাখ্যায় প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা একটু বক্র পন্থা অবলম্বন করিয়া নয় কি?

উপনিষদ্ যাহার প্রধান উপজীব্য, তাহার পক্ষে প্রধান প্রমাণ শ্রুতি বা শব্দ, ইহা বলাই বাহুল্য। অনুমান, ইত্যাদি বেদান্তে অস্বীকৃত নহে, কিন্তু পারমার্থিক বিচারে শ্রুতিই প্রধান অবলম্বন; শুধু তর্কে যে মীমাংসা হয় না,—কেননা, তার্কিক অপেক্ষাও বড়ো তার্কিক থাকিতে পারে—ইহা সূত্রকার স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন (২।১।১১)।

আর প্রমেয় যে ব্রহ্ম, এবং ব্রহ্ম যে একমাত্র পরমার্থিক সত্য, এ সম্বন্ধেও কোনো মতভেদ বৈদান্তিকদের মধ্যে নাই। কিন্তু জীব ও জগতের সত্যতা সম্বন্ধে বেদান্তের—সূত্রকারের—মত কী, তাহা লইয়া ভাষ্যকারদের সকলে একমত হইতে পারেন নাই। উপনিষদ্-বাক্যগুলির মধ্যেও মত-পার্থক্য নাই, ইহা আধুনিকদের পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব নহে। আবার কোনো কোনো বাক্যের অস্পষ্টতা হইতে একাধিক অর্থ করাও সম্ভব। সূত্রের বেলায়ও একাধিক অর্থ কোনো কোনো স্থানে সম্ভব; এবং এই সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়াই বৈদান্তিকেরা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইতে পারিয়াছেন। কিন্তু শ্রুতি-প্রমাণ ও ব্রহ্ম-প্রমেয় বেদান্তের সাধারণ স্বীকৃতি। এখানে কোনো মতভেদ প্রবেশ করিতে পারে নাই। মতভেদ যাহা ঘটিয়াছে তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ লইয়া এবং ব্রহ্ম আর জীব ও জগতের সম্বন্ধ লইয়া।

আস্তিক দর্শন

শঙ্কর—বেদান্ত

আচার্য শঙ্কর দক্ষিণ ভারতের কেরলদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার আবির্ভাব-কাল লইয়া তর্ক আছে। সাহসী কেহ কেহ তাঁহাকে খৃস্টের পূর্ববর্তীও মনে করিয়াছেন। কিন্তু অনেক যুক্তি-তর্কের পর তাঁহার আবির্ভাবের সময় ৭৮৮ এবং মৃত্যু ৮২০ খৃস্টাব্দ বলিয়াই সাধারণত গৃহীত হইয়া থাকে। শঙ্কর বত্রিশ বৎসর মাত্র পৃথিবীতে ছিলেন, ইহা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। আয়ু তাঁহার দীর্ঘই হউক আর হ্রস্বই হউক, বিদ্যা বিচারশক্তি এবং প্রচারকার্যের জন্য তাঁহার যশ অনতিক্রমণীয়।

শঙ্করের পূর্ববর্তী বৈদান্তিকদের মধ্যে গৌড়পাদ খুব প্রসিদ্ধ। তাঁহার 'কারিকা' শঙ্করের মতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ইহাও স্বীকৃত। কিন্তু শঙ্করের পূর্বে ও পরে কোনো বৈদান্তিকই যশে এবং প্রভাবে তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতের নাম 'অদ্বৈতবাদ'। এই মত তিনি এত স্পষ্ট ও নির্ভীকভাবে প্রচার করেন এবং এত দূরে এবং এত রকমে প্রচার করেন যে, তাহার পর হইতেই প্রকৃতপক্ষে বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব আরম্ভ হয়। সূত্র রচনার কাল যদি আমরা ৪০০ খৃস্টাব্দও ধরি তাহা হইলেও শঙ্করের আবির্ভাবের পূর্বে ৪০০ বৎসর বেদান্ত-সূত্রের পঠন-পাঠন হইয়া আসিতেছিল, ধরা যায়। কিন্তু সূত্র রচনার কাল আরো আগে হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। তাহা হইলে শঙ্করের জন্মের হাজার বৎসর আগে হইতেও বেদান্তসূত্রের আলোচনা হইয়া থাকিতে পারে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে সূত্রের ভাষ্য-বৃত্তি আরো নিশ্চয়ই হইয়া থাকিবে। অন্তত দুই জনের নামও আমরা পাই—বোধায়ন ও উপবর্ষ। কিন্তু শঙ্করের প্রতিভা ও প্রচার সেই সকলকেই প্রায় নিষ্প্রভ করিয়া দেয়— এবং অনেকে বিস্মৃতও হইয়া যান।

বেদান্তসূত্রের ভাষ্য শঙ্করের প্রধান গ্রন্থ। তাহা ছাড়া গীতা ও কয়েকখানা উপনিষদেরও তিনি ভাষ্য লিখিয়াছেন। অধিকন্তু 'মোহ-মুদ্গর' প্রভৃতি কয়েকটি জনপ্রিয় মুমুক্ষু-ভাবান্বিত কবিতারও তিনি রচয়িতা। ইহার উপরে আরো কয়েকটি কবিতা ও স্তোত্র ইত্যাদি কিম্বদন্তী তাঁহার নামের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। অন্যান্য অনেক জায়গার মতো এখানেও কিম্বদন্তীর সত্যতা নিরূপণ করা কঠিন। এ সকলের কতকগুলি তাঁহার রচিত হওয়া খুবই সম্ভব, আবার সবগুলি যে নয়, ইহাও সত্য।

শঙ্করের অদ্বৈত দর্শনের নামান্তর 'মায়াবাদ'। ব্রহ্মই একমাত্র এবং অদ্বিতীয় সত্য, জগৎ ও জীব মিথ্যা—অধ্যাস মাত্র; মায়াজনিত অলীক ধারণা মাত্র। সাধারণ জীবনে লোকে জীব ও জগৎ বিশ্বাস করে, কিন্তু ইহারা পারমার্থিক সত্য নয়; স্বপ্নের মতো অলীক। শঙ্কর-দর্শনের ইহাই মূলকথা।

কথাটা বলা যত সহজ প্রমাণ করা এবং লোককে বিশ্বাস করানো তত সহজ নয়। পায়ের নীচে মাটি, মাথার উপরে আকাশ, চারি দিকে গৃহ বন উপবন ইত্যাদি সমস্তই মিথ্যা; আমি যে দর্শনের চিন্তা করিতেছি এবং আমার পাঠক হইতে নিজেকে পৃথক্ মনে করিতেছি, ইহাও ভুল; একমাত্র ব্রহ্মই সত্য; বলা মাত্রেই কি কেহ ইহা মানিবে? মানিবে না ঠিক। মানাইবার জন্য শঙ্কর প্রমাণ দিয়াছেন—অনুমান, উপমান কিংবা আর-কোনো প্রমাণ তেমন নয়,-শুধু শব্দের—উপনিষদ বাক্যের প্রমাণ। উপনিষদে ব্রহ্মকে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলা হইয়াছে—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এরূপ কথাও বলা হইয়াছে। এই সব বাক্যের উপরই অদ্বৈতবাদ প্রধানত প্রতিষ্ঠিত। তবে, এই বাক্য-সকলের পুষ্টির জন্য অন্য যুক্তি যে ব্যবহৃত না হইয়াছে, এমন নয়। ব্যক্তি

হইতে জাতির জ্ঞানে মন উন্নীত হয়— ইহা আমরা জানি। একজন মানুষ মরিয়া গেলে মানবজাতি ধ্বংস হয় না, প্রত্যেক ব্যক্তিই অচিরস্থায়ী এবং এক সময় থাকিবে না; সেই হিসাবে প্রত্যেকেই অসত্য; কিন্তু মানব-জাতিটি সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। উহার সত্যতা বেশী। এই ভাবে বৃহত্তর জাতিতে মন উন্নীত হইলে ছোটো ছোটো জাতিগুলিও জাতির তুলনায় ব্যক্তির মতো অচিরস্থায়ী এবং সেই পরিমাণে অসত্য প্রতীয়মান হইবে। এইভাবে সমস্ত ক্ষুদ্রতর সত্তার পরিসমাপ্তি হয় যে ব্রহ্মে তিনিই সনাতন সত্য, আর সব অনিত্য, কাল্পনিক এবং মায়া-প্রসূত এবং প্রকৃতপক্ষে অসত্য। "নদীরা সকলে বহিতে বহিতে যেমন সমুদ্রে লীন হয় এবং নিজেদের পৃথক্ নাম-রূপ হারাইয়া সমুদ্রই হইয়া যায়, চরাচর বিশ্বও তেমনই ব্রহ্মে নিজেদের পৃথক্ সত্তা হারাইয়া ফেলে।" ব্রহ্মকে যে জানে জগতের পদার্থসকলের পৃথক অস্তিত্ব আর তাহার কাছে সত্য বলিয়া মনে হয় না।

তবে যে একটা জগৎ-প্রতীতি আমাদের আছে, তাহার কারণ 'মায়া'। এই মায়া কী, তাহা লইয়া অনেক তর্ক হইয়াছে। ইহা যদি একটা সত্তা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম ছাড়া আরো একটা সত্য মানা হয়, ব্রহ্ম আর অ-দ্বিতীয় থাকেন না; আর, যদি উহা অসত্য হয় তাহা হইলেও অসুবিধা এই যে একটা অলীক বস্তু হইতে জগৎ প্রতীতি হয় বলিতে হয়— যাহা নাই তাহা একটা কিছু 'ঘটায়', এরূপ বলিতে হয়। যাহা নাই তাহা কিছু করিতে পারে না। বাধ্য হইয়া শঙ্করকে বলিতে হইয়াছে, মায়া সৎও নয়, অসৎও নয়, কাজেই অনির্বচনীয়;— 'সদসদনির্বচনীয়'— যাহাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এমন কিছু।

সমস্ত সত্তা তাহাদের পৃথকত্ব ও বিশিষ্টতা যে এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মে হারাইয়া ফেলে তাঁহার কী বৈশিষ্ট্য? কী কী গুণ দিয়া তাঁহাকে

চিনিতে হইবে? শঙ্করের উত্তর, তাঁহার কোনো গুণ নাই, কোনো বৈশিষ্ট্য নাই, তিনি নির্গুণ ও নির্বিশেষ। বৃক্ষকে আমরা লতা হইতে পৃথক্ করি বৃক্ষত্ব দ্বারা; ব্রহ্ম ছাড়া এমন তো কিছু নাই, যাহা হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করা যাইতে পারে; আর ব্রহ্মেরও এমন কোনো গুণ নাই যাহা দ্বারা তাঁহাকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক্ করা যায়। নানাত্ব অসত্য, সুতরাং বিশেষও অসত্য; যখন অনেক বস্তু স্বীকৃত হয়, তখনই একটি হইতে আর একটির বিশিষ্টতা ভাবা যায়; অনেকত্ব লোপ পাইলে বিশিষ্টতাও থাকে না। সুতরাং ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ। জানার পূর্ব পর্যন্ত তিনি জ্ঞাতা হইতে কতকটা পৃথক্ বটেন; কিন্তু 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'— ব্রহ্মকে যে জানে সে ব্রহ্মই হইয়া যায়; জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই উভয়ের পার্থক্য আর তখন থাকে না। 'তত্ত্বমসি'— 'তুমি সেই'— উপদেশ্য শ্রোতা আর উপদিষ্ট ব্রহ্ম এক; ইহাকেই উপনিষদের 'মহাবাক্য' বলা হয়।

চারি দিকের সমস্ত ক্ষুদ্র-বৃহৎ বস্তুর পৃথকত্ব বিস্মৃত হইয়া তাহাদের সাম্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে একটা সমদৃষ্টি মানুষের হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক গাছ-পালা, জীবজন্তুর প্রভেদ ভুলিয়া সমস্ত জগৎকে পরমাণু বা ইলেক্‌ট্রন প্রোটনের সমষ্টিরূপে ভাবিতে তো পারেন। তেমনই ব্রহ্মবিদ্ কুকুর হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সকলের মধ্যে একটা সাম্য দেখিতে পারেন। এই সাম্যদৃষ্টি অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশ পরম সাম্য ব্রহ্মে চিত্তকে উন্নীত করা অসম্ভব নয়। ইহাই ব্রহ্ম-জ্ঞান। এই জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই উভয়ের পার্থক্যও লোপ পাইয়া যায়; থাকে শুধু নির্বিশেষ, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-শূন্য জ্ঞান।

এই সিদ্ধান্ত পরিবেশন করিতে শঙ্করকে অনেক বাগ্মিতা প্রয়োগ করিতে হইয়াছে এবং ইহা প্রতিষ্ঠিত করিতে জটিল যুক্তি-ব্যূহও রচনা করিতে হইয়াছে। সে সকলের সার সংকলনের চেষ্টা এখানে অল্প

পরিসরের মধ্যে সম্ভবও নয়, প্রয়োজনও নাই। শঙ্কর-বেদান্ত বা অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে বাংলায় এবং ভারতের ও ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আমরা এই কয়েক ছত্র যখন লিখিতেছি তখনও আমাদের হাতের কাছে এক বাংলা ভাষায় রচিত বই ই চারিখানা রহিয়াছে। শঙ্কর-দর্শনের আলোচনা আর বিস্তৃত না করার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যুক্তি।

শঙ্কর-দিগ্বিজয়

আমরা খৃস্টীয় অষ্টম নবম শতাব্দীর কথা ভাবিতেছি। ভারতে তখন বহু স্থান তীর্থে পরিণত হইয়াছে এবং দার্শনিকবাদ ও বহু ধর্মমত প্রচলিত রহিযাছে। জগতের কোনো কোনো স্থান কাহারো কাহারো কাছে তীর্থ হয় কোনো বিশেষ কারণে; পৃথিবীর জন্ম হইতেই কোনো স্থান তীর্থ হইয়া আসে নাই। যীশুর জন্মস্থান ও লীলাস্থল খৃস্টানদের তীর্থ; মক্কা মুহম্মদের জন্মস্থান বলিযা মুসলমানদের তীর্থ। মদিনাও অনুরূপ কারণে তীর্থ। বুদ্ধের জন্মস্থান ও সমাধি-স্থান বৌদ্ধদের তীর্থ। হিন্দুদের প্রায় অসংখ্য তীর্থ রহিযাছে। এই সমস্তেরই তীর্থত্ব প্রাপ্তি একই রকম কারণে হইযাছে। সকল স্থানেরই তীর্থত্বলাভের কারণ আমরা এখন আবিষ্কার করিতে পারিব কিনা সন্দেহ, তবে তীর্থত্ব-লাভ আরম্ভের উদাহরণ দেওয়া যায়; গত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে কলিকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বর তীর্থ হইয়া উঠিল রামকৃষ্ণের লীলাস্থলী বলিয়া। কোন্ স্থান কাহাদের কাছে কেন তীর্থ হইয়াছে, সে বৃত্তান্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু শঙ্করের সময়ে ভারতে বহু স্থান তীর্থ-পদবী লাভ করিয়াছিল, এইটি আমাদের জানা দরকার।

আর সেই সময়ে ভারতে বহু ধর্মমত ও দর্শনও বিরাজ করিতেছিল।

এবং সুবিধামত বিবাদও করিতেছিল, ইহাও আমাদের জানা দরকার। এইসব ধর্ম ও দর্শনের উপদেষ্টারা অনেক সময় গৃহের প্রতি বীতরাগ হইয়া তীর্থে বাস করিতেন। সুতরাং তীর্থসকল পবিত্র স্থান এবং বিদ্যাস্থান উভয়ই হইযাছিল। জৈন ও বৌদ্ধের প্রভাবেও কতকটা এইরূপ ঘটিয়াছিল। শিক্ষা-গুরুরা অনেকে তীর্থবাসী ছিলেন। কিন্তু নগরও একেবারে বিদ্যাবর্জিত হয নাই ; বিশেষত মীমাংসকেরা গৃহী ছিলেন এবং অনেকেই নগরবাসীও ছিলেন। মাহিষ্মতী নামক নগরী একটি মীমাংসা-কেন্দ্র বলিযা প্রসিদ্ধ ছিল। এইখানে মণ্ডনমিশ্র নামক একজন ধনী মীমাংসক বাস করিতেন ; তাঁহার প্রাচীর দেওয়া বাড়ি ছিল, দাস-দাসী ছিল, এইসব বৃত্তান্ত আমরা পাই।

দেশের এইসব বিভিন্ন স্থানে শুধু যে বিশুদ্ধ ধর্মের ও দর্শনের উপদেষ্টারাই থাকিতেন, এমন নয় ; অনেক জাযগায় কাপালিক, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি তান্ত্রিকও থাকিতেন। বেদান্ত-বিরোধী দর্শনগুলির মত সূত্রকার নিজেই খণ্ডন করিয়াছিলেন ; সেখানে শঙ্করের নিজস্ব বিশেষ কিছু বলিবার ছিল না। কিন্তু কাপালিক ইত্যাদির আচার তো আর দর্শন নয় ; অথচ তাহাদের আচার ও মতও তো বেদান্ত-বিরোধী। সে সকলেব খণ্ডনেব চেষ্টা সূত্রে হয় নাই, কোনো সমালোচনাও সেখানে নাই। আর, মীমাংসার কর্মবাদের বিরুদ্ধেও সূত্রকারের মত খুব স্পষ্ট নয়। এই উভয় ক্ষেত্রেই শঙ্করের প্রচারের প্রযোজন ছিল।

শঙ্কর দিগ্বিজয়ে বাহির হইযা ভারতের সমস্ত প্রসিদ্ধ স্থান ভ্রমণ করেন এবং বিরুদ্ধ দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া মীমাংসক, কাপালিক, শৈব, শাক্ত প্রভৃতিকেও বিচারে পরাস্ত করিয়া অদ্বৈতমতে আনয়ন করেন। মাধবাচার্য, আনন্দগিরি প্রভৃতি যাঁহারা তাঁহার দিগ্বিজয়ের বিবরণ দিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে আমরা এই সংবাদ পাই।

এইসব দিগ্বিজয়ে যখন পণ্ডিতেরা বাহির হইতেন তখন অনেক শিষ্য ও ছাত্রও তাঁহাদের সঙ্গে যাইত। শঙ্করের পূর্বে ও পরেও আরো এইরূপ পণ্ডিতদের দিগ্বিজয় ঘটিয়াছিল; এবং সব সময়ই পণ্ডিতদের সঙ্গে বহু ছাত্র থাকিত, এইরূপ বিবরণ মহাভারতাদিতে পাওয়া যায়। দুর্বাসার সঙ্গে হাজার শিষ্য থাকিত, এরূপ বলা হইয়াছে। অতিশয়োক্তিটুকু বাদ দিলেও ছাত্রেরা যে সঙ্গে থাকিত, এই কথাটা সত্য থাকিয়া যায়। এখনো মোহন্তবাবা প্রভৃতিরা যখন ভ্রমণে বাহির হন, তখন একলা যান না। সঙ্গে লোকজন লইয়া চলার সুবিধা আছে, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। রাজাদের দিগ্বিজয়ে যেমন সেনা সঙ্গে থাকিত, তেমনই পণ্ডিতদের দিগ্বিজয়েও শিষ্যেরা সঙ্গে যাইত। বিচার সর্বদাই অহিংস হইত না; আক্রমণ ও আক্রমণ-রোধের জন্য রাজাদের সৈন্যের মতো পণ্ডিতদের শিষ্যের প্রয়োজন অনেক সময় হইয়া পড়িত। জনক রাজার সভায় (বৃহদারণ্যক তৃতীয় অধ্যায়) যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি যে-সব পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে শিষ্য ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য যখন নিজেকে ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিতে চাহিলেন, তখন তিনি শিষ্যকে জনকের দেওয়া গরুগুলি লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। তাহার পর অনেকের সঙ্গে তাঁহার বিচার-বিতণ্ডা হইয়াছিল। সকলের শেষে বিচার হয় শাকল্য নামক একজনের সঙ্গে। বিচারের শেষ দিক দিয়া যাজ্ঞবল্ক্য একটি প্রশ্ন করেন এবং বলেন যদি এই জিনিসটি তুমি না বলিতে পার, তবে মাথা তোমার খসিয়া পড়িবে— 'মূর্ধা তে বিপতিষ্যতি'। শাকল্য প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না, এবং ফলে মাথাও তাঁহার খসিয়া পড়িল— 'তস্য হ মূর্ধা বিপপাত' —অর্থাৎ শাকল্য মরিলেন। তাঁহারও শিষ্য সঙ্গে ছিল; ভগ্ন-হৃদয় শিষ্যেরা গুরুর হাড় কয়খানি লইয়া দেশে ফিরিতেছিল এবং পথে হাড়ের পুঁটুলিটিও চোরে লইয়া গিয়াছিল, এ সংবাদও

উপনিষদ্ আমাদিগকে দিয়াছে। কিন্তু শাকল্য মরিলেন কী প্রকারে? শুধু যাজ্ঞবল্ক্যের কথার চোটে, শুধু অভিসম্পাতে? অনুমান করিবার অধিকার হয়তো আমাদের আছে।

শঙ্করের দিগ্বিজয়ের মধ্যেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। এক উগ্র কাপালিক নাকি নরবলি দিয়া সিদ্ধিলাভের প্রতীক্ষায় ছিল এবং শঙ্করের মতো পবিত্র-দেহ ব্রাহ্মণকে পাইয়া তাঁহাকে বলি দিতে সংকল্প করিয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে শঙ্করের শিষ্যেরা কেহ কাছে ছিল না —নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিল। শঙ্করের শিরশ্ছেদ হইয়াই যাইত, কিন্তু হঠাৎ একজন শিষ্য সময়মতো আসিয়া উপস্থিত হয় এবং কাপালিককে হত্যা করিয়া শঙ্করকে রক্ষা করে।

এই সকল বৃত্তান্ত হইতে স্বতঃই মনে হয়, দিগ্বিজয়ের বিচার সব সময় অহিংস হইত না; কখনো কখনো ক্রোধ উদ্রিক্ত হইত; এবং ক্রোধ আমাদের বেলায় যেমন ঋষিদের বেলায়ও তেমনই অনেক সময় অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটাইয়া দিত। ইহা বলায় আমাদের পূর্ব-পুরুষদের প্রতি কোনো অশ্রদ্ধা দেখানো হইতেছে, এরূপ মনে করা অন্যায় হইবে। কুটুম্বিতার খাতিরে সত্য অসত্য হইয়া যায় না। আমাদের পূর্বপুরুষ বলিয়াই প্রাচীনেরা রাগ হইয়া কখনো কখনো কিছু অন্যায় করেন নাই, এমন নয়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে কৃষ্ণ তাঁহার পিসতুতো ভাই শিশুপালকে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন; ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে জানি; কিন্তু মানুষের কাজ হিসাবে ইহা প্রশংসনীয় অহিংসা কি? ক্ষত্রিয়েরা যে যখন-তখন এরূপ সরল বিচার করিতেন, তাহার কি প্রমাণ দেওয়া দরকার? রাজপুতদের ইতিহাসে পর্যন্ত এরূপ দৃষ্টান্ত মিলে। যাহা হউক, এই আলোচনা এখানে অবান্তর। আসল কথা এই যে, মত-প্রচার সর্বদা এবং সবত্রই অহিংসভাবে হইয়া যায়, ইহা ইতিহাস নয়।

জগতে ধর্ম প্রচারের ইতিহাসে রক্তপাতের কলঙ্ক রহিয়াছে। মত এবং বিরুদ্ধ মতের সংঘর্ষে যুক্তিই একমাত্র সত্য-নির্ধারক বিচারক, ইহা সম্পূর্ণ সত্য নয়। শঙ্করের অনুচরেরা কাপালিক মারিয়াছিল, তাহা শঙ্করের প্রশংসাকারীরাই স্বীকার করিয়াছেন। জৈন-বৌদ্ধদেব উপরেও শারীরিক বলপ্রয়োগ তাহারা কখনো কখনো করিয়াছে, ইহাও শুনা যায়।

আমাদের জ্ঞাতব্য এই যে, শিষ্যপরিবৃত হইয়াই শঙ্কর দিগ্বিজযে বাহির হইয়াছিলেন। আর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিরুদ্ধমতের লোকদিগকে স্বমত অর্থাৎ অদ্বৈত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাইয়াছিলেন। এরূপ মত প্রচারের জন্য দেশ পর্যটন ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যও করিয়াছিলেন, প্রথম শতাব্দীতে খৃস্ট করিযাছিলেন, সপ্তম শতাব্দীতে মুহম্মদ করিযাছিলেন, আর, খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধ ও মহাবীরও করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদের ছিল ধর্ম-মত; দার্শনিক মত প্রচারের জন্য দেশভ্রমণ শঙ্করের মতো এতটা আর কেহ করেন নাই বলিযাই মনে হয়। তাহার একটা কারণ ছিল। শুধু বিরুদ্ধ দার্শনিক মত খণ্ডনের জন্য দেশে দেশে ঘুরিয়া ফিরিবার প্রয়োজন ছিল না, তাহা তো প্রত্যেক দার্শনিকই নিজেদের বইয়েতেই করিয়াছেন। বেদ-বিরোধী দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বেদ-বিরোধী ধর্মের নিরাসও শঙ্করের একটা উদ্দেশ্য ছিল; এবং সেইজন্যই তিনি সেই সব ধর্মের কেন্দ্রে স-শিষ্য উপস্থিত হইতেন।

বেদান্তের জয়যাত্রা

শঙ্করের দিগ্বিজয়, বেদান্তের দিগ্বিজয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে বেদেরও দিগ্বিজয়। বেদ যে ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচরদের শাস্ত্র নয়, ইহা যে শুধু পশুবলির কথাই বলে না, বেদে যে উচ্চ নীতি ও ধর্ম আছে, মুক্তি

যে বেদের সাহায্যেও হইতে পারে, একথা তখন জৈন, বৌদ্ধ, কাপালিক প্রভৃতি সকলকেই শুনানো দরকার ছিল। দেশ ও সমাজ বেদ-বিরোধী মতে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। একদিকে কাপালিক আর একদিকে শূন্য-বাদী বৌদ্ধ, একদিকে চার্বাক-মত আর একদিকে স্বর্গকামী যজ্ঞকারী মীমাংসকদের মত—এই সব নানা অধর্ম ও অর্ধ-ধর্ম মিলিয়া সমাজের এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিল যে, তখন ব্রহ্মের কথা বলা প্রয়োজন ছিল; শুধু মনোনীত নির্দিষ্ট শিষ্যবৃন্দের মধ্যে, রহস্য-বিদ্যারূপে নয়, প্রকাশ্যে সর্বসাধারণের মধ্যে উপনিষদের বাণী—বুদ্ধ ও মহাবীরের বাণীর প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে উপস্থিত করা তখন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। যাঁহার শাসনে চন্দ্র-সূর্য যথাস্থানে রহিয়াছে, যাঁহাকে কেহ পরিপূর্ণ রূপে জানিতে পারে না অথচ যিনি সব জানেন, যিনি আকাশ-বাতাসেও আছেন এবং অন্তর্যামী রূপে মানুষের অন্তরেও বর্তমান, যিনি ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, যাঁহাকে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না, অথচ যিনি সত্য,—সকলের উপরে সত্য—সেই ব্রহ্মের কথা উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করা তখন সমাজে প্রযোজন ছিল। শঙ্কর তাহাই করিয়াছিলেন। শঙ্করের দিগ্বিজয় বেদান্তেরই দিগ্বিজয় হইয়াছিল। এই বিজয়ে বিরুদ্ধ দার্শনিক সকল মত পরাস্ত হইয়াছিল ঠিক, কিন্তু চিরকালের জন্য নয়; কারণ সেই সব দর্শন এখনো ভারতের বুক হইতে একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দর্শনের অপেক্ষা বেশী পরাজিত হইয়াছিল বেদবিরুদ্ধ আচার; বিশেষ করিয়া বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি তান্ত্রিকদের আচার। এইগুলি যে অনেক ক্ষেত্রে বীভৎস কদাচার ছিল, তাহা সমসাময়িক ঘটনার বর্ণনা হইতেই জানা যায়। এই সব বর্ণনা সব সত্য না হইতে পারে; কিন্তু কতক সত্য হইলেও সমাজে যে তখন যথেষ্ট কদাচার ঢুকিয়াছিল

—ধর্মের নামে যে অনেক দুর্নীতি অনুসৃত হইত—এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হইয়া পড়ে।

বেদান্তের এই অভিযান মীমাংসার কর্মবাদকেও বর্জন করে নাই। মণ্ডন মিশ্র নামক একজন বড়ো মীমাংসকের সঙ্গে শঙ্করের বিচারের বিবরণ মাধবাচার্য দিয়াছেন। এই বর্ণনায় অনেক অলৌকিক কাহিনী ঢুকিয়াছে; সুতরাং সবটা ঐতিহাসিক সত্য নয়; কিছু অতিরঞ্জন ও মিথ্যাভাষণ রহিয়াছে। কিন্তু যতটুকু ইহার ভিতর সত্য বলিয়া আমরা জানিতে পারি তাহা হইতেই প্রমাণ হইবে যে, মীমাংসার যাজ্ঞিক ধর্মের বিরুদ্ধেও সন্ন্যাসী শঙ্কর জ্ঞানদ্বারা ও ত্যাগদ্বারা মুক্তি-প্রাপ্তির কথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। শঙ্করের প্রচার-অভিযানের ফলে সমাজে চিন্তাশীল ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা কর্মের উপরে জ্ঞানের স্থান দিতে আর কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। শুধু যে তান্ত্রিক কদাচার নিন্দিত হইতেছিল তাহা নয়, বৈদিক কদাচারও ভৎ´সনা অতিক্রম করিতে পারে নাই। বেদের আচারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ চার্বাক প্রভৃতি দ্বারা আরব্ধ হইয়াছিল এবং যাহা তখনও ধূমায়মান বহ্নির মতো সমাজে বিদ্যমান ছিল, শঙ্কর উদাত্তস্বরে জ্ঞানের মহিমা ঘোষণা করিয়া সেই বহ্নিকে আবার প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলেন; এইখানে শঙ্করও বেদের এক অংশের অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। তবে তাঁহার বিদ্রোহ অনেক মার্জিত, অনেক সূক্ষ্ম এবং অনেক উচ্চ ধরনের ছিল।

মায়াবাদ ও শূন্যবাদ

কর্মের উপরে জ্ঞানের স্থান দিলে এবং উভয়ের সমন্বয় অস্বীকার করিলে প্রকারান্তরে কর্মের নিন্দাই করা হয়। শঙ্কর তাহা করিয়া-ছিলেন। কর্মকে তিনি এত অনাবশ্যক মনে করিতেন যে, আধ্যাত্মিক

জীবনের কোনো নিম্নস্তরেও তাহার স্থান দিতে তিনি চাহেন নাই; জ্ঞানের জন্য দেহ-মন পবিত্র করিতে ধর্মের বিহিত কর্ম সহায়তা করিতে পারে, এবং সেই দিক দিয়া একটা প্রয়োজন কর্মের আছে, তাহাও তিনি স্বীকার করেন নাই। বেদান্তের প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায়ই তাঁহার মত স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা'—অতঃপর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিতে হয়। এই প্রথম সূত্র। প্রশ্ন উঠিল 'অতঃ'—অতঃপর—অর্থ কী? কাহার পর? অনেকে বলিয়াছেন কর্মানুষ্ঠানের এবং কর্মজ্ঞানের পর; এই মত অনুসারে কর্মের একটা স্থান জীবনে থাকিয়া যায়। কিন্তু শঙ্করের তাহা অভিপ্রায় নয়। তাঁহার মতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মনে জাগিলে এবং শম-দমাদি অভ্যস্ত হইলেই ব্রহ্ম জানিতে চেষ্টা করা উচিত; তাহার জন্য অগ্নিহোত্রাদি কর্মানুষ্ঠানের কোনো প্রয়োজন নাই। এই মত গোঁড়া বৈদিকদের অনভিপ্রেত, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

তাহার পর, শঙ্করের মায়াবাদ ও বৌদ্ধদের শূন্যবাদের মধ্যেও সাদৃশ্য আছে। শূন্যবাদে সমস্তই শূন্য, স্থায়ী সত্তা কিছুই নাই; মায়াবাদেও এক ব্রহ্ম ছাড়া আর সবই কার্যত শূন্য; আর ব্রহ্মও নির্গুণ, অর্থাৎ এমন বস্তু যাহাকে কোনো বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করিলে ভুল হইবে; সুতরাং অনেকের মতে এই ব্রহ্মও শূন্য হইতে খুব বেশী দূরে নন। বাস্তবিক, কথাটা সত্য নয় হয়তো; কিন্তু শঙ্কর-বিরোধী অনেকেই তাহাই মনে করিয়াছেন। এইজন্য সমসাময়িক এবং পরবর্তী অনেকে শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া গালি দিয়াছেন।

বৌদ্ধ দর্শনে কোনো সত্য নাই; এ কথা নিরেট মূর্খ না হইলে কেহ বলিতে সাহস পাইবে না। বরং অন্য একাধিক দর্শন অপেক্ষা বৌদ্ধ দর্শনের স্থান উচ্চে। সুতরাং শঙ্কর যদি বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি কোনো

পক্ষপাত দেখাইয়াই থাকেন, তাহা হইলে দার্শনিক হিসাবে তিনি কোনো অপরাধ করেন নাই; ইহা আমরা বলিতে বাধ্য। তবে ইহা বেদ-বিরুদ্ধ মনোভাব তো বটেই। শঙ্কর এই মনোভাব হইতে একেবারে মুক্ত যে ছিলেন না, তাহা তাঁহার কর্মনিন্দা হইতেই বুঝা যায়।

নবম শতাব্দীর সমাজ

গৃহীত সময়পঞ্জী অনুসারে খৃস্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগেই শঙ্করের তিরোধান হয়। তাহার পূর্বে প্রসিদ্ধ মীমাংসক কুমারিল ও প্রভাকর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ের পূর্বে ও পরে বৌদ্ধ ধর্মকীর্তি, জৈন সমন্ত-ভদ্র, অকলঙ্ক, প্রভাচন্দ্র প্রভৃতিরও আবির্ভাব হয়। শঙ্কর যখন আসেন তখন জৈন ও বৌদ্ধ দার্শনিকদের সঙ্গে বৈদিক দার্শনিকদের কলহ তুমুল আকার ধারণ করিযাছিল। বৌদ্ধ ধর্ম তখন নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু দর্শন তখনও আপনার স্থান দখল করিয়াছিল। জৈনদের দর্শনও বেশ সবল ছিল। প্রভাকর ও কুমারিলের বিচার ও প্রচারের ফলে এই হইয়াছিল যে, বেদকে তখন আর 'জভরী-তুর্ফরী' অর্থাৎ অর্থহীন কিচির-মিচির বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব ছিল না। এই সময় শঙ্কর আসেন। তাঁহার প্রতিভা ছিল অসাধারণ। জ্ঞানের মহিমা তিনি যেভাবে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা কম। এই জ্ঞানের উৎস ছিল বেদ; সুতরাং বেদ আবার লোকসমাজে গৌরবের সহিত প্রতিষ্ঠিত হইল। বেদ-বিশ্বাসী দার্শনিক ও বাগ্মীদের বিরামহীন চেষ্টার ফলে বেদের এই প্রতিষ্ঠা ঘটিল।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেদের কর্ম ও বেদের জ্ঞানের মধ্যে জিগীষা জাগিয়া উঠিল। কর্মবাদী মীমাংসকরা বেদের ধর্মেরই জয় চাহিয়াছিলেন— দর্শনের নয়; গৃহে থাকিয়া সদাচারী হইয়া অগ্নিহোত্রাদি

আবার লোকে অনুসরণ করুক, এই ছিল তাঁহাদের কামনা; আর, কর্মদ্বারা স্বর্গাদি ভোগ্য লাভ হয়, এই ছিল তাহার প্রলোভন। 'পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়াৎ' (মুণ্ডক উপনিষৎ ১।২।১২)—কর্মদ্বারা স্বর্গলোক প্রভৃতি যাহা লাভ করা যায় তাহা পরীক্ষা করিযা, তাহার অস্থিরত্ব জানিয়া, ব্রাহ্মণ বা জ্ঞানী সেই সকলের লোভ পরিত্যাগ করিবে, ইহা মীমাংসকদের অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু শঙ্কর-বেদান্ত ঠিক তাহাই চাহিয়াছিল। বৈরাগ্য শুধু ঐহিক ভোগে নয—আমুষ্মিক ভোগেও হইতে পারে; সর্বপ্রকার ভোগে বিরতিই জ্ঞানের প্রথম সোপান; ইহলোকের ঐশ্বর্য আর ইন্দ্রের ঐশ্বর্যের মধ্যে—ইহলোকের কামিনীকাঞ্চন আর পরলোকের অনুরূপ জিনিসের মধ্যে—জ্ঞানীর নিকট প্রভেদ কিছুই নাই। জ্ঞানী সমস্ত কামনা, সমস্ত ভোগেচ্ছার উর্ধ্বে। এই আদর্শ বুদ্ধেরও ছিল। শঙ্কর ইহা পুনঃপ্রচার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

কর্ম ও জ্ঞানের দুই ধারার পাশাপাশি আর-একটি চিন্তা ও ধর্মের ধারা সমাজে প্রবাহিত হইতেছিল—সেটি ভক্তি। এই ভক্তি-ধর্মের বয়স কত, তাহা লইয়া মতভেদ আছে; এত জায়গায় মতভেদ আছে, এখানেই বা থাকিবে না কেন? কেহ যদি ইহাকে প্রাগ্-বৈদিক সভ্যতার দান বলেন, তাহাতেও যুক্তি-অযুক্তি দুইই সমান পাওয়া যাইবে। সে তর্কে মগ্ন হইয়া আমাদের কিছু লাভ নাই; অনেক জিনিসেরই আরম্ভ জানি না, ইহারও না হয় না-ই জানিলাম। তবে, একটা জিনিস স্পষ্ট। ভক্তির কথা গীতায় আছে এবং গীতা শঙ্করের অনেক আগে এবং বেদান্তসূত্রেরও আগে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং ভক্তিবাদ শঙ্করের সময় ভারতে বর্তমান ছিল এবং প্রবল ভাবেই বর্তমান ছিল, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আস্তিক দর্শন

যে সিদ্ধান্ত শঙ্কর প্রচার করিলেন এবং যাহা কিছুকাল সকলে মানিয়া লইল, তাহা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব। কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান বড়ো, এই কথাটাই খুব জোরে ঘোষিত হইল। কিন্তু ভক্তি? শঙ্করের চরম জ্ঞান যাহা তাহাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় অভিন্ন— সে এবং আমি এক (সোঽহং) —সে এবং তুমিও এক (তৎত্বম্ অসি) ; ইহা প্রকৃতপক্ষে শুধু জ্ঞান— আর কিছুই নয়। ইনিই ব্রহ্ম। কিন্তু ইঁহাকে কি ভক্তি করা যায়? কাহাকে ভক্তি এবং কে করিবে ভক্তি? পরা-অনুরক্তির নাম ভক্তি। ইহার জন্য দুই জন প্রয়োজন— ভক্তির পাত্র এবং ভক্ত। কিন্তু শঙ্করের পারিপার্শ্বিক সমাজে এই ভক্তির পাত্র কোথায়? জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বর নাই : তবে জিন এবং বুদ্ধকে ভক্তি ও পূজা করা চলিত এবং হইত। কিন্তু তাঁহারা তো বেদের বিরোধী সুতরাং বর্জনীয়। আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে সাংখ্য-যোগে ঈশ্বরের আর এমন কী গৌরব আছে? ন্যায়-বৈশেষিকে ঈশ্বর আছেন ঠিক, কিন্তু তিনি করুণাময় না শুধু জগতের কারুক তাহা স্পষ্ট নয়। ভক্তির স্রোত তখনও সমাজে ছিল; কিন্তু দার্শনিক কলহের ফলে ভক্তির উপযুক্ত পাত্র কোনো সর্বোচ্চ সত্তা স্পষ্টভাবে লোকের সম্মুখে উপস্থিত ছিল না। শুধু শূন্যের উপাসনা হয় না; উপাসনা করিতে হইলে উপাস্যকে রূপ দিতে হয়। নির্গুণ ব্রহ্মকে ভক্তি করা যায় না; ভক্তি করিতে হইলে তাঁহাকে দয়াময় কিংবা ঐ ধরনের কোনো বিশেষণে বিশেষিত করিতে হয়। শঙ্করের প্রচারে বেদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল— জ্ঞানের মহিমা কীর্তিত হইয়াছিল— কিন্তু ঐ একটা দিক্ ফাঁকা ছিল।

একেশ্বরবাদের আবির্ভাব

এই সময়ে জগতে আর-একটা বড়ো ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছিল; ইস্‌লাম ধর্ম তখন জগতে, বিশেষত ভারতের দিকে, ছড়াইয়া পড়িতেছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম দরজায় মুসলমানেরা তখন হানা দিতেছিল। সিন্ধুতে ও পাঞ্জাবে ক্রমশ রাজ্য প্রতিষ্ঠাও হইতেছিল। মন্দির ধ্বংস, সোনারুপা লুঠ যাহা ঘটিয়াছিল, সাধারণ ইতিহাস সে কথা জানে ও বলে। ছোটখাটো হিন্দুরাজাদের রাজ্যনাশের কথাও ইতিহাসে রহিয়াছে। তাহার পর, ১০ম শতাব্দী হইতে ক্রমশ মুসলমান-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে, ইহাও আমাদের জানা কথা। রাষ্ট্রের উপর এই সব আক্রমণের প্রতিক্রিয়া কী হইয়াছিল, তাহাও ইতিহাস বলিয়া থাকে। কিন্তু দেশের চিন্তার উপর এ সকলের কী প্রভাব ঘটিযাছিল, তাহা বলা হয় কদাচিৎ। একটা কথা আমরা সব সময় মনে রাখি না যে, মুসলমানেরা শুধু দেশ জয় ও ধন আহরণ করিতেই সৈন্যবল লইযা বাহির হইয়া পড়ে নাই। পরে অবশ্যই তাহারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রাজ্যলোভী হইয়া পড়ে এবং রাজ্যলাভে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিয়া যায়, কিন্তু প্রথম দিকে ধর্মপ্রচারও তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রবেশের একটা উদ্দেশ্য ছিল। ইস্‌লাম প্রচারপন্থী ধর্ম, ধর্মান্তরের লোককে নিজমতে দীক্ষিত করা তাহার একটা বড়ো কাজ; তাহার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে বলপ্রয়োগও করিয়াছে। সুতরাং ইসলাম যখন ভারতে প্রথম প্রবেশ করে, তখন প্রচারের আকাঙ্ক্ষা তাহার ছিল মনে করা অন্যায় হইবে না; পরে অবশ্য দিল্লীতে বাদশাহী পাইয়া বসিয়া গেল; কিন্তু দিল্লীতে বাদশাহী করিয়াও যে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা ইস্‌লাম বর্জন করে নাই, তাহার উদাহরণ ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব।

গোড়ার দিকে ধর্মবিস্তরণই ইসলামের বড়ো উদ্দেশ্য ছিল; ধন সম্পদ আহরণ আনুষঙ্গিকভাবে ঘটিয়া যাইত, এই পর্যন্ত। আমরা যে ইতিহাসের অপব্যাখ্যা করিতেছি না, তাহার একটা বড়ো প্রমাণ এই যে, সুলতান মাহমুদ— যিনি একাধিক বার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং অনেক মন্দির ধ্বংস ও লুঠ করিয়াছিলেন— তিনিও আল্‌বারুনির মতো পণ্ডিত লোক সঙ্গে লইতেন। আল্‌বারুনি এ দেশে আসিয়া হিন্দুর শাস্ত্র ও সাহিত্যবিজ্ঞান জানিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে যাহাদের সঙ্গে তিনি মিশিতেন তাহারা কি ইস্‌লামের কথা একটিও শুনিত না? যদিই বা ধরিয়া লই যে সুলতান মাহমুদ প্রভৃতির আগমন শুধু লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যেই ঘটিয়াছিল, তথাপি লুণ্ঠনের পরে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে ভাবের ও মতের আদানপ্রদান এবং উভয়ের আচার ও ধর্মের একটা তুলনা ও বিচার পরস্পরের মধ্যে ঘটিত, ইহা কি একেবারে কল্পনার অতীত? সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, মুসলমানদের ভারত-আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরা ইস্‌লামের একেশ্বরবাদের সহিত কমবেশী পরিচিত হইতেছিল।

ভাবের আদানপ্রদানে সাক্ষীসাবুদ উপস্থিত করা একটু কঠিন। কেহ বিলাত হইতে ঘুরিয়া আসিয়া কতখানি বিলাতী ভাব গ্রহণ করে, তাহা তাহার পরবর্তী আচরণ ইত্যাদি দেখিয়া অনুমান করিয়াই লইতে হয়; স্পষ্ট প্রমাণ কম ক্ষেত্রেই থাকে। দুইটি সভ্যতার সংস্পর্শ ঘটিলে কিছু আদান ও প্রদান ঘটেই; তবে, কতটুকু তাহা অনেক সময় ধরা যায় না। সেকেন্দরশাহের সময়ে যে গ্রীকরা ভারত জয় করিয়াছিল তাহার কি কোনো চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই? ভাষায় ও বিজ্ঞানে কি কিছুই দিয়া যায় নাই? সংস্কৃত জ্যোতিষের 'হোরা' গ্রীক ভাষা হইতে আসিয়াছে। 'যবনিকা' নামটি

'যবন' বা 'আইওনিয়ার' অধিবাসী অর্থাৎ গ্রীকদের সহিত সম্পর্ক দ্যোতনা করে। গ্রীকরাও ভারত হইতে কিছু লয় নাই, এমন নয়। প্ল্যাতোর কর্মবাদ ও পুনর্জন্মবাদ ভারতীয় বলিয়াই তো মনে হয়।

এইরূপ আদানপ্রদান বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে এত ঘটিয়াছে যে তাহার উল্লেখই যথেষ্ট, দৃষ্টান্ত দেওয়া বাহুল্য মাত্র। কাজেই গভীর বিশ্বাসী মুসলমানেরা বার বার ভারত আক্রমণ করিয়াও ইসলামের একেশ্বরবাদের কথা কাহাকেও বলে নাই, ইহা সম্ভব নয়। তবে এই নূতনলব্ধ জ্ঞান কোনো প্রকার প্রভাব ভারতীয় চিন্তায় দেখাইয়াছে কি না এবং কী ভাবে এবং কতটুকু—তাহা গবেষণার বিষয় হইতে পারে।

ইস্‌লামেরও আগে খৃস্টান ধর্ম ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। ইস্‌লাম আসে উত্তর-পশ্চিম দিক্ দিয়া, আর খৃস্টান ধর্ম অসিয়াছিল দক্ষিণ ভারতে। খৃস্টান ধর্ম ইস্‌লামের মতো এত প্রবল শক্তি লইয়া আসে নাই সত্য ; তবুও আসিয়াছিল এবং কথঞ্চিৎ স্থায়ী বসতিও করিয়া লইয়াছিল। খৃস্টের ধর্মও একেশ্বরবাদী ; খৃস্টধর্ম ও ইসলাম উভয়েই সেমেটিক জাতির দান এবং উভয়ের মধ্যে সাম্যও যথেষ্ট। মুহম্মদ নিজেকে শেষ নবী বলিলেও খৃস্টও যে পয়গম্বর তাহা স্বীকার করিয়াছেন। একেশ্বরবাদ খৃস্টধর্ম ও ইসলাম এই দুইরূপে বাহির হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, শঙ্করের অল্প-বিস্তর আগে ও পরে।

ইহার পূর্বে ভারতে একেশ্বরবাদের কোনো ছায়াও ছিল না, এমন কথা কেহ বলে না। ভক্তিধর্মে—বিশেষত বৈষ্ণব ধর্মে—বিষ্ণুকে এবং তাঁহার অবতার বিশেষকে একেশ্বর মনে করিয়া ভক্তি করার উপদেশ দেখা যায়। যাহাকে ভাগবত ধর্ম বলা হয়, তাহাও ঐ ধরনের। শৈব

প্রভৃতি সম্প্রদাযেব মধ্যে শিবকে একমাত্র দেবতা মনে কবার উপদেশ আছে। এ সমস্তই শঙ্কবের সময়ে অর্থাৎ খ্রীঃ নবম-দশম শতাব্দীতে ভারতে বর্তমান ছিল। সুতবাং বাহির হইতে একেশ্ববাদ যখন আসে তখন উহা একেবাবে অজ্ঞাতপূর্ব বস্তুরূপেই আসে নাই। কিন্তু বাহিব হইতে আসিযা উহা একেবাবে নিষ্ক্রিয ছিল, এরূপ মনে করাও কঠিন। উহাকে আলোই বলি, আব ছাযাই বলি, এ দেশে চিন্তায কিছু পবিবর্তন উহা আনযন কবিযাছিল বলিযাই মনে হয।

খৃস্টেব জীবনী ও কাহিনী আর কৃষ্ণেব জীবনী ও কাহিনীব মধ্যে সাদৃশ্য এত বেশী যে, উহা অনেক দিন পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিযাছে, এবং অনেকে এরূপও মনে কবিযাছেন যে, কৃষ্ণের জীবনেব অনেক কাহিনী খৃস্টেব জীবনী হইতে অনুকৃত হইযাছে, যাহাকে আমবা ভাগবত বা বৈষ্ণব ধর্ম বলি তাহা বহুল পবিমাণে খ্রীস্টান ধর্মেব প্রভাবে পুষ্টি লাভ কবিযাছে।

এক নদী আব-এক নদীর সঙ্গে মিশিযা গেলে পব উভযকে পৃথক কবা যায না, এবং পববর্তী স্রোতে কাহার দান কতটুকু ধবা যায না। এলাহাবাদের পরে গঙ্গাব স্রোতে যমুনা কতটুকু জল দিতেছে কেহ বলিতে পাবে? তেমনই দুইটি চিন্তাধাবা যখন মিশিযা যায তখন পববর্তী ধাবায কাহাব দান কতটুকু ধরা কঠিন। একেশ্ববাদ ভারতেও ছিল, বাহির হইতেও আসিযাছিল, উভযে মিলিযা ১০ম-১১শ শতাব্দীতে একটা পরিপুষ্ট আকারে দেখা দেয। ঋণীব ঋণ স্বীকার কবা ভালো। যে জানে যে এলাহাবাদে গঙ্গা যমুনাকে সঙ্গে লইযাছে সে কেন স্বীকাব কবিবে না যে কলিকাতাব গঙ্গায যমুনাব জলও কিছু আছে? বাহিব হইতে যে একেশ্ববাদ আসিযাছিল তাহা স্থানীয চিন্তার পুষ্টিতে সহাযতা কবিয়াছিল, ইহা মানিতে আপত্তি কী?

বেদান্ত ও ভক্তিধর্ম

যেমন করিয়াই হউক, শঙ্করের দুই তিন শত বৎসর পরে বেদান্ত দর্শনের সাহিত্যে এই একেশ্বরবাদের প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। শঙ্করের পক্ষে ব্রহ্মে জিজ্ঞাসার এবং জ্ঞানের পরিসমাপ্তি ঘটিতে পারে; কিন্তু আর্তের সান্ত্বনা কোথায়? বিপন্ন মানুষকে হইতে হয়; রোগ আছে, শোক আছে, এবং আরও কত রকম কষ্ট আছে। মানুষ এমন একজন চায় যাহার কাছে দুঃখ নিবেদন করা যায়। যাহার কাছে করুণা ও সান্ত্বনা যাচ্ঞা করা যায়। তিনি আর কে হইবেন? ভক্তবৎসল ভগবান! সুতরাং আর্ত মানুষের ব্যাকুল চিত্ত এরূপ ভগবান খুঁজে। ভক্তিশাস্ত্র এরূপ ভগবানের কথা বলে। ভিন্ন নামে অভিহিত, এমন কি ভিন্নরূপে কল্পিত হইলেও এক ভগবানের কথা সমগ্র ভক্তি-শাস্ত্রেই পাওয়া যায়। কিন্তু তখন বেদান্তের প্রভাব এত বেশী হইয়াছিল যে, কোনো ধর্ম জ্ঞানগরিমায় মণ্ডিত না হইয়া লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিত না। বিশেষত উপনিষদের উদাত্ত বাণী শঙ্কর এমন ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন যে, তাহার বাহিরে আর কোনো জ্ঞানের কথা অথবা বিশ্বসনীয় কিছু থাকিতে পারে, ইহা লোকে ভাবিতে পারিত না। সুতরাং আর্ত ও অর্থার্থী মানুষ ভক্তিশাস্ত্রে যে ভক্তবৎসল ভগবান খুঁজিতেছিল তাঁহাকে বেদান্তের ভিত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্য রামানুজ প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণব আচার্য বেদান্ত ও বেদান্তসূত্রের নূতন ব্যাখ্যা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, শঙ্করের ব্রহ্মকে নূতন রূপে রূপায়িত করিয়া তুলিলেন।

বৈষ্ণব বেদান্ত

ভারতের একেশ্বরবাদীদের মধ্যে বৈষ্ণবেরা প্রধান। বৈষ্ণবেরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন এবং এখনো রহিয়াছেন। এই প্রভেদ শুধু উপাসনা-পদ্ধতিতেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই; দর্শনেও প্রবেশ করিয়াছে। উপাসনায় এই প্রভেদ হইয়াছে প্রধানত বিষ্ণু ও কৃষ্ণ লইয়া, কেহ কেহ বিষ্ণুরূপেই ভগবানকে ডাকেন, আবার কেহ ডাকেন গোকুলের কৃষ্ণ রূপে। দর্শনে প্রভেদ রহিয়াছে একদিকে জীব ও জগৎ অপর দিকে ব্রহ্ম এই উভয়ের সম্বন্ধ লইয়া।

যে সমাজে যুক্তিতর্কের একবার প্রবেশ ঘটিয়াছে, সে সমাজে ধর্ম কখনো শুধু ভক্তির আশ্রয়েই থাকিতে পারে না; তাহাকে দর্শনেরও আশ্রয় লইতে হয়। সেইজন্য শঙ্করের পরে দেখা যায় ভাগবত বা বৈষ্ণব ধর্ম বেদান্তের ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ধর্মের একটা দার্শনিক ভিত্তির প্রয়োজন হইযাছিল; সকল দর্শনের উপরে বেদান্তের প্রতিষ্ঠা তখন বেশী; বেদ এই দর্শনের উপজীব্য; লোকে শ্রদ্ধার চক্ষে ইহাকে দেখে; সর্বোপরি, বেদান্তের ব্রহ্মকে সহজেই ভগবানে রূপান্তরিত করা সম্ভব ছিল। এই সব নানা কারণে দার্শনিক বৈষ্ণবেরা বৈদান্তিক হইতে চাহিলেন। খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী হইতে এই চেষ্টা প্রবলভাবে দেখা দিয়াছিল। বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একাধিক আচার্য বেদান্তসূত্রের ভাষ্য লিখিয়া নিজেদের সম্প্রদায়ের উপাসনাকে দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। উপাসনার কথা এখানে আমাদের প্রধান বিবেচ্য নহে; কিন্তু বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যায় যে বিভিন্ন দার্শনিক মত দেখা দেয় তাহা উপেক্ষা করা চলে না। ইহাদের নিজেদের মধ্যে প্রভেদ আছে সত্য; কিন্তু শঙ্করের মতের বিরুদ্ধে ইহারা একমত।

১. রামানুজ

এই বৈষ্ণব ভাষ্যকারদের মধ্যে রামানুজই প্রথম। শঙ্করের ন্যায় ইনিও দক্ষিণভারতের ব্রাহ্মণ এবং ১১শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। ইনি 'শ্রী' সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁহার বেদান্ত ভাষ্যের নাম 'শ্রীভাষ্য'। তাঁহার পূর্বেও ঐ সম্প্রদায়ে একাধিক আচার্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা হয়তো রামানুজের জন্য পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু রামানুজের যশ তাঁহাদিগকে পরবর্তীকালে নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিয়াছে।

শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্মই বৈষ্ণবদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। রামানুজও ইহাকে ভ্রান্ত দেখাইতে চাহিয়াছেন। জীব ও জগতের সত্যতা আর একটি বিবেচ্য প্রশ্ন; এখানেও বৈষ্ণবেরা শঙ্কর-বিরোধী, এবং রামানুজও তাহাই। রামানুজ-দর্শনের নাম 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'; এই নাম হইতেই তাঁহার দর্শনের মূল বক্তব্য বুঝা যায়। শঙ্করের অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মই কেবল সত্য, আর সব মায়া। রামানুজের মতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, ইহা ঠিক; কিন্তু তিনি নির্গুণ নহেন; বরং অশেষ কল্যাণ-গুণের আধার; অকল্যাণ তাঁহাতে নাই; ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি তাঁহার গুণ নয়; কিন্তু ভালো গুণ অসংখ্য তাঁহাতে রহিয়াছে। গুণদ্বারা তাঁহাকে বিশিষ্ট করা যায়; তিনি 'অদ্বৈত'— তাঁহাতে দ্বিতীয় কিছু নাই— কিন্তু বিশেষ আছে; সুতরাং তিনি বিশিষ্ট অদ্বৈত।

জীব ও জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক সত্তা নহে— তাঁহারই গুণ। পৃথিবীকে তাঁহার দেহও বলা যাইতে পারে, কারণ তাহাতেই তিনি প্রকাশ পাইয়াছেন। জীবও তাহাই। সেখানেও তিনি ব্যক্ত। জীব ও জগৎ মিথ্যাও নয়, স্বতন্ত্র সত্তাও নয়। বাঁশির ভিন্ন ভিন্ন রন্ধ্রে ফুঁ দিলে

বিভিন্ন আওয়াজ বাহির হয়, কিন্তু বাঁশি তো একটিই। সকল জীবাত্মাই পরমাত্মা বা ব্রহ্ম কিন্তু বাঁশির বিভিন্ন রন্ধ্রের মতো পৃথক্। আর জীব-জগৎ সমস্ত মিলিয়া ব্রহ্মকে বিশেষিত করিতেছে। সূর্যের কিরণ সূর্য নয়, সূর্য হইতে পৃথকও কিছু নয়, অগ্নির উত্তাপ অগ্নি নয়, কিন্তু অগ্নি হইতে পৃথকও কিছু নয়। কিরণ এবং উত্তাপ সূর্য ও অগ্নির যেমন গুণ, জীব ও জগৎও তেমনই ব্রহ্মের গুণ। একই ব্রহ্ম, এই সকল গুণদ্বারা বিশিষ্ট।

এই ব্রহ্মই বিষ্ণু। বিষ্ণুপুরাণ হইতে বহুবাক্য উদ্ধৃত করিয়া রামানুজ উভয়ের ঐক্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি অশেষ করুণাময়, ভক্তবৎসল এবং ভগবানে মানুষ যাহা দেখিতে চায় সে সমস্তের আধার। এইভাবে রামানুজের হাতে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ কতকটা পরিবর্তিত হইয়া যায়, কিন্তু একেবারে বিধ্বস্ত হয় নাই। শঙ্করের সঙ্গে রামানুজের আরও দুই-একটি বিষয়ে স্পষ্ট প্রভেদ আছে ; জ্ঞানের স্বরূপ, কর্মের স্থান এবং মুক্তির উপায় সম্বন্ধে উভয়ে একমত নহেন। শঙ্কর যে উচ্চ জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন যাহাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের প্রভেদ লুপ্ত হইয়া যায়, রামানুজ তাহা অকল্পনীয় মনে করিয়াছেন ; এবং এইরূপে জ্ঞাতা ব্রহ্মের জ্ঞেয় পদার্থরূপেও তিনি জীব ও জগতের সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম যখন খুশি ত্যাগ করা যায়, ইহাও রামানুজ মানিতে চাহেন নাই। আর, শুধু জ্ঞানদ্বারা মুক্তি হয় না ; জ্ঞানের পরিসমাপ্তি ভক্তিতে ; এবং তাহাই মুক্তির প্রকৃত উপায়।

২. নিম্বার্ক

রামানুজের পরে ১১শ-১২শ শতাব্দীতে নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য নামে একজন তেলেগু ব্রাহ্মণ বেদান্তের ভাষ্য লিখিয়াছেন। তিনিও বৈষ্ণব ছিলেন এবং ভক্তিধর্মে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তিনি ভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার মতেও বেদান্তের ব্রহ্ম আর ভক্তদের বিষ্ণু অভিন্ন। ব্রহ্ম প্রাণবান, দয়াবান, মানবের সুখদুঃখের সহায় ও ত্রাতা। কিন্তু পারমার্থিক পদার্থ সম্বন্ধে তাঁহার মত রামানুজ হইতে ভিন্ন। ব্রহ্ম তো সত্যই, এ সম্বন্ধে কোনো বৈদান্তিকের মনে প্রশ্ন বা সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু জীব ও জগৎকে রামানুজ ব্রহ্মের গুণ—সূর্যের কিরণ বা অগ্নির উত্তাপের মতো অপৃথক গুণ মনে করিয়াছেন। নিম্বার্ক তাহা চাহেন নাই। নিম্বার্কের মতে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাতিরিক্ত জীব-জগতের মধ্যে সম্বন্ধ অংশী ও অংশের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ সেইরূপ। শাখা বৃক্ষ হইতে ভিন্ন কিন্তু তথাপি উহা বৃক্ষেরই শাখা— বৃক্ষ হইতে কোনো পৃথক অস্তিত্ব উহার নাই; বৃক্ষত্ব শাখাতে আছে; কিন্তু শাখাত্ব বৃক্ষে নাই। সুতরাং উভয়ে এক হিসাবে ভিন্ন আবার অন্য দিক দিয়া দেখিলে অভিন্ন। সোনা ও সোনার আংটি এই সম্বন্ধের আর-একটি উপমা হইতে পারে। ইহাদের ভেদের মধ্যেও একটা অভেদ রহিয়াছে। জীব-জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যেও ঠিক সেই সম্বন্ধ; উহারা উভয়ে ভিন্নও বটে, আবার অভিন্নও বটে। জীব ও জগতের পৃথক অস্তিত্ব আছে; সুতরাং এক দিকে ব্রহ্ম অপর দিকে ব্রহ্মাতিরিক্ত আর-একটা সত্তা রহিয়াছে। আবার জীব-জগতের মূলীভূত কারণ ও উপাদান ব্রহ্ম; সুতরাং সে দিক দিয়া ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা। ইহাই নিম্বার্কের মত। এইজন্য এই মতকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অথবা ভেদাভেদ-বাদ বলা হয়।

৩. মধ্ব

খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীতে আর-একটি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব বেদান্তসূত্রের ভাষ্য লিখিয়া একটি তৃতীয় মত উপস্থাপিত করেন। ইহার নাম দ্বৈতবাদ। ইহা ব্রহ্ম তো স্বীকার করেই আবার জীব-জগৎকেও স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া মানে। দুইটি সত্য মানে বলিয়া ইহার নাম 'দ্বৈতবাদ' বা 'ভেদবাদ'। এই মত অনুসারে বেদান্তের ব্রহ্ম শুধু জ্ঞান মাত্র নহেন; তিনি জ্ঞানী; অধিকন্তু জীবের প্রতি তাঁহার করুণাও আছে। তিনি আর বিষ্ণু বা হরি অভিন্ন। তাঁহাকে ভক্তি করিয়াই জীব দুঃখমুক্ত হইতে পারে।

এই সব বৈষ্ণব ভাষ্যকারেরা বেদান্তের প্রধান বিচার্য বিষয়সকল সম্বন্ধে নূতন কথা বিশেষ কিছু বলেন নাই। ব্রহ্মের সত্যতা, বেদ ও উপনিষদের প্রামাণ্য, জগতের উৎপত্তি, জীবের গতি-মুক্তি ইত্যাদি যে সকল বিষয়ে সূত্রকার স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, সে সকল বিষয়ে নূতন মতের অবতারণা ভাষ্যকার করিতে পারেন না। ইহাদের প্রধান কাজ ছিল শঙ্করের অদ্বৈতবাদ যে সূত্রকারের অনভিপ্রেত তাহা দেখানো; আর মানবের আর্ত মনকে উদ্বোধিত করিয়া তাহার সান্ত্বনার জন্য সূক্ষ্মভাবে ব্রহ্মকে করুণার আধার বিষ্ণু বা হরির সহিত অভিন্ন প্রতিপন্ন করা। এই ভাবে ব্রহ্মকে ভক্তিদ্বারা ভজনীয় করিয়া তাঁহারা বেদান্তকে বৈষ্ণবশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন।

শঙ্করের মতের বিরুদ্ধে যে অভিযান চলে তাহাতে তিনটি স্তর সহজে চোখে পড়িবে। প্রথমত, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ 'বিশিষ্ট' করিয়া রামানুজ ইহাকে কতকটা পরিবর্তিত করেন। তারপর আর-এক শ্রেণীর বৈষ্ণব অদ্বৈতবাদের সঙ্গে দ্বৈতবাদ সংযুক্ত করিয়া দ্বৈত-অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা

করেন ; অদ্বৈতবাদ আরও পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া যায়। তৃতীয় স্তরে আর-এক শ্রেণীর বৈষ্ণব মধ্ব অদ্বৈতবাদ একেবারে বর্জন করিয়া দ্বৈতবাদ প্রচার করেন। অবশ্যই, এই সমস্তই সূত্র ব্যাখ্যার সাহায্যেই ঘটিয়াছে।

৪. বল্লভ

বৈষ্ণবের মধ্যে বেদান্তের ভাষ্য রচনা এইখানেই শেষ হয় নাই। খৃস্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে আরও এক সম্প্রদায়ের একজন বৈষ্ণব বেদান্ত ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার নাম বল্লভ। তাঁহার মতের নাম বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ। জীব জগৎ সবই সত্য ; কিছুই মায়া বা স্বপ্ন নয়। কিন্তু সবই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য ; আর কিছু সত্য নাই। অথচ জীবসকল এবং জগৎও সত্য। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যেমন জীব ও অজীব সহ সমস্ত জগৎকে পরমাণুর সমষ্টি ভাবিতে পারেন, বল্লভও তেমনই কিছুই অসত্য নয় ভাবিয়া সমস্তই ব্রহ্মময় ভাবিয়াছিলেন। তিনি শঙ্করের অদ্বৈতবাদ মানিয়াছেন কিন্তু মায়াবাদ মানেন নাই।

অনেকের কাছে এই মতটা একটু স্থূল মনে হইবে হয়তো। খুব সূক্ষ্ম বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল, এরূপ মনে না করিবার আরও যুক্তি আছে। বল্লভ রামানুজ প্রভৃতির মতো বিষ্ণুতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া বেদান্তের ব্রহ্মকে একেবারে গোকুলের কৃষ্ণের সঙ্গে এক মনে করিয়াছেন। ইহাতে ভক্তের তৃপ্তি হইতে পারে, কিন্তু বিচারে অভ্যস্ত দার্শনিকের চিত্ত অতৃপ্ত থাকিয়া যাইবে।

৫. বাংলার বৈষ্ণব দর্শন

বৈষ্ণবদের বেদান্ত-চর্চা এইখানেও শেষ হয় নাই; চৈতন্যের আবির্ভাব ও ধর্ম প্রচারের পর সেই ধর্মের পরিপূরকরূপে ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশে নব্য-ন্যায়ের পাশাপাশি বেদান্তের চর্চাও আরম্ভ হয়। জীব গোস্বামী 'ষট্‌সন্দর্ভ' নামক একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাহাতে অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্ম অপেক্ষা ভক্তের প্রিয় কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। কৃষ্ণই পুরুষোত্তম; সর্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য এবং ভক্তির পাত্র। জীব গোস্বামী ব্যতীত আরও কয়েকজন বাঙালী ও অবাঙালী গ্রন্থকার বাঙলায় বেদান্তের প্রচার করেন। ইঁহাদের মধ্যে 'উজ্জ্বল নীলমণি' -প্রণেতা রূপ গোস্বামী, 'বেদান্ত-স্যমন্তক'-প্রণেতা রাধা-দামোদর এবং বেদান্তসূত্রের 'গোবিন্দভাষ্য' এবং 'সিদ্ধান্তরত্ন' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা বলদেব বিদ্যাভূষণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। রাধা-দামোদর ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহা তাঁহার নিজের বইযেতেই বলা আছে। আর তিনি কান্য-কুব্জের ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বলদেবের গুরু ছিলেন ইহা বলদেব আমাদিগকে জানাইয়াছেন। রাধা-দামোদর যে চৈতন্য সম্প্রদাযের বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা আমরা তাঁহার গ্রন্থারম্ভে নমস্কৃতি হইতেই জানি। তবে, তিনি বাঙলায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন কিনা, সে বিষযে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নাই। বলদেব বৈশ্য-সন্তান এবং উড়িষ্যার অন্তর্গত বালেশ্বর জিলায় জন্মিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। চৈতন্যের অনুপ্রেরণায বাঙলায় যে বেদান্তমত পরিপুষ্ট ও প্রচারিত হয়, ইঁহারাই তাহার প্রধান আচার্য। ইঁহাদের মধ্যে সর্বশেষ বলদেব খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ (১৭৬৪) পর্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

মধ্বের প্রভাব এই মতের উপর যথেষ্ট রহিয়াছে। ইঁহারাও মধ্বের মতো ভেদবাদী। কিন্তু ইহার মধ্যে একটা অভেদবাদের ছায়াও আছে।

ভেদ এবং অভেদ উভয়ই সত্য মনে করিয়াছেন নিম্বার্ক। সেইজন্য নিম্বার্ক মতের কিছু আভাসও বাঙলার বেদান্তে পাওয়া যায়। ভেদ এবং অভেদ উভয়কে একত্র এবং একই সময়ে সত্য মনে করা কঠিন বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে 'অচিন্ত্য' আখ্যা দিয়াছেন। এই কারণে এই মতটাকে অচিন্ত্য ভেদাভেদও বলা হয়। এই আচার্যদের মধ্যেও মতভেদ আছে। যেমন, শব্দ-প্রমাণ কেহ কেহ একমাত্র শ্রুতিকেই মনে করিয়াছেন; আবার কেহ কেহ স্মৃতি, পুবাণ বিশেষ করিয়া ভাগবত পুরাণকে শব্দ-প্রমাণের অন্তর্গত করিয়াছেন। বেদ সম্প্রতি পাড়িয়া শেষ করা যায় না এবং ইহার অর্থ বুঝাও শক্ত এই যুক্তিতে জীব গোস্বামী পুরাণ ও ইতিহাসকে প্রমাণ মানিয়াছেন। কিন্তু "সর্বপ্রমাণানাং চক্রবর্ত্তিভূতম্ অস্মদভিমতং শ্রীমদ্‌ভাগবতমেব"—'সকল প্রমাণের চক্রবর্তী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভাগবত, ইহাই আমার অভিমত' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। রাধা-দামোদর প্রভৃতি অনেকে এতটা করেন নাই। তবে, রাধা-দামোদর পুরাণগুলিকে, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সাত্ত্বিক পুরাণগুলিকে প্রমাণ মনে করিয়াছেন। ইহার অর্থ, যে সকল পুরাণ বিষ্ণুর কথা এবং বিষ্ণুর অবতারদের কথা বলে সে সকলই প্রমাণ।

এই সব ক্ষুদ্র বৃহৎ মতভেদ বাদ দিলে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সাধারণ বৈদান্তিক মত পাওয়া যায়। সেটি রাধা-দামোদরের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ বেদান্ত-স্যমন্তকে স্পষ্ট। এই গৌড়ীয় বৈদান্তিকদের প্রধান সিদ্ধান্ত ছিল যে, বেদান্তের ব্রহ্ম, ঈশ্বর, হরি ও বিষ্ণু একই অর্থ বুঝায়। বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণও। মনে রাখিতে হইবে যে বাংলার বৈষ্ণব কাহারও কাহারও মতে কৃষ্ণও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ঈশ্বর পুরুষোত্তম; পুরুষের মতো দয়া প্রভৃতি অনুভূতি আছে। কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

আর কিছু নাই। তাঁহার বহুবিধ শক্তি আছে। সৃজনীশক্তি সে সকলের অন্যতম। ইনি শ্রীপতি অর্থাৎ শ্রী তাঁহার পত্নী। রাধাদামোদর ইহার প্রমাণ স্বরূপ শুক্ল যজুর্বেদ ৩১।২২ উদ্ধৃত করিয়াছেন--'শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যৌ' ইত্যাদি। এই উদ্ধৃত মন্ত্রটি ঠিক উপযুক্ত হইয়াছে কিনা, বিচার-সাপেক্ষ। যাহা হউক, সিদ্ধান্ত এই যে বিষ্ণু শ্রীপতি। আর এই বিষ্ণুই প্রধান ; রুদ্র বা শিব এই পদের উপযুক্ত নহেন।

জীবের বহুত্ব ও অনাদিত্ব এবং ঈশ্বর হইতে পৃথকত্ব এই বৈদান্তিকেরা মানেন। জগৎও পারমার্থিক সত্য। জীবের মুক্তিও নানাভাবে কল্পিত হইয়াছে। ভগবানের চিরন্তন সেবার অধিকারই সাধারণত মুক্তির শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনে করা হইয়াছে। আর জ্ঞানলভ্য ভক্তিই যে এই মুক্তির উপায় তাহাও প্রায় সকল বৈষ্ণবেরই সিদ্ধান্ত।

অধিকন্তু রাধাদামোদর প্রকৃতিও স্বীকার করিয়াছেন—ঠিক সাংখ্যের প্রকৃতি। বিশেষের মধ্যে এই যে, ইঁহাদের মতে প্রকৃতি ঈশ্বরের 'গুণ বা শক্তি মাত্র।

খুব বিস্তৃত আলোচনা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় ; সুতরাং ইঁহাদের বাকি সব সিদ্ধান্তের কথা আর উত্থাপন করিব না।

বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই বেদান্ত অনুসারে ঈশ্বর বা বিষ্ণু সস্ত্রীক এই বিশ্ব সৃষ্টি ও রক্ষা করেন। ইঁহারা উভয়েই অশেষ কল্যাণগুণের আধার। আর, সাংখ্যের প্রকৃতিও বিষ্ণুর একটা শক্তি। প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তে ভাগবতের বৃন্দাবন-লীলার ছায়া পড়িয়াছে, ইহা স্পষ্ট। আর দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে সাংখ্যের প্রভাবও স্পষ্ট। ভাগবতকে 'প্রমাণ চক্রবর্তী' মনে করা একটা কথার কথা নহে ; ইহা দৃঢ় বিশ্বাস এবং গূঢ় রহস্য। বেদান্তরূপে ইহার মূল্য কী ; সে প্রশ্ন পৃথক এবং

এখানে তাহা উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ইহাই প্রাণ, তাহা মনে রাখিতে হইবে।

আর-একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে বাংলার বৈষ্ণব ধর্মে ভগবানের 'লীলা'র কথাটা অত্যন্ত বড়ো। 'লীলা' শব্দটি বেদান্তসূত্রও ব্যবহার করিয়াছেন (২।১।৩২) এবং সৃষ্টির সম্বন্ধেই ব্যবহার করিয়াছেন। জগৎ সৃষ্টি দ্বারা ব্রহ্ম কোনো-প্রয়োজন সিদ্ধি করিতে চাহেন নাই; উহা তাঁহার লীলা মাত্র। এইখানে লীলা শব্দের কোনো গূঢ় অর্থ নাই। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিনা প্রয়োজনে কিছু করার নামই লীলা নয়। লীলার একটা গূঢ় সাধারণের অ-বোধ্য পারমার্থিক অর্থ আছে। তাহার সর্বোত্তম উপমা ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা। ইহাতে দর্শনের অপেক্ষা ধর্মের কথাই বেশী; অতীন্দ্রিয়ের বা রহস্যের অনুভূতিই (মিস্টিসিজ্‌ম্) ইহার প্রধান উপজীব্য। খ্রীষ্টান ধর্মেও বিভিন্ন সময়ে এই জিনিস দেখা দিয়াছে; ইস্‌লামে সুফিদের মধ্যেও ইহা পাওয়া যায়। ইহার মূল্য সম্বন্ধে কোনো কথা না বলিয়া ঠিক দর্শনের বিষয় নয় বলিয়াই ইহাকে আমরা এখানে বিদায় দিতে পারি।

বাংলার বেদান্তে সাংখ্যের প্রভাব যে এক সময় প্রবল হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। জীব গোস্বামীর প্রশংসা করিতে গিয়া বলদেব বলিয়াছেন—

> "যঃ সাংখ্যপঙ্কেন কুতর্কপাংশুনা
> বিবর্তগর্তেন চ লুপ্তদীধিতিং
> শুদ্ধং ব্যধাদ্ বাক্‌সুধয়া মহেশ্বরং
> কৃষ্ণং স জীবঃ প্রভুরস্তু নো গতিঃ।"

সাংখ্যরূপ পঙ্কে, (নৈয়ায়িক) কুতর্করূপ ধূলিতে এবং বেদান্তের বিবর্তবাদের গর্তে পড়িয়া যাহার জ্যোতি লুপ্ত হইয়াছিল, সেই মহেশ্বর

কৃষ্ণকে 'জীব' বাক্‌সুধাদ্বারা শুদ্ধ করিয়াছেন। এই স্তুতি হইতেই বুঝা যায় যে সাংখ্যপঙ্ক দেশে ছড়াইয়াছিল।

সাংখ্যের প্রভাবের আর-একটা বড়ো প্রমাণ এই যে, প্রায় ঐ সময়েই বিজ্ঞান-ভিক্ষু নামক একজন গৌড়ীয় সন্ন্যাসী বেদান্তসূত্র ও সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র এই উভয় গ্রন্থের এক বিপুল ভাষ্য রচনা করেন। সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে সমন্বয় সাধনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কৃতকার্য কতটুকু হইযাছিলেন, সে কথা পৃথক্; কিন্তু চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন। প্রথমত তিনি দেখাইতে চাহেন যে, বেদান্তসূত্র সাংখ্যমতের উপর যে আক্রমণ করিয়াছে, তাহা অসৎ সাংখ্য অর্থাৎ অসম্যক্ জ্ঞাত সাংখ্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য। ঠিক বুঝিলে দেখা যাইবে প্রকৃত সাংখ্য বেদান্তের বিরুদ্ধ কথা বলে না। বেদান্তের ব্রহ্ম সাংখ্য ঠিক অস্বীকার করে নাই; আর সাংখ্যের প্রকৃতিও বেদান্তবিরুদ্ধ নয়; কেননা ব্রহ্মের শক্তিরূপে প্রকৃতির কথা শ্রুতিও বলিয়াছে। বেদান্তের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানভিক্ষু একটু অভিনবরূপে করিযাছেন, তাহা মানিতেই হইবে। তবে, তাহা প্রকৃত বেদান্ত কিনা, এখানে আলোচনা অসম্ভব। বেদান্ত আলোচনার ইতিহাসে তাঁহাকে বাদ দেওযা উচিত নয় বলিয়া আমরা এখানে তাঁহার নাম উল্লেখ করিলাম মাত্র।

বাংলার দার্শনিক সাহিত্য নগণ্য নহে। নব্য ন্যায়ের কথা আমরা আগে বলিয়াছি। বাংলার বেদান্ত সাহিত্যও বিচারের যোগ্য। সাংখ্যের প্রকৃতি ও রাধার কল্পনা এবং ভাগবতের বৃন্দাবন-লীলা এই সমস্ত মিলিয়া এই বেদান্তকে একটা অভিনব রূপ দিয়াছে। বেদান্তত্ব ইহাতে কতটুকু আছে, প্রশ্ন উঠিতে পারে। তবে, দর্শনরূপে ইহা একেবারে উপেক্ষার বস্তু নহে, এই সিদ্ধান্তই আমাদের পক্ষে এখানে যথেষ্ট।

বলদেব ১৮শ শতাব্দীর লোক; পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭ খ্রীঃ অঃ) পরেও বাঁচিয়াছিলেন। বেদান্তের বিস্তৃত আলোচনা—অর্থাৎ ভাষ্য জাতীয় গ্রন্থ দ্বারা আলোচনা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়। বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্তের আলোচনা প্রচুর হইতেছে। কিন্তু এসব বেদান্তের ইতিহাসে স্থান পাইবার মতো কিছু নয়।

অ-বৈষ্ণব বেদান্ত

শঙ্করের বেদান্ত ব্যাখ্যা যে অনেকের মনঃপূত হয় নাই, তাহা এতক্ষণে আমরা বুঝিয়াছি। বৈষ্ণব বৈদান্তিক ছাড়া আরও কেহ কেহ ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন। আনুমানিক ১০ম শতাব্দীতে অর্থাৎ রামানুজেরও আগে ভাস্কর নামক একজন বেদান্তসূত্রের ভাষ্য লিখেন। ভাস্কর কোনো সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয় না এবং কোনো সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাও তিনি করেন নাই। কোনো উগ্র মতবাদ তাঁহার ভাষ্যে নাই; সেইজন্যই বোধ হয় বেশী লোকে তাঁহাকে অনুসরণ করে নাই; যে পরম্পরায় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটি তাঁহার ভাগ্যে জুটে নাই। তিনি শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন। মায়াবাদের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রতিবাদই বোধ হয় প্রথম। শঙ্করের দিগ্বিজয়ের বিবরণে একজন ভাস্কর আচার্যের উল্লেখ আছে। ইনিই সেই ব্যক্তি কিনা বলা কঠিন। দিগ্বিজয়ের বিবরণ অনুসারে ভাস্কর অবশ্যই শঙ্করের কাছে পরাস্ত হইয়া নতি স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহার ভাষ্যে তো সেই নতি দেখা যায় না।

শৈব সম্প্রদায়ও বৈষ্ণবদের মতো বেদান্তকে আশ্রয় করিয়া নিজের ধর্ম উপাসনা সুদৃঢ় করিতে চাহিয়াছে। শ্রীকণ্ঠ নামক একজন শৈব বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ভাষ্য হিসাবে ইহার মূল্য যাহাই

হউক, ইহার প্রধান কাজ বেদান্তের ব্রহ্মকে শৈব-উপাসনার দেবতার সঙ্গে এক বলিয়া ঘোষণা করা; আর শিব, পশুপতি, রুদ্র ইত্যাদি শব্দকেও ব্রহ্মবোধক এবং ব্রহ্মবাচক বলিয়া প্রচার করা। ইহা অনেক যুক্তি বিচারের ফলে গৃহীত সিদ্ধান্ত নয়; ইহাতে দার্শনিকত্বও কমই আছে। নিজেদের সম্প্রদায়ের সাহিত্যে শিবই সর্বপ্রধান দেবতা; বেদান্ত সাহিত্যে ব্রহ্মই সর্বশ্রেষ্ঠ; সর্বশ্রেষ্ঠ একজন মাত্র হইতে পারে; অতএব শিব ও ব্রহ্ম এক। কতকটা এই ধরনের যুক্তি বেদান্তের সকল সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যায়ই অনুসৃত হইয়াছে। শৈবরাও তাহাই করিয়াছেন।

বেদান্ত ভাষ্যের তালিকা আমরা শেষ করি নাই। বেদান্ত সাহিত্যের পরিপূর্ণ বিবৃতিও আমরা দিতে পারি নাই। তবে আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে এইটুকু স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, বেদান্তের একটা বিরাট প্রতিপত্তি দেশে হইয়াছিল। বেদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বেদান্তের প্রীতি শ্রদ্ধা এক হইয়া ইহাকে এত উচ্চে উন্নীত করিয়াছিল। এখন যাঁহারা ভারতীয় দর্শনের চর্চা করেন তাঁহাদের অনেকেই অন্য দর্শনের অপেক্ষা বেদান্তকে বেশী বড়ো মনে করেন। উপনিষদের বাক্য-গুলিতে দার্শনিক চিন্তার সহিত সংমিশ্রিত প্রচুর কবি-ভাব রহিয়াছে। ইহাও এই শ্রদ্ধার একটা কারণ।

৫

উপসংহার

দর্শনের শাখা-উপশাখা

ভারতের দর্শনের মূল ধারাগুলি আমরা আলোচনা করিয়াছি। ইহাই সব নয়। ইহাদের একাধিক শাখা-উপশাখা বাহির হইয়াছিল। মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' ইহাদের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণও দেওয়া হইয়াছে। বেদান্তকে গ্রহণ করে নাই—তাহার ভিত্তিতে নিজের ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত করে নাই, এরূপ সম্প্রদায়ও ভারতে ছিল; শৈবদের মধ্যেও ছিল, বৈষ্ণবদের মধ্যেও ছিল। ইহারা অনেকে স্বতন্ত্র দর্শন সৃষ্টি করিতে চেষ্টাও করিয়াছে। পঞ্চ-রাত্র ইত্যাদি সেই সব পর্যায়ে পড়ে। এইরূপ স্বতন্ত্র শৈব দর্শন কয়েকটির সার মাধবাচার্য সংকলিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের সবগুলিই ঠিক দর্শন নয়; প্রমাণ ও প্রমেয়ের বিচারই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; উপাস্য ও উপাসনাই প্রধান আলোচ্য। অনেক এমন শাস্ত্রও মাধবাচার্য সংকলিত করিয়াছেন যাহা দর্শনও ঠিক নয়, অথচ উপাস্য উপাসনার কথাও বিশেষ কিছু বলে নাই; যেমন, 'পাণিনি-দর্শন'। ইহাতে শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়ের ও স্ফোটের বিচার আছে, জীব-জগৎ বা ঈশ্বরের কথা কিছু নাই। ইহার বিষয় আলোচনার অযোগ্য নয়; কিন্তু দর্শন উহাকে জোর করিয়া বলিতে হয়।

মাধবাচার্য একাধিক মাহেশ্বর বা শৈব দর্শনেরও সার সংগ্রহ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে 'রসেশ্বর'-দর্শন নামক যে দর্শনের কথা

তিনি বলিয়াছেন তাহা অতি চমৎকার। রস শব্দের সংস্কৃতে একাধিক অর্থ আছে; পারদও ইহার একটি অর্থ। এই অর্থে 'রস' শব্দ হইতেই রসায়ন শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। পারদ শোধিত ও জারিত হইয়া ঔষধে ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্বেদে ইহার যথেষ্ট প্রয়োগ আছে; আধুনিক চিকিৎসাযও উহা ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতেই আয়ুর্বেদের প্রসিদ্ধ ঔষধ 'মকরধ্বজ' প্রস্তুত হয়।

এই সাদা, তরল ধাতুটি মহাদেবের দেহ-নিঃসৃত বলিয়া কোনো কোনো পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে; সে বর্ণনা সাধু সাহিত্যে উদ্ধৃত হওয়ার যোগ্য নয়। রস মহাদেবের দেহ-নিঃসৃত এই যুক্তিতে তাঁহাকে 'রসেশ্বর' বলা হইয়াছে। কিন্তু এই নামের দর্শনে মহেশ্বরের কথা বড়ো নয়, পারদের প্রশংসাই বেশী। 'পারদের' অর্থ করা হইয়াছে 'পার-দ' অর্থাৎ সংসারের দুঃখ-সমুদ্র 'পার' করিযা দেয যাহা। এই পারদকে যথারীতি ব্যবহার করিলে শ্বাস-কাশ প্রভৃতি রোগ দূর হয়, দেহ নিরাময় হয, আয়ু দীর্ঘ হয, সুতরাং মুক্তি সুলভ হয। উপনিষদেও নাকি ইহার প্রশংসা আছে— 'রসো বৈ সঃ' ইত্যাদি বাক্যে।

চিকিৎসায় পারদ ব্যবহৃত হয, ইহা ভালো ঔষধ, সুতরাং ইহার প্রশংসায় আমাদের কী আপত্তি থাকিতে পারে? কেহ যদি 'বাজীকরণের' জন্য, বল-বীর্য বৃদ্ধির জন্য ইহা ব্যবহার করে, তাহা হইলেও আমাদের বলিবার কিছু নাই। কিন্তু পারদ কি সত্যই সংসার-সাগর পারের তরণী? উপনিষদের ব্রহ্মবাচক 'রস' আর বাজীকরণ ও রসায়নের 'রস' কি একই বস্তু? এই আলোচনাকেও মাধবাচার্য দর্শন উপাধি দিয়া অক্ষপাদ, কণাদ, শঙ্কর প্রভৃতির দর্শনের সঙ্গে একত্র সংগৃহীত করিয়াছেন। দর্শনের প্রতি ইহা অপেক্ষা নিষ্ঠুর পরিহাস আর কী হইতে পারে? কিন্তু মাধবাচার্য ঠিক উপহাসই করিতে চাহেন নাই। সুতরাং

এক্ষেত্রে তাঁহার বিচার-বুদ্ধির প্রতি আধুনিক দার্শনিকের শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন।

দর্শনের এই সব শাখা-উপশাখা খুবই প্রভাবশালী হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তবে এক শ্রেণীর লোক নিশ্চয়ই ইহাদের চর্চ্চা করিত; না হইলে মাধবাচার্য ইহাদের কথা তুলিতেন না।

তন্ত্র

তন্ত্র নামক একটা বেশ বড়ো সাহিত্য এদেশে আছে। বাংলা এবং কাশ্মীরেই ইহার সমাদর বেশী হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; এবং বাংলাদেশে এই সাহিত্যের অন্তর্গত গ্রন্থও অনেক পাওয়া যায়। এই সব গ্রন্থের অধিকাংশ এখনো মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই; কিছু কিছু আবার গোপনেও মুদ্রিত হইয়া থাকিতে পারে। অকপটে বলা ভালো, ইহাদের অনেকগুলিই ভদ্র-সমাজে প্রকাশের অযোগ্য; যেমন, 'কুমারী', 'চিন্তামণি', 'চীনাচার', 'যোনি', ইত্যাদি শব্দ যে সব তন্ত্রের নামের আদিতে আছে, সেগুলি। তন্ত্রের মধ্যে আবার হিন্দু, বৌদ্ধ, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি শ্রেণীভেদও আছে। ইহাদের মধ্যে 'শাক্ত' তন্ত্রই বাংলায় বেশী প্রসিদ্ধ এবং ইহার উগ্র-ভাবও একটু বেশী। পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা ন্যূনাধিক সকল শ্রেণীর তন্ত্রেই আছে। যথা, শাক্ত-শৈবদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—"হরের্নাম ন গৃহ্ণীয়াৎ ন স্পৃশেৎ তুলসীদলং।" —হরির নাম লইবে না এবং হরির প্রিয় তুলসী পাতা স্পর্শ করিবে না! ইহা কি বৈষ্ণব বিদ্বেষ নয়? এইরূপ উক্তি আরও সংগ্রহ করা যায়। তাহাতে পরস্পরের প্রতি অনুদারতাই প্রকাশ পায়।

এই সব তন্ত্রে অনেক কিছু আছে। পঞ্চ ম-কার, নব কুমারী, বীরাচার, পশ্বাচার, কুলাচার ইত্যাদির বর্ণনা ও ব্যবহার-প্রণালী বলা

আছে ; নানাপ্রকার সাধনের কথা আছে ; মুক্তির কথাও আছে এবং 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর'—ব্রহ্ম-আস্বাদের সমান আনন্দের কথাও আছে। আমরা তন্ত্রের মুদ্রিত গ্রন্থ এবং অমুদ্রিত পুঁথি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তন্ত্র-সাহিত্যের অন্য মূল্য যাহাই থাকুক না কেন, ইহাকে দর্শন-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিলে দর্শনকে রীতিমত অপমান করা হয়। জগতের উৎপত্তি স্থিতি আত্মার মুক্তি ইত্যাদির কথা যে তন্ত্রে না উঠিয়াছে, এমন নয় ; কিন্তু সেটি কখনোই প্রধান নয়। বরং বেদের বিরুদ্ধ কথা ; শ্রৌত কর্মের নিন্দা, তর্ক-শাস্ত্রের ও ব্রহ্ম-বিদ্যার নিন্দা তন্ত্রে অনেক জায়গায় পাওয়া যায় ; লাবড়ায় দুই টুকরা আলু ফেলিয়া দিলেই উহা আলুর দম হয় না। মদ্য, মাংস, চীনাচার, কুলাচার ইত্যাদির বিস্তৃত আলোচনার ও বিবরণের মধ্যে কখনো মুক্তি বা ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহার করিলেই কোনো শাস্ত্র দর্শন হইয়া যায় না !

কথাটা আমরা না তুলিলেও পারিতাম। কিন্তু কিছু দিন আগে একজন উচ্চপদস্থ সাহেব* তান্ত্রিক সাধনায় আকৃষ্ট হইয়া তন্ত্র সম্বন্ধে ইংরেজীতে কয়েকখানা বই লিখেন ; আর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুদিগকে বিজাতীয় ভাবাপন্ন ও স্বদেশের জ্ঞানে শ্রদ্ধাহীন বলিয়া ভর্ৎসনাও করেন। তাহার পর হইতেই তন্ত্রের প্রতি একটু আকস্মিক শ্রদ্ধা আধুনিক শিক্ষিত অনেকেই দেখাইয়া থাকেন দেখিতেছি। ইঁহারা অনেকে গভীরভাবে তন্ত্র-তত্ত্বের অনুশীলন করিতেও উপদেশ দিয়া থাকেন। একজন কবি বলিয়াছেন—

যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখিবে তাই,
পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন—

এই নীতি অনুসারে তন্ত্রে গভীর তত্ত্বের আশা করিয়া তীব্র

---

* কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি স্যর জন্ উড্রফ।

অনুসন্ধান করিতেও অনেকে আমাদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু রত্নের সন্ধানে যে শুধু ছাই উড়াইয়া ফিরে, সে সত্যই কখনো রত্ন পায় কিনা সন্দেহ। তাহা হইলে শহরের আস্তাকুঁড়েতে মক্ষিকা না বসিয়া প্রত্ন-তাত্ত্বিকেরা বসিয়া থাকিতেন; সমস্ত বড়ো শহরের অলিগলি আধ্যাত্মিকতার মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়া যাইত; আর, পৃথিবীর সমস্ত সুরার বোতল সুধায় পূর্ণ হইয়া যাইত। তন্ত্রে উপদেশ আছে—

মদ্যপানং বিনা দেবি ব্রহ্মজ্ঞানং ন লভ্যতে—

মদ্যপান না করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। মদ্য পাঁচটি ম-কারাদি দ্রব্যের একটি। বাকি চারিটি সম্বন্ধেও অনুরূপ উপদেশ উদ্ধৃত করিতে পারিতাম। এইরূপ যে শাস্ত্রের উপদেশ, মদ্য ইত্যাদি শব্দের হাজার রকম আধ্যাত্মিক অর্থ করিলেও সেই শাস্ত্রকে দর্শন বলা চলে না। আমাদের পক্ষে ইহা বলাই যথেষ্ট।

'সহজিয়া' সাহিত্য বলিয়া আরো এক শ্রেণীর সাহিত্য বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় পাওয়া যায়। ইহারও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা মাঝে মাঝে শুনি। কাব্য কিংবা সাধন-প্রণালী হিসাবে ইহাকে কী মূল্য দেওয়া উচিত, সে প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়া ইহাকেও আমরা দর্শন-পর্যায়ের বাহিরে রাখিতে পারি।

'রসেশ্বর' দর্শন যদি দর্শন হয়, তবে তন্ত্রই বা হইবে না কেন? 'সহজিয়া'ই বা কী দোষ করিল? আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত, ইহাদের কোনোটিই প্রকৃত দর্শন নয়। এই সিদ্ধান্তে তন্ত্র-ভক্ত কিংবা সহজিয়া সাধক কাহারওই অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। দর্শন না হইলেই সেই বিদ্যার কোনো মূল্য নাই, একথা তো আমরা বলিতেছি না।

উপসংহার

সমন্বয় বা প্রস্থান-ভেদ

আস্তিক দর্শনসকলের যে বিবরণ আমরা দিয়াছি তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, ইহাদের মধ্যে মত-ভেদ রহিয়াছে প্রচুর। একটি পরিপূর্ণ-ভাবে গ্রহণ করিলে আর-একটিকে বর্জন করিতে হয়। এই জন্যই বিভিন্ন সূত্র-গ্রন্থ প্রতিযোগী দর্শনের মত খণ্ডন করিয়াছে। কিন্তু বাহিরের সাধারণ শত্রুর সম্মুখে যেমন অনেক সময় আভ্যন্তরীণ কলহ ভুলিয়া সকলে এক হয়, তেমনই ভারতে মুসলমান প্রভুত্বের শেষ দিক্ দিয়া খ্রীঃ ১৭শ-১৮শ শতাব্দীর কাছাকাছি কেহ কেহ আর্য-ঋষিদের দান বলিয়া এই সমস্ত দর্শনকে সমন্বিত করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মত ছিল এই যে, ভিন্ন ভিন্ন দর্শন বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন সোপানের মতো ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অবস্থিত লোকদের জন্য ঈপ্সিত হইয়াছিল, বাস্তবিক ইহাদের মধ্যে কলহ বা বিরোধ কিছু নাই, কারণ, ইহারা সকলেই বেদ-প্রসূত। সকলেই সকল স্তরের বিদ্যা গ্রহণ করিতে অধিকারী নয়; সেইজন্য বিভিন্ন স্তরের জিজ্ঞাসুর সামর্থ্য অনুসারে বিভিন্ন দর্শন কল্পিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ে যেমন অল্প অল্প করিয়া একটা ক্রম অনুসারে বিদ্যা আয়ত্ত করিবার ব্যবস্থা আছে, তেমনই দর্শনার্থী সরল দর্শনগুলি আয়ত্ত করিয়া ক্রমশ উচ্চতর দর্শনে উন্নীত হইবে, ইহাই ঋষিদের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু কোন্ স্তরের পাঠ্য কোন্ দর্শনটি—সর্ব নিম্ন কোন্‌টি তাহা নির্বিবাদে মীমাংসিত হয় নাই। এইরূপ পর পর শ্রেণী যাঁহারা কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহারা সাধারণত বেদান্তকেই সর্বোচ্চ শ্রেণীর দর্শন—'দর্শনশিরোমণি'—মনে করিয়াছেন। মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহে'র আলোচনার ক্রম দেখিয়াও তাহাই মনে হয়। আবার কেহ কেহ এক-এক প্রকার অধিকারীর পক্ষে এক-এক দর্শন উপযোগী এই পর্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত

হইয়াছেন ; সমস্ত দর্শনের একটা পর্যায় নির্দিষ্ট করিতে চেষ্টা করেন নাই। দর্শনগুলি সব ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন 'প্রস্থান' বা পথ মাত্র ; পরস্পরবিবদমান শাস্ত্রের সমূহ নয়। মধুসূদন সরস্বতী কতকটা এই ধরনের মত পোষণ করিতেন।

এই সমন্বয়ের চেষ্টা হিন্দু দর্শনের ঐক্য দেখাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টার মতো মনে হয়। কোনো-এক দর্শনে সমগ্র সত্য প্রকাশ পায় নাই ; বেদান্ত এবং ন্যায়, উভয়ের মধ্যেই গ্রহণীয় এবং বর্জনীয় দুই-ই আছে ; এই গ্রহণ. বর্জন দ্বারা একটা উচ্চতর দর্শন আবিষ্কৃত হইতে পারে ; এই কথা বলিলে আমরা আপত্তি করিতাম না। এরূপ গ্রহণ-বর্জন দ্বারা উচ্চতর দর্শন ইতিহাসে আবির্ভূত হইয়াছে। প্ল্যাতো ও হেরাক্লাইতাসের মত হেগেলের দর্শনে এইভাবে সমন্বিত হইয়াছে, তাহা পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সহিত পরিচিত ব্যক্তিরা জানেন। কিন্তু মধুসূদন প্রভৃতি ঠিক তাহা না বলিয়া যে একটা স্থূল সমন্বয়ের এবং বিরোধাভাবের কথা তুলিযাছেন—একটা বাহ্য সমান-তন্ত্রতা দেখাইতে চাহিয়াছেন, তাহা খুব যুক্তিসংগত নয়। অহিন্দুর কাছে সব হিন্দু এক, বাহিরেব সভ্যতার কাছে সমস্ত হিন্দু সভ্যতা ঐক্যবদ্ধ বলিলে যেমন শুনায়, অন্য দর্শনের নিকট সমস্ত হিন্দু-দর্শন এক বলিলেও ঠিক সমান অর্থই বুঝায়। রাজনীতিতে যেমন এক সময় ধ্বনি শোনা গেছে— 'কংগ্রেস লীগ' এক হও ; বৈশেষিক-বেদান্ত এক বলিলেও অনেকটা সেই ধরনের ভাবই মনে জাগে।

মুসলমান প্রভাব

ভারতে মুসলমানেরা প্রায় এক হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়াছে। ইংরেজও প্রায় দুই শত বৎসর আধিপত্য করিয়াছে। ইহাদের উভয়েরই

সঙ্গে একটা সভ্যতা এদেশে আসিয়াছে। ভারতের দর্শনে কি তাহার কোনো প্রভাব দেখা যায় নাই?

গত দুই শত বৎসরের মধ্যে ইংরেজের দর্শনে কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীতে দর্শনের ভাণ্ডারে ইংরেজ অনেক কিছু দান করিয়াছে। এই সময়ের মধ্যেই মিল্ (Mill), স্পেন্সর (Spencer) প্রভৃতির আবির্ভাব হয়; আর এই শতাব্দীর মধ্যভাগেই ডারউইন্ (Darwin) তাঁহার বিপ্লবী মত—ক্রমবিকাশের কথা—জগৎকে শুনান। শুধু ইংরেজের নয় ইউরোপের ইতিহাসেই এই ১৯শ শতাব্দী একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য শতাব্দী। এই সময়েই প্রাচ্যে ইংরেজের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়; এবং ইউরোপে নূতন বিজ্ঞান, নূতন সাহিত্য, নূতন ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পদ্ সঞ্চিত হইতে থাকে। এই সময়ে ভারতে ইংরেজি শিক্ষাও বিস্তার পাইতে থাকে; ইংরেজের এবং ইউরোপের দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য এদেশে আসিতে আরম্ভ করে; সমগ্র ইউরোপের জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার ভারতীয়দের নিকট খুলিয়া যায়। কিন্তু ঠিক এই সময়েই ভারতের নিজস্ব দার্শনিক চিন্তার সূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। ইংরেজি শিক্ষিতেরা গোড়ার দিকে দেশের প্রাচীনকে অত্যন্ত অবহেলা করিতেন। সংস্কৃত ভাষার পঠন-পাঠনের মূল্যও কমিয়া যায়। কিছুকাল পরে, বাংলায় এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে যখন স্যর উইলিয়ম্ জোন্স্ প্রভৃতি অনেকে সংস্কৃতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে আরম্ভ করেন, তখন দেখাদেখি বাঙালীরা এবং ভারতের অন্য প্রদেশের লোকেরাও আস্তে আস্তে, সংস্কৃতেও জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, এরূপ ভাবিতে আরম্ভ করেন। এই দ্রুত বিপর্যয়ের ভিতর ইংরেজদের ও ইউরোপের দর্শন এদেশে অধীত ও অধ্যাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই দার্শনিক চিন্তা এদেশের মাটিতে ঠিক শিকড় গাড়িতে পারে নাই—এখনও পারে নাই; আর ঐ সব

দেশের প্রসিদ্ধ দর্শন সমূহের কোনো শাখা-প্রশাখাও তেমন কিছু এদেশে উৎপন্ন হয় নাই। দেশের ভাষায় ও সাহিত্যে পশ্চিমের দর্শনের প্রভাব কথঞ্চিৎ প্রতিফলিত হইলেও দর্শনের ইতিহাসে উল্লেখ করার মতো কোনো ফল দেখা দেয় নাই। কাজেই ইংরেজ-শাসনের সময় ভারতের নিজস্ব স্বতন্ত্র দর্শনের অবাধ গতি বরং রুদ্ধই হইয়া যায়, স্ফূর্ত হইতে পারে নাই। ইদানীং অর্থাৎ গত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ লোকের মনে স্বদেশ-প্রেমের সঙ্গে স্বদেশের সভ্যতার প্রতিও একটা বিশেষ শ্রদ্ধা দেখা দিয়াছে; এবং সেই সঙ্গে দেশের প্রাচীন দর্শনের প্রতিও একটা শ্রদ্ধা—কোনো কোনো ক্ষেত্রে অত্যধিক এবং নির্বিচার শ্রদ্ধা—প্রকাশ পাইতেছে।

মুসলমানী আমলে অবস্থা অন্যরূপ ছিল। পলাশীর যুদ্ধের কাছাকাছি সময়েও বলদেব বিদ্যাভূষণ বেদান্তের ভাষ্য লিখিযাছেন। আর, মধ্ব, বল্লভ প্রভৃতি অনেক দার্শনিকেরই আবির্ভাব হইয়াছিল যে সময়ে, সে সময়ে দিল্লীর মসনদে মুসলমান বাদশাহ অধিষ্ঠিত। কাজেই মুসলমানদের শাসনকালে যে কারণেই হউক, দেশের চিন্তাধারার বিশেষ ক্ষতি কিংবা বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই। কিন্তু মুসলমানেরা নিজেরা কিছু দান করিয়াছে কি?

ভারতের স্থাপত্যে মুসলমানদের দান পৃথিবীর প্রশংসা লাভ করিযাছে। তাজমহল ছাড়াও লাহোর, দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি প্রভৃতি স্থানে তাহারা প্রশংসনীয় কীর্তি রাখিয়া দিয়াছে। এমন কি ঢাকায় পর্যন্ত তাহাদের শাসনের চিহ্ন রহিয়াছে। উর্দু নামক ভাষাটিও বলিতে গেলে মুসলমানদেরই সৃষ্টি। সে সমস্ত কথা সাধারণ ইতিহাস বলিবে। কিন্তু দর্শনে তাহারা কিছু দিয়াছে কি? ঔরঙ্গজেবের ভ্রাতা দারা উপনিষদ্ পড়িয়াছিলেন, কতকগুলি উপনিষদ্ ফারসীতে অনুবাদ

করাইয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ; এবং সেই অনুবাদের অনুবাদই ইউরোপে ভারতের জ্ঞানের কথা প্রথম প্রচার করে, ইহাও সাধারণ ইতিহাস। এই সব উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু দর্শনের ইতিহাসে স্থায়ী ফল কিছু রাখিয়া গিয়াছে কি?

ধর্ম হিসাবেই ইস্‌লামের প্রভাব বেশি ছিল, দর্শন হিসাবে নয়। ইস্‌লামের আঘাতে—কেহ হয়তো বলিবেন অত্যাচারে—হিন্দুর ধর্মে ও সমাজে একাধিক সংস্কারের চেষ্টা দেখা দিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সংস্কারকে যদি উপকার মনে করা যায়, তাহা হইলে ইস্‌লামের সহিত হিন্দুধর্মের সংযোগও অত্যাচার না হইয়া উপকারই বিবেচিত হওয়া উচিত। মন্দির ধ্বংস ধর্মের উপর অত্যাচার, ইহা সকলেই মানিবে। কিন্তু তাহা হইতেও যদি ভালো কিছু হইয়া থাকে—মন্দ হইতেও ভালো যেমন অনেক সময় হয়—তবে তাহাই বা ইতিহাস বলিবে না কেন? কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দির ভাঙিয়া মুসলমানেরা মস্‌জিদ্ করিয়াছে, ঠিক: কিন্তু হয়তো সেইজন্যই বিশ্বনাথ অস্পৃশ্যতা বর্জন করিয়া সকল হিন্দুর স্পৃশ্য হইয়াছেন। কথাটা গোঁড়া হিন্দুর কানে কেমন ঠেকিবে, কল্পনা করিতে পারি। কিন্তু এখনও সব দেবমূর্তি তো সকল হিন্দুর স্পৃশ্য নন। অহিন্দুর স্পৃশ্য তো ননই। অতীতের কলহ সমস্ত জীয়াইয়া না রাখিয়া ভালো যাহা পওয়া গিয়াছে তাহা মনে করিলে ভবিষ্যৎ সুন্দর হয়। মুসলমান শুধু ভাঙেই নাই, গড়িয়াছেও। ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর এবং দেবালয়ের জন্য দেবোত্তর ভূমিও কোনো কোনো মুসলমান বাদশাহ কি দান করেন নাই? কাজেই হিন্দুর ধর্ম ও সমাজের সঙ্গে একটা নৈকট্য—একটা ন্যূনাধিক নিবিড় সম্বন্ধ—তাহাদের ঘটিতেছিল। ইহার ফলে অনেক সংস্কারের চেষ্টা হিন্দুর সমাজে দেখা দিয়াছিল। বাহিরের সক্রিয় শক্তিকে বাদ দিয়া ইতিহাসের কোনো ঘটনা

ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া অবৈজ্ঞানিক। কাজেই ভারতীয় সমাজের মধ্যযুগের অর্থাৎ ১৩শ-১৭শ শতাব্দীতে নানক, কবীর প্রভৃতির আবির্ভাবে ইস্লাম পরোক্ষে কিংবা গৌণভাবেও কোনো সহায়তা করে নাই, ঐতিহাসিকের পক্ষে তাহা বলা উচিত হইবে কি? আঘাতই বলি আর অত্যাচারই বলি, প্রায় হাজার বৎসর কাল ভারতীয় সমাজে ইস্লামের উপস্থিতি এবং ঘনিষ্ঠ সংযোগ একেবারে নিষ্ক্রিয় ছিল না, ইহা ঠিক, এবং এই ক্রিয়ার ফলে নানারূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। স্থাপত্যে, ধর্মে, সমাজে, ভাষায়, আচারে, পোশাকে, আইনে ও জমি-বিলিতে—বহু জায়গায় মুসলমান শাসনের চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। তাহাদের একেশ্বর-বাদের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতের একেশ্বর-বাদ বিশেষত বৈষ্ণব একেশ্বরবাদ—উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে নাই, এমন কথা বলিতেও আমাদের সংকোচ বোধ হইতেছে। কিন্তু দর্শনের বেলায় মুসলমানদের দান হিসাবে উল্লেখযোগ্য কিছু পাই না; মুসলমান দর্শন বলিযা ভারতে তেমন কিছু উৎপন্ন হয় নাই। ইস্লামের সীমার ভিতরে ভারতের বাহিরে ইসলামিক জগতে দর্শন যতটুকু উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা মুসলমান শাসনের সময় ভারতে নানা জায়গায় অধীত হইত এবং এখনও হয়; কিন্তু ভারতীয় দর্শনে তাহার স্পর্শ অনুভব করা যায় না।

ভারতের বাহিরে ভারতের জ্ঞান

ভারত তাহার স্বোপার্জিত জ্ঞান বাহিরের জগৎকে কতটুকু দান করিয়াছে? অথবা বাহিরের জগৎ ভারতের নিকট বিদ্যার জন্য কতটুকু ঋণী? দর্শন-বিজ্ঞানের বেলায়, বিশেষত প্রাচীন যুগে, এই ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করা একটু কঠিন। বর্তমান যুগেও অনেক সময় দুইজনে পরস্পরনিরপেক্ষভাবে একই সত্য যুগপৎ আবিষ্কার

করিয়া ফেলিতে পারেন। কিন্তু বর্তমানে বিদ্যার প্রকাশ ও প্রচার এত সহজ যে, যে পরে জানে তাহাকেই ঋণী ধরিয়া লওয়া হয়। কোনো বৈজ্ঞানিক নূতন তত্ত্ব—অবশ্যই ইহা যদি কোনো মারণাস্ত্র না হয়—আবিষ্কৃত হওয়া মাত্রই জগৎকে জানাইয়া দেন; এবং ফলে সব দেশেরই অনলস বৈজ্ঞানিকেরা উহার সংবাদ পায়, এরূপ ধরিয়া লওয়া হয়। সুতরাং এই প্রকাশের পর এই সত্য যে ব্যবহার করিবে, সে পূর্বগামী আবিষ্কারকর্তার নিকট ঋণী, ইহাই সাধারণ সিদ্ধান্ত হইবে।

কিন্তু প্রাচীনকালে বিদ্যার প্রকাশ ও প্রচার এত সহজ ছিল না। এক দেশের বিদ্যা অনেক সময় অতি মন্থর গতিতে অন্য দেশে প্রবেশ করিত এবং অনেক বক্র পন্থা ঘুরিয়া যাইত। ফলে, সেই দেশের যাহারা ঐ বিদ্যা ব্যবহার করিত, তাহারা কাহার নিকট ঋণী, অনেক সময় ইচ্ছা থাকিলেও বুঝিতে পারিত না। কাজেই সেই বিদ্যা তখন তাহাদেরই জ্ঞান বলিয়া বাহিরে প্রকাশ পাইত। বিদ্যার আদান-প্রদান প্রাচীন কালেও হইত; কিন্তু উত্তমর্ণ-অধমর্ণ নির্ণয় করা সব সময় সহজ ছিল না। সময়ের দূরত্ব যদি খুব বেশী দেখা যায় এবং দুই দেশের মধ্যে লোকের আসা-যাওয়ার যদি খুব স্পষ্ট প্রমাণ থাকে, তবে ঋণ প্রমাণ করা অনেকটা সহজ হয়। আর ঋণী নিজে ঋণ স্বীকার করিলে তো কোনো কথাই নাই। গ্রীস্ যে জিনিস জানিয়াছে, তাহা যদি ভারতে অনেক পরে দেখা যায় এবং সেই সময়ের পূর্বে ও পরে যদি উভয় দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রমাণ করা যায়, তবে কে ঋণী বলা কিছু শক্ত নয়। তাহা না হইলে 'সম্ভব' মনে করা ছাড়া নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কিছু করা যায় না। দুই দেশের চিন্তার মধ্যে স্পষ্ট এবং প্রচুর সাদৃশ্য দেখা গেলে এক দেশ ঋণী ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিতে না পারিলেও অনুমান করা চলে। 'সাদৃশ্য খুব বেশী হইলে উভয়ের আবিষ্কার স্বাধীন, এরূপ মনে করা একটু কষ্টকল্পনা।

প্রাচীন ভারতের তত্ত্বজ্ঞান, তাহার দার্শনিক চিন্তা—বাহিরের বৃহত্তর জগতে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং আদৌ কোনো প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসায় আমাদিগকে উপরি-উক্ত পন্থাই অবলম্বন করিতে হইবে। তখনকার সভ্য দেশ পারস্য, মিশর, গ্রীস্, মধ্য-এশিযা, তিব্বত ও চীনেব সঙ্গে ভারতের যে একটা যোগাযোগ ছিল, তাহা স্বীকৃত। উভয় দিকেই লোকের যাতায়াত ছিল- স্থলপথে তো বটেই, সম্ভবমতো জলপথেও ছিল। লোকের সঙ্গে প্রত্যেক দেশের তত্ত্ব-জ্ঞানও কমবেশী ভিন্ন দেশে যায় ; যাহারা যাতাযাত করে তাহারা সকলেই অশিক্ষিত নয়, শিক্ষিত লোকও তাহাদের মধ্যে থাকে ; সুতরাং জ্ঞানও যাতাযাত করে। বিদেশ হইতে আগত এই জ্ঞান আলোচিতও হয় এবং গৃহীত অথবা বর্জিত হয। ভারতের বিদ্যার ভাগ্যেও এই সম্মান ও আদর এবং উপেক্ষা ও অনাদর, উভয়ই ঘটিয়াছে ; ইহা প্রমাণের বাহিরে নয়। কিন্তু ঋণগ্রাহীদেব স্পষ্ট স্বাকারোক্তি না থাকায কে কতটুকু ধার লইয়াছে আর কতটুকু নিজস্ব সম্পত্তি, এতকাল পরে খুব জোর করিয়া বলা কঠিন। তবে, কতকগুলি সাদৃশ্য আছে যাহার চর্চা করিলে স্বতই মনে হইবে, ভারত বাহিরের জগৎকে শুধু বুদ্ধের ধর্মই দেয় নাই, নিজের দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানও কিছু কিছু দান করিয়াছে। আমরা এখানে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছি।

১. গ্রীক দার্শনিক প্ল্যাতো আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনায় এমন ভাবে সমাজের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করিয়াছেন যে পড়িলে মনে হয় হিন্দুর বর্ণভেদের কথা পড়িতেছি। হিন্দুর আদর্শ রাষ্ট্রে যেমন কর্মানুসারে চাতুর্বর্ণ্য কল্পিত হইয়াছে, প্ল্যাতোও ঠিক তাহাই করিয়াছেন। প্ল্যাতো অবশ্যই জন্মগত বর্ণভেদ স্বীকার করেন নাই ; হিন্দুর কল্পনায়ও আদিতে চাতুর্বর্ণ্য গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে সৃষ্ট মনে করা হইত। তাহার

পর গীতায সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ অনুসারে মানুষের যে প্রভেদ করা হইযাছে, তাহা হিন্দু-চিন্তার একটা বৈশিষ্ট্য, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয এই যে, প্ল্যাতোর চিন্তাযও তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইযাছে।*

প্ল্যাতোতে পুনর্জন্মের কথাও পাই। ইহা তিনি কোথা হইতে পাইলেন? কর্মানুসারে পরবর্তী দেহ হয, ইহাও তিনি বলিযাছেন। ইহা কি তাঁহার নিজস্ব স্বাধীন সিদ্ধান্ত, না, ঋণ? তাঁহার পূর্ববর্তী গ্রীক চিন্তায এই ধরনের কথা পাওয়া যায না। তিনি যদি ঋণী হন, তবে কাহার নিকট? মিশরের নিকট? অসম্ভব নয, এবং কেহ কেহ তাহাই অনুমান করিযাছেন, কিন্তু ভারতের নিকট ঋণী হওযা কি অসম্ভব? ভারতীয চিন্তায—হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে—এই জন্মান্তর ও কর্মবাদের কথা এত ব্যাপ্ত যে এখান হইতে উহা বাহিরে ছড়াইযা পড়াও তো একেবারে অকল্পনীয নয। পারস্যের ভিতর দিযা এবং সমুদ্রের কূল বাহিযা ভারত ও গ্রীসের মধ্যে যাতাযাত একেবারে ছিল না, এমন তো নয। আর, এশিযার পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে গ্রীকরা তো সর্বদা যাতাযাত করিত। সুতরাং ভারতের নিকট ঋণী বলিলে যদি ইউরোপের আদিম যুগের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের অবমাননা না হয, তবে প্ল্যাতোকে ভারতের নিকট ঋণী বলিতেই বা আপত্তি কী?

২. মুসলমানদের মধ্যে সুফি বলিযা যে এক সম্প্রদায আছে, তাহাদের বিশ্বাস ও আচার এবং সাধনা অনেক রকমে হিন্দুদের মতো। একজন জার্মান পণ্ডিত (Von Kremer) ইঁহাদিগকে বেদান্তের নিকট ঋণী মনে করিযাছেন। যোগ সাধনার সঙ্গেও ইঁহাদের সাধনার সাদৃশ্য আছে। সুতরাং সুফিদের চিন্তায ও সাধনায ভারতীয

* Plato, Republic, III 415, etc., তুঃ Calcutta Review, August, 1927.

প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। ইহা অসম্ভবও কিছু নয়। বোগদাদের খলিফারা জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের দরবারে ভারতের পণ্ডিতও উপস্থিত থাকিতেন এবং সমাদরও পাইতেন। পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান, ঋণ দান ও ঋণ গ্রহণ অসম্ভবের পর্যায়ে ছিল না। সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ পর্যন্ত এই প্রকার লেন-দেন চলিযা থাকিবে।

৩. ভারতের নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জ—লঙ্কা, যব, সুমাত্রা ইত্যাদি অনেকদিন ভারতীয় সভ্যতার সংস্পর্শে ছিল। সে সব দেশে এবং মালয়, শ্যাম ও ব্রহ্ম প্রভৃতি উপদ্বীপেও ভারতের ধর্ম যে প্রবেশ করিয়াছিল—শুধু বৌদ্ধধর্ম নয়, হিন্দুধর্মও প্রবেশ করিয়াছিল—তাহার প্রচুর প্রমাণ রহিয়াছে। বিষ্ণু প্রভৃতি দেবদেবীর মন্দির এবং মূর্তিও ঐসব দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সভ্যতা গেলে সঙ্গে দার্শনিক চিন্তাও কিছু যায়-ই। পরলোকে বিশ্বাস, কর্মবাদ ইত্যাদি ঐসব দেশের লোক ভারতের নিকট পাইয়া থাকিবে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব ভগ্নমন্দির দেখিয়া সেখানে বিষ্ণুর পূজা প্রচলিত ছিল, একথা যত সহজে বলিতে পারে, অদ্বৈতবাদ কিংবা পরমাণুবাদও প্রচলিত ছিল, একথা বলার মতো প্রমাণ তত সহজে আবিষ্কার করিতে পারে না। সুতরাং সূক্ষ্ম দার্শনিক মতবাদ ভারত হইতে ঐসব দেশে কতখানি গিয়াছিল, তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে আমাদিগকে ভবিষ্যৎ আবিষ্কারের জন্য আরো কিছু প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

৪. তাহার পর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে ১৭শ-১৮শ শতাব্দীতে যখন ভারতের সঙ্গে ইউরোপের সম্বন্ধ আবার ঘনিষ্ঠ হয় তখন দ্বিতীয় বার ভারতের জ্ঞান ইউরোপে প্রবেশ করে। ইউরোপের দার্শনিকেরা ভারতের দর্শনের নিকট ঋণ নিজেরাও অনেকে স্বীকার করিয়াছেন। জার্মান দার্শনিক শোপেনহোর (Schopenhaur) উপনিষদ্ এবং সাংখ্য

ইত্যাদির নিকট যে ঋণী তাহা তিনি নিজেও স্বীকার করিয়াছেন, এবং তুলনায় তাঁহার দর্শন বিচার করিলে অন্যেও দেখিতে পাইবে।

গত দুই শত বৎসর যাবৎ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ভারতের নিকট শুধু যে ঋণ লইয়াছেন এমন নয়, ঋণ দিয়াছেন-ও। অনেক লুপ্তপ্রায় গ্রন্থ তাঁহারা উদ্ধার করিয়াছেন, এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় এদেশের গ্রন্থ তর্জমা করিয়া উহাদের প্রচারবৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছেন এবং উহাদের মর্যাদাও বাড়াইয়া দিয়াছেন। চীনে, তিব্বতে, মধ্য-এশিয়ায় প্রচ্ছন্ন ভারতীয় জ্ঞান তাঁহারা পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। শ্রদ্ধা অথচ সমালোচনার সহিত সে সকলের বিচার করিয়া তাহাদের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণে জগৎকে এবং ভারতকেও সহায়তা করিয়াছেন।

ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য

রাজনীতি, সমাজনীতি বা অর্থনীতি দর্শনের অন্তর্গত বিদ্যা নয়। চারিত্র-নীতি ও মনস্তত্ত্ব দর্শনের সঙ্গে আলোচিত, অধীত ও অধ্যাপিত হয়; কিন্তু উহারাও ঠিক দর্শনের অঙ্গ নয়, সহকারী মাত্র। তথাপি এই সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা দার্শনিকেরা কমবেশী করিয়া থাকেন; নিজেদের দার্শনিক মত স্পষ্ট করিবার জন্য এবং কতকটা দর্শনের অঙ্গ হিসাবেও আলোচনা করেন। তাহার কারণ, জীবের আলোচনা করিতে গেলে ব্যক্তিরূপে তাহার জীবনের কথাও ভাবিতে হয়। পরলোক ধ্রুব সত্য হইলেও ইহলোকেও তাহাকে বাঁচিতে হয়; এখানে সে জন্ম লইয়াছে, দর্শনের পাঠক ও আলোচক রূপে সে এখানেই

বর্তমান। তাহার এখানকার জীবনের প্রতিবেশ একটা রাষ্ট্র ও সমাজ তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। সমাজ হইতে দূরে একেবারে বনে গিয়া সকলেই বাস করে না। সুতরাং আরো মানব-গোষ্ঠীর যে বেষ্টনীর মধ্যে সে বাস করে, সেই সকলের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধের কথাও বিচার্য হইয়া পড়ে। অন্য সকল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর প্রতি তাহার কর্তব্য এবং তাহাদের নিকট হইতে তাহার প্রাপ্তব্য কী, তাহাও ভাবিতে হয়। এইভাবে রাষ্ট্র সমাজ ও চারিত্র-নীতির আলোচনা আসিযা পড়ে।

আর নিজের স্বরূপের কথা ভাবিতে গিয়া মনস্তত্ত্বের নূতন নূতন আবিষ্কারের আলোচনাও প্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে। সুতরাং দর্শনের সীমা যদিও বর্তমানে সুনির্দিষ্ট, তাহার নিজস্ব প্রশ্ন যদিও অন্যান্য শাস্ত্রের প্রশ্ন হইতে পৃথক্, তথাপি রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি কতকগুলি শাস্ত্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ অত্যন্ত নিকট। সমস্ত সত্যের সমস্ত জগতের ও জীবের সমগ্র জীবনের পরিপূর্ণ আলোচনা রূপে দর্শন কোনো বিদ্যার সঙ্গেই একেবারে অসম্পৃক্ত নহে। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রের আলোচনার সহিত ইহার সম্বন্ধ অতি নিবিড়। ঐহিক জীবন কোনো আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে গেলে একটা আদর্শ-স্থানীয প্রতিবেশের কথাও ভাবিতে হয়; আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করা যায় কি না এবং কী উপায়ে যায়, তাহাও ভাবিতে হয়। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে এই সব বিষয় প্রচুর চিন্তিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীসে প্ল্যাতো ও আরিস্ততল্ এই সব সমস্যাকে তাঁহাদের চিন্তার বড়ো স্থান দিয়াছেন। আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকার দর্শনেও ইহাদের স্থান নগণ্য তো নয়ই, বরং কোনো কোনো স্থলে ইহারাই প্রধান সমস্যা। সমাজের পুনর্গঠন, এবং রাষ্ট্রের নূতন ও উন্নততর রূপ ভাবেন নাই, এমন

দার্শনিক আজ পাওয়া দুষ্কর। অন্যান্য সত্য ও আদর্শের সঙ্গে রাষ্ট্রের ও সমাজের সত্যতা ও আদর্শরূপ বিস্মৃত হওয়া চলে না।

কিন্তু ভারতীয় দর্শনের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এই সব চিন্তার সাক্ষাৎ সেখানে কদাচিৎ মিলে। ব্যক্তির জীবনের কর্তব্য কী, সে কথা উঠিয়াছে; সে হিসাবে চারিত্র-নীতি আলোচিত হইয়াছে; এবং একটা আদর্শের কথাও সেখানে বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা বেশীর ভাগই বর্ণ ও আশ্রমের স্বধর্ম হিসাবে - করণীয় কর্ম হিসাবে বিবেচিত হইয়াছে। 'গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ'—গৃহী হইয়া পরে বনবাস বরণ করিবে, না, বৈরাগ্য উদ্রিক্ত হওযা মাত্রই বনে চলিয়া যাইবে—'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'—এসব প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছে, খুব সূক্ষ্ম ভাবে আলোচিত হইয়াছে। অগ্নিহোত্রাদি গৃহীর কর্তব্য বনবাসী হইলেও করিতে হইবে কি না, জ্ঞানীর কোনো করণীয় কর্ম আছে কি না, সন্ন্যাসী উপবীত ধারণ করিবে কি না, ইত্যাদি অনেক প্রশ্নের বিচার হইয়াছে। সে দিক্ দিয়া কর্তব্যাকর্তব্যের বিচার হয় নাই, এ কথা বলা চলে না। কিন্তু এই সমস্তই বৈদিক ধর্মের বন্ধনীর ভিতর থাকিয়া আলোচিত হইয়াছে।

অবৈদিক দর্শনের ভিতর সংসার ত্যাগের মতো প্রশংসনীয় কাজ আর কিছুই নাই। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম অনুসারে জীবন এত দুঃখময় যে উহার কর্তব্যাকর্তব্য খুব বেশী ভাবিবার দরকার হয় না! সাধারণ ভাবে অহিংসা, সত্য, অস্তেয় প্রভৃতি উচ্চ প্রশংসা লাভ করিলেও সকলের উপরে সন্ন্যাস। সমাজে থাকিয়া রাষ্ট্রের সেবায় সত্য, অস্তেয় প্রভৃতি ধর্ম প্রয়োগ করার উপদেশ কোথায়? সন্ন্যাসী হওয়া বড়ো আদর্শ, তাহা না পারিলে সন্ন্যাসীর সেবা-পরিচর্যা দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম। রাজাদের আনুকূল্য জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন লাভ করিয়াছিল; এবং

রাজানুগ্রহে কোনো কোনো স্থলে উহারা পুষ্টি লাভ করিয়া প্রতাপবান্‌ও হইয়াছিল; কিন্তু সেটি ব্যক্তি হিসাবে রাজার সঙ্গে সম্পর্ক মাত্র —রাষ্ট্রের কিছু নয়। গৃহীরা সন্ন্যাসীদের সাহায্য করিবে—কর্তব্য হিসাবে, পুণ্য হিসাবে, একথা শুধু স্বীকৃত নয়, প্রচারিতও হইয়াছে। বৌদ্ধেরা হিন্দুর সমাজ-গঠন, বিশেষত বর্ণভেদ ও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছে সত্য; কিন্তু নূতন সমাজের কোনো পরিকল্পনা না দিয়া সন্ন্যাসেরই জয়গান করিয়াছে। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের সংঘ গঠিত হইয়াছে; কিন্তু নরনারীর উন্নততর রাষ্ট্র ও সমাজের কোনো কল্পনা করা হয় নাই।

চার্বাক রাজাকেই পরমেশ্বর বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার আর রাষ্ট্রীয় আদর্শ কী? যে-কোনো উপায়ে জীবনটা সুখে কাটাইয়া দেওয়া ছাড়া বড়ো কর্তব্যের কথা তাঁহাব কল্পনায় আসে নাই।

সুতরাং আস্তিক ও নাস্তিক কোনো দর্শনেই প্রকৃতপক্ষে আমরা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আদর্শের কল্পনা দেখিতে পাই না। জীবন যে দুঃখময়, ইহা সকলের সাধারণ মত; জৈন ও বৌদ্ধেরা কথাটার উপর জোর দিয়াছে বেশী, কিন্তু স্বীকার করিয়াছে সকলেই। কাজেই সর্বত্রই দর্শন মোক্ষ-শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবন একটা বন্ধন; মরিলেই এই বন্ধন মোচন হয় না; এ জীবনের এবং পূর্বের অভুক্ত কৃত কর্ম আবার বন্ধনের রশ্মি সৃষ্টি করে; আবার জন্ম হয়, আবারও কর্ম আসে; এই ভাবে বন্ধন-রজ্জু দীর্ঘ হইয়া চলে। অনাদিকাল হইতে এই প্রবাহ চলিয়াছে; আপনা-আপনি উহা ছিন্ন হইবার নয়। ত্যাগ ও জ্ঞান—দর্শনের উপদিষ্ট জ্ঞান অর্জন ও উহার চর্চা—এবং সেই অনুসারে ত্যাগী জীবন—বন্ধন মুক্তির ইহাই একমাত্র উপায়। জ্ঞেয় এবং জ্ঞানের স্বরূপ সকল দর্শনের মতে এক নয়; কিন্তু

উপসংহার

চার্বাক বাদে সকল দর্শনেরই মুক্তি ও তাহার উপায় সম্বন্ধে ইহাই সাধারণ সিদ্ধান্ত। ভারতের দর্শনের ইহাই একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য। ইহা ঐহিক অপেক্ষা আমুষ্মিকের চিন্তা করিয়াছে বেশী: ইহা শুধু দর্শন বা তত্ত্বজ্ঞান নয়, আধুনিক অর্থে শুধু সত্যের সন্ধান নয়, ইহা মোক্ষশাস্ত্র। আস্তিক-নাস্তিক সকল দর্শনই জ্ঞানের কথা বলিয়াছে; কিন্তু শুধু জ্ঞানের জন্য জ্ঞান নয়, মোক্ষের জন্য জ্ঞান। জৈন দার্শনিক উমাস্বাতি বলেন—'সম্যগ্-দর্শন-জ্ঞান-চারিত্রাণি মোক্ষ-মার্গঃ'; আর, বৌদ্ধ ধর্মকীর্তিও বলেন 'সম্যগ্-জ্ঞান-পূর্বিকা সর্বপুরুষার্থ-সিদ্ধিঃ'; আস্তিকেরাও এই ভাবে জ্ঞানের কথা তুলিয়াছেন; কিন্তু সর্বত্রই মোক্ষ-মার্গ বা পুরুষার্থ-সিদ্ধির উপায়-স্বরূপ। আর, এই জ্ঞান প্রধানত আত্মার ও জগতের এবং আত্মার বন্ধন ও মুক্তির জ্ঞান; কেহ বা ষট্ পদার্থের কথাও তুলিয়াছেন; রেডিয়ম্ জানা থাকিলে তাহার কথাও হয়তো উঠিত; কিন্তু উদ্দেশ্য সর্বত্রই এক—মুক্তি! ভক্তিবাদীরা ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়াছেন, ঠিক; কিন্তু এই ভক্তিও মোক্ষেরই উপায়; এবং ইহা নিজে জ্ঞান-লভ্য। আধ্যাত্মিক জীবনে ভক্তির একটা স্থান যাঁহারা দিয়াছেন, যেমন বেদান্তের বৈষ্ণব ভাষ্যকারেরা, তাঁহারাও জ্ঞানকে বর্জন করিতে পারেন নাই। সুতরাং মোক্ষ ও মোক্ষের উপায়-স্বরূপ জ্ঞান, ইহাই ভারতীয় দর্শনের প্রধান আলোচ্য। আর এই জ্ঞান প্রধানত আত্মার বন্ধন ও মুক্তির জ্ঞান; অন্য জ্ঞান প্রাসঙ্গিক মাত্র। ভারতের দর্শনের ইহাই সীমা।

দেশের উপর দিয়া অনেক ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে; অনেক রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজ-বিপ্লব হইয়াছে; দেশান্তর হইতে অনেক রিপু আসিয়াছে—রাজ্য-স্থাপন করিয়াছে কিংবা লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু দার্শনিকেরা নির্বিকারভাবে নিজেদের তত্ত্ব-চিন্তা, মোক্ষ-চিন্তা করিয়া

গিয়াছেন। পারস্য উত্তর-পশ্চিম ভারত জয় করিয়াছে—কিছুকাল শাসনও করিয়াছে; সেকন্দরের জয়ী সেনা রাজার পর রাজাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়াছে; কিন্তু নির্বিকার দার্শনিকের মনে কোনো ছায়াপাত করিতে পারে নাই। সেকন্দর নিজে গিয়া এই অপরাজিত, 'অপরামৃষ্ট' সন্ন্যাসীদের কাহারও কাহারও সঙ্গে দেখা করিয়াছেন। দেশে ফিরিবার পথে একজনকে সঙ্গে লইযাছিলেন বলিয়াও শুনা যায়; কী তাঁহার নাম ছিল বলা যায় না, গ্রীক্‌রা তাঁহাকে কালানস্ (Kalanos) বলিত, এই মাত্র জানা যায়। একটা উক্তি আছে—বহু স্থানে উদ্ধৃত—'মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং ন মে নশ্যতি কিঞ্চন'—মিথিলা পুড়িয়া গেলে আমার কিছুই নষ্ট হইবে না; রাজর্ষি জনকের মুখে কথাটা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তত্ত্ব-জ্ঞানীর ঐহিকের প্রতি বিরাগের উদাহরণ স্বরূপ উক্তিটি উদ্ধৃত হইয়া থাকে। আমাদের দার্শনিকদেরও ইহাই চিরন্তন সুর। পুরুর রাজত্ব রহিল কি গেল, রাজা এখন রাম না ভরত, এ সব বিষযে দার্শনিকেরা সাধারণত নির্বিকার ও উদাসীন। রাজ-সভার আশে পাশে যে সব ব্রাহ্মণ থাকিতেন তাঁহারা দার্শনিকও ছিলেন না, সুতরাং নিবিকারও থাকিতেন না, যেমন, চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ও গুরু চাণক্য। ইঁহারা কখনো কখনো রাষ্ট্র-বিপ্লব উৎসাহিতও করিতেন। রাজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি তো হইতই! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও তো সেইজন্যই হইল। কিন্তু দর্শনে রাষ্ট্রের চিন্তার উদাহরণ এই সকল নয়।

দেশে পারসিক, গ্রীক্, শক, হুন কত আসিয়াছে গিয়াছে; মুসলমান আসিয়াছে, প্রায় হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়াছে। বিদেশী, বিধর্মী কত রাজা আসিল গেল! সর্বশেষ আসিল ইংরেজ। কিন্তু দেশের দার্শনিক চিন্তার কোথাও তো এসব পরিবর্তনের ছায়াও দেখা যায় না! যেন কিছুই হয় নাই! ঝড় আসে, বৃষ্টি হয়, আবার শান্ত

বায়ু ও স্নিগ্ধ সূর্যকিরণ দেখা দেয়। এই সব নৈসর্গিক পরিবর্তনের মতো রাষ্ট্র-বিপ্লব ও পরিবর্তনের প্রতিও এদেশের দর্শন একটা ঔদাসীন্য দেখাইয়াছে। সমাজে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়াও তো অনেকবার পড়িয়াছে, মহামারিও আসিয়াছে; কিন্তু কই, সমাজকে এইসব হইতে মুক্ত করার কোনো চিন্তা তো দার্শনিকের মনে উঠে নাই! দর্শনের প্রশ্ন এসব ঠিক নয়, সত্য; কিন্তু দার্শনিকও তো মানুষ! মোক্ষের কথা তিনি ভাবিয়াছেন; আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখের নিবৃত্তির কথাও ভাবিয়াছেন; কিন্তু শুধু নিজের, সমাজের নয়। এ জগতে সমাজে থাকিয়া এ জীবন রক্ষা করিয়া দুর্দৈব ও দুর্বিপাক হইতে নিজের এবং দশের মুক্তি তাঁহার আলোচ্য কখনোই হয় নাই। খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বলদেব চৈতন্য-সম্প্রদায়ের একজন বড়ো দার্শনিক, বাঙালী না হইলেও বাংলার ধর্মে অনুপ্রাণিত। আত্মা-পরমাত্মার প্রভেদ ও সম্বন্ধ ইত্যাদি অনেক কথা তিনি বিচার করিয়াছেন। পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭ খ্রীঃ) পরও তিনি বই লিখিয়াছেন (১৭৬৪ খ্রীঃ)। কিন্তু সিরাজ ও ক্লাইভের কথা তাঁহার চিন্তায় উদিত হয় নাই। জীব ও পরমাত্মার ভেদাভেদ যিনি চিন্তা করিয়াছেন, তিনিও স্বদেশী বিদেশীর ভেদ ভাবেন নাই।

কথিত আছে, নেপোলিয়নের সৈন্যের গুলি যখন জানালা দিয়া ঢুকিতেছিল, তখনো জার্মান দার্শনিক হেগেল ঘরে বসিয়া বই লিখিতেছিলেন। ইহা তাঁহার একাগ্রতার প্রমাণ, দেশপ্রেমের অভাবের প্রমাণ নহে। জার্মান জাতিকে হেগেল কত রকমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, কত রকমে নিজেদের ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠতার কথা বলিয়াছেন, কত রকমে আত্মপ্রত্যয়শীল হইতে উপদেশ দিয়াছেন, সে কথা ইতিহাস জানে। প্রায় সেই সময়েই দর্শনের অধ্যাপনা ছাড়িয়া দিয়া ফিকটে (Fichte)

দেশের যুবকদিগকে বিদেশী ফরাসীদের নিকট পরাজয়ের অপমান হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়া দিনের পর দিন বক্তৃতা করিয়াছেন। ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগেও নীট্শে (Nietzsche) জাতি ও দেশের কথা কত রকমে ভাবিয়াছেন। জয়-পরাজয়ে আমাদের কিছু যায় আসে না। দুই বারই দুইটি বড়ো যুদ্ধে জার্মানরা পরাজিত হইয়াছে। কিন্তু জার্মানদের আত্মপ্রত্যয় ও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বোধ জার্মানরা তাহাদের দার্শনিকদের নিকট শিখিয়াছে। এই দার্শনিকদের সব শিক্ষাই ভালো ছিল, এ কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু দেশকে এবং জাতিকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত দেখিতে এই দার্শনিকেরা সব সময়ই চাহিয়াছেন, এবং এই আদর্শ তাঁহাদের চিন্তায় স্থান পাইয়াছে। ইংলণ্ডেও মিল্ স্পেন্সর প্রভৃতি এবং ফ্রান্সে কোঁৎ প্রভৃতিও কত রকমে দেশ ও সমাজের উন্নতির কথা ভাবিয়াছেন। দৃষ্টান্ত এখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ভারত ভারতের দার্শনিকদের নিকট অনুরূপ শিক্ষা তো পায় নাই। ভারত শুধু শুনিয়াছে, জগৎ অনিত্য, জীবন দুঃখময় ; সুতরাং ত্যাগ ও সংযমের মধ্যে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষাই একমাত্র পন্থা। সত্য, অস্তেয় প্রভৃতি উচ্চ প্রশংসিত যে সব ধর্ম, সেগুলিও দেশের ও সমাজের সেবায় প্রয়োগ করার উপদেশ স্পষ্ট নয়।

তাহার পর, দর্শন ও বিজ্ঞানের কথা। এক সময় ইউরোপেও দর্শন ধর্মের কুক্ষিগত ছিল। কিন্তু পরে যখন উহা স্বাধীন হয় তখন, অর্থাৎ বেকন প্রভৃতির আমল হইতে, উহার মৈত্রী ক্রমশ বিজ্ঞানের সঙ্গেই বেশী হয়। প্রাচীন গ্রীসে আরিস্ততল সমগ্র বিদ্যাকে তাঁহার দর্শনের সংহতিতে গ্রথিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং রাষ্ট্র ও সমাজের সঙ্গে প্রাণিতত্ত্ব ও পদার্থবিদ্যাও তিনি তাঁহার দার্শনিক প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। আধুনিক কালে এতটা কোনো দার্শনিক

করিতে যাইবেন না। কিন্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কার অবহেলা না করিয়া বরং উহারই সাহায্যে জগৎতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা আধুনিক দর্শনও করে। পরমাণুতত্ত্ব, দেশ ও কালের আপেক্ষিকতা, প্রাণিজগতের ক্রমবিকাশ ইত্যাদি সমস্ত নূতন আবিষ্কার দর্শনের সিদ্ধান্তকে আজ পরিণতি দিতেছে। এইভাবে বিজ্ঞান আর দর্শনের মধ্যে আধুনিক চিন্তায় নৈকট্য অনেক। বিশেষত জগৎ ও আত্মা বুঝিতে আধুনিক দর্শন বিজ্ঞানের সাহায্যই বেশী লয়; শুধু নিজের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া বিজ্ঞানের পরীক্ষা ও সিদ্ধান্তের উপব নির্ভর করে বেশী। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে এই জিনিসটি কম দেখা যায। বিজ্ঞান তখন খুব পুষ্ট হয় নাই, ইহাও সত্য; কিন্তু যাহা ছিল তাহাও দর্শনের সিদ্ধান্তে ব্যবহৃত হইয়াছে কম; আর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেব প্রচেষ্টা দর্শনে ব্যবহৃত হয় নাই বলিযা উৎসাহিতও হয় নাই। জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ইত্যাদি প্রাণীর ভেদ দার্শনিকেরা জানিতেন এবং সে জ্ঞান তাঁহারা ব্যবহারও করিয়াছেন। "শতং চৈকা হৃদয়স্য নাড্যঃ"—হৃদয় হইতে একশত একটি নাড়ী বাহির হইয়াছে, এই ধরনের শারীরতত্ত্বের কথা উপনিষদেও আছে; আত্মা দেহের একাধিক স্থানে বিচরণ করে—নেত্রে, কণ্ঠে ও হৃদয়ে অবস্থানুসারে অবস্থান করে; জাগ্রত অবস্থায় নেত্রে, কণ্ঠে স্বপ্ন অবস্থায়, আর সুষুপ্তিতে হৃদয়ে—এই সব কথাও বলা হইয়াছে। তান্ত্রিক যুগে দেহস্থিত ষট্‌চক্রের বিবরণও দেওয়া হইয়াছিল। আর প্রাণীতত্ত্বের মধ্যে বলাকারা মেঘের ডাকে গর্ভ ধারণ করে, এমন কথাও বলা হইয়াছে (বেদান্তসূত্র, ৩.১।১৮ ইত্যাদি, শঙ্করভাষ্য)। কিন্তু বিজ্ঞানের এই ধরনের কথা পরিমাণে ও গভীরতায় খুব বেশী নয়; আর, অনেকগুলিই আধুনিক বিজ্ঞানের নিক্তিতে মাপিলে ওজনে কম হইবে এবং মেকী মনে হইবে।

পাশ্চাত্ত্য দর্শন আরিস্ততলের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত যেভাবে মানুষের সমগ্র জ্ঞানকে সংহত করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, ভারতীয় দর্শন সে ধরনের কিছু করে নাই। এইটি তাহার একটি ত্রুটি, একটা অপূর্ণতা। পূর্ণাঙ্গ দর্শন সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দিবে, এমন নয়; নক্ষত্রের গঠন ও দূরত্ব, প্রাণীজগতের ক্রমবিকাশ, পরমাণু হইতে আলোক ও উত্তাপ বিকিরণ, ইত্যাদি বহু শত বিষয়ই দর্শনের নিজস্ব আলোচনার বাহিরে। কিন্তু এই সকল বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত বিভিন্ন বিজ্ঞান করে, সে সকল সমন্বিত ও সংহত করা দর্শনের কাজ। তাহা না হইলে জীব ও জগৎ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ও সত্য জ্ঞান দর্শন দিবে কী করিয়া? দেশ ও কালের আপেক্ষিকতার কথা যে আজ দর্শনে স্থান পাইতেছে, তাহাও এই পূর্ণতা লাভের চেষ্টা হইতেই। বিজ্ঞানের কাজ দর্শন করে না সত্য, কিন্তু বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ উপেক্ষা করা তাহার পক্ষে সংগতও নয়, সম্ভবও নয়।

কিন্তু ভারতীয় দর্শন বিজ্ঞানের সঙ্গে এইরূপ সহযোগিতা রক্ষা করে নাই। এইটি তাহার আর-একটি বড়ো অঙ্গহীনতা, বড়ো অভাব। রাষ্ট্র ও সমাজ উপেক্ষা করা যেমন একটা অপূর্ণতা, বিজ্ঞানে ঔদাসীন্য দেখানোও তেমনই আর-একটা অপূর্ণতা। এই অপূর্ণতা ও অঙ্গহীনতা লইয়াই ভারতীয় দর্শন বড়ো হইতে চাহিয়াছে। মোক্ষশাস্ত্র হিসাবে—মোক্ষই সে ভাবিয়াছে—ব্যক্তির মোক্ষ, সমাজের নয়। ব্যষ্টির মোক্ষ, সমষ্টির নয়;—আর এই মোক্ষের কথা বলিয়া বলিয়াই সে সমাজে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ঐহিক জীবন বন্ধন বলিয়া উহার ছেদনের উপায়ই সে ভাবিয়াছে, ইহাকে উন্নত করিতে চাহে নাই। বাসনা ও তৃষ্ণার কথা উঠিয়াছে; বৈরাগ্য দ্বারা সে সকলের উচ্ছেদের কথা হইয়াছে; কিন্তু এই বন্ধনের মধ্যেও যে মুক্তির আস্বাদ সম্ভব, সে

কথা বলা হয় নাই। নিষ্কাম কর্মের কথা উঠিয়াছে, কিন্তু তাহাও প্রধানত শাস্ত্রবিহিত কর্ম। সামাজিক জীবনের বিবিধ কর্মরাশি সমগ্র ভাবে চিন্তা করা হয় নাই; নিষ্কাম ভাবে দেশের ও দশের সেবার কথা উঠে নাই। এইসব ভাবিলে ভারতীয় দর্শনের একটা দিক্‌ যে অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। কথাটা শুনিয়া অনেকে তৃপ্তি পাইবেন না, বুঝিতে পারি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, অনাদর ও অন্ধ শ্রদ্ধার মধ্যবর্তী একটি পন্থাও আছে। অনাদর যে করে সে যেমন ভারতীয় দর্শনের মূল্য বুঝিতে পারিবে না, তেমনই যে অন্ধ শ্রদ্ধা লইয়া দেখিবে, সে-ও ইহার পরিস্ফুট রূপ দেখিতে পাইবে না।

রাষ্ট্র, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ছিল, ইহা ভারতীয় দর্শনের একটা বৈশিষ্ট্য। এই জীবনযাপন করাই দুঃখ, ইহার ভিতর আর ভালোমন্দ-আদর্শ কিছু নাই; এই কথার উপর জোর দিয়া চারিত্র-নীতির সঙ্গেও ইহা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে নাই। এই পৃথিবী বাসের উপযুক্ত নয়—জীবন একটা বন্ধন—মুক্তিই একমাত্র নিঃশ্রেয়স্‌—বার বার নানাভাবে এই একই কথার উপর জোর দিয়া সমগ্র ভারতীয় দর্শন—আস্তিক ও নাস্তিক সকল দর্শন—একটা বিপুল মোক্ষশাস্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছে। যাঁহারা এই মোক্ষশাস্ত্র অনুসরণ করিয়া সকল দুঃখের অতীত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কথা জানি না। কিন্তু এত সব মোক্ষ আলোচনার পরও জগতে জীবের আবির্ভাব ঘটিতেছে—এই ভারতেও প্রচুর জনসংখ্যা রহিয়াছে এবং উহা বৃদ্ধিও পাইতেছে। ইহাদের জীবনে দুঃখের অন্ত নাই। রাষ্ট্রে, সমাজে নিপীড়িত কোটি কোটি জীবাত্মা এখনো দিনের পর দিন দুঃখে অশ্রুপাত করিতেছে! তাহাদের এই দুঃখের অবসান কোথায়?

ধর্মে একটা ব্যর্থতা আসিয়াছে। যে যীশু উপদেশ দিয়াছিলেন,

শত্রুকেও নিজের মতো ভালোবাসিবে, এবং ডান গালে চড় দিলে বাম গালও ফিরাইয়া ধরা যাঁহার শিক্ষা, তাঁহারই ধর্ম গ্রহণ করিয়া আজ ইউরোপ ও আমেরিকা মানুষকে ধ্বংস করিবার জন্য কী না করিয়াছে? একটা আণবিক বোমা একটা গোটা শহর ধ্বংস করিয়া দিতে পারে—দুই লক্ষ লোক এক নিশ্বাসে ভস্ম হইয়া উড়িয়া যাইতে পারে! কিন্তু এই আণবিক বোমা যাহারা আবিষ্কার করিয়াছে, তাহারাও তো টাইফয়েড কিংবা ম্যালেরিয়া কিংবা যক্ষ্মার বিষ একদিনে পৃথিবী হইতে উড়াইয়া দিয়া উহাকে মানুষের বাসের পক্ষে মনোরম করিয়া তুলিতে পারে নাই—সে চেষ্টাও হয়তো করে নাই! আর, বুদ্ধের ধর্ম যে চীন, জাপান এখনো রক্ষা করিতেছে তাহারাই কি মারণ-শিল্পে কম অগ্রসর হইয়াছে? সমত্ব ও ভ্রাতৃত্বের মূর্ত প্রচার ইসলাম্ নিজের দেশ হইতেও তো এখনো বৈষম্য দুর করিতে পারে নাই! সুতরাং আড়াই হাজার বৎসরের ধর্মের শিক্ষা ব্যর্থ হইয়া যায় নাই কি?

আড়াই হাজার বৎসরের মোক্ষশাস্ত্রের শিক্ষাই কি বেশী ফলপ্রদ হইয়াছে? জগতের দুঃখ রহিয়াই গিয়াছে। জরা, ব্যাধি, অভাব ও নিপীড়ন সমাজ হইতে দূর হয় নাই। মোক্ষলোভী ব্যক্তি এই সব পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষের পথ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে সে হয়তো পরিত্রাণ পাইবে কিন্তু বাকি পৃথিবীটা তো যে তিমিরে ছিল, সে তিমিরেই থাকিয়া যাইবে! সুতরাং মানুষের আড়াই হাজার বছরের সমগ্র চিন্তা—তাহার ধর্ম ও দর্শন—ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে, বলা যায় না কি? ব্যক্তির উপকারে আসিতে পারে, অস্বীকার করি না; কিন্তু সমষ্টির—সমাজের—কি ভাগ্যপরিবর্তন হইয়াছে?

পরলোক ষোলআনা সত্য হইলেও ইহলোক অসত্য হইয়া যায় না; আর, পরলোক সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও ইহলোক সন্দেহের অতীত।

এ ক্ষেত্রে ইহলোক উপেক্ষা করিয়া শুধু পরলোকের চিন্তা করা বর্তমানকে উপেক্ষা করিয়া অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কল্পনা করার মতো। বর্তমানেই মানুষ ভবিষ্যতের জন্য কাজ করে ইহা ঠিক, বর্তমান জীবনেই ভবিষ্যৎ জীবনের বুনিয়াদ গড়িতে হয়, ইহাও মানিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু বর্তমানকে শুধু মিথ্যা, মায়া, মোহ ও বন্ধন মনে করিয়া ভবিষ্যতের কথা মাত্র যে ভাবে, সে কি নিশ্চিতকে অবহেলা করিয়া অনিশ্চিত আলেয়ার পিছনে ছুটে না? আর, ব্যক্তি ও সমাজের, ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্বন্ধ কি অবয়ব ও অবয়বীর সম্বন্ধের মতো নয়? প্রাচীন ধর্ম ও দর্শন যে শুধু ব্যক্তির উদ্ধারের কথা ভাবিয়াছে এবং সমষ্টিকে বাদ দিয়াছে, এইখানেই কি উহার ব্যর্থতার বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল না?

তবে কী করিতে হইবে? নূতন ভাবে, আরো সমগ্রভাবে—শুধু ব্যষ্টির জন্য নয়, সমষ্টির জন্য—সমগ্র জগতের জন্য হিত চিন্তা করিতে হইবে। নূতনতর রাষ্ট্র, নূতনতর সমাজ, নবতর দর্শন, নূতন জগৎ ও নূতন মানুষ --ভবিষ্যতের কোনো আশা পোষণ করিতে হইলে ইহাদের কথা ভাবিতে হয়। অথবা, আশঙ্কা করিতে হয় মানুষের সমাজের ও সভ্যতার বিলোপ! পরমাণুর ভিতর যে দৈত্যশক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা আজ আরব্য-উপন্যাসের দৈত্যের মতো বাহির হইয়া পড়িয়াছে! একদিন সমস্ত ইউরেনিয়ম্ পরমাণু বিস্ফোরিত হইয়া গোটা পৃথিবীটাকেও পুড়াইয়া দিতে পারে; আর, বহ্নি-কুণ্ডে পিপীলিকার মতো সমগ্র মানব-জাতি ভস্মীভূত হইয়া আলোকের বা উত্তাপের রশ্মিতে পরিণত হইয়া যাইতে পারে; এবং অনন্ত আকাশে বিচ্ছুরিত হইয়া ছায়াপথের নীহারিকা-মণ্ডলে অথবা ধ্রুবতারায় অথবা অন্য কোনো দিকে ছড়াইয়া যাইতে পারে! ভবিষ্যতের নূতন রূপ কল্পনা করিতে না পারিলে এই পরিণতির জন্যই অপেক্ষা করিতে হয়!

শুদ্ধিপত্র

স্মর্তব্য ঃ— যে সব ভুল অর্থের অসংগতি অথবা অর্থ বুঝিতে অসুবিধা ঘটাইতে পারে, মাত্র সেইগুলিই শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮	৭	শ্বতায়	যতায়
২৩	১০	শ্যাম,	সাম,
৩১	১৫	পরম্পরার্যং	পরম্পরার্থং
৩২	৭	অধ্বর্যু	অধ্বর্যু
৩৩	৩	আম্রফল	আম্রবন
৩৯	৩, ৬	জৈবনি	জৈবলি
”	৭	নিপ্পলাদ	পিপ্পলাদ
৪০	১৫	আলোচনায়	আলোচনা
”	১৭	ঔভুগোমি	ঔড়ুলোমি
”	”	আন্মরথ্য	আশ্মরথ্য
৪১	৫	উপদ্বিষদের	উপনিষদের
৪৮	২৪	কর্মও	বর্মও
৫৩	১১	ল্যাটিনে	ল্যাটিন
৫৭	৫	তাহাদে .ল	তাহাদের মূল
৬৬	১৬	অল্পবিস্তর	ইহাদের সঙ্গে অল্প-বিস্তর
৭২	২০	জার্মানী	জার্মানী ও জাপান
	”	নেতার	জেতার

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৩	১০	'অবিলভাব'	'অবিনাভাব'
৮৬	১৩	বিচারণ	উচ্চারণ
৮৬	২৩	ধর্মরে	ধর্মের
৯১	১২	অগ্নিষেণ	মল্লিষেণ
৯৪	২	করে ;	করে নাই ;
১০৮	৬	পা	পারে
১১০	৭	অভিভাজ্য	অবিভাজ্য
১১৯	৪	একান্ত	প্রকাণ্ড
১২০	১৭	আকারের	অবতারের
১৪১	২	এখনও	একথাও
১৪৫	১৫	নিয়মেরই	বস্তুরই
”	”	নিয়মের	বস্তুর
১৪৭	৪	বৈশেষিকে	বৈশেষিকের
২৫৩	৯	দার্শনিকবাদ	বহু দার্শনিকবাদ